ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

দ্বাদশ বর্ষ, ১৩১৫ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত-সেবক রামচন্দ্র প্রবর্ত্তিত

ও সেবকমণ্ডলী সম্পাদিত।

তত্ত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়।

৮০।১, করপোরেসন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

কলিকাতা;

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেস হইতে

শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ সাল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অবনীতে আবির্ভাব	শ্রীভোলানাথ মজুমদার	২৫
অভিশাপ	শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত	৮২
অহঙ্কার	শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার	১০৫
আশা	শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য	১০২
ঐ	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৭
উপাসনা	শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার	১৩
এককড়ি-সংগীত	শ্রীএককড়ি দাস	৪৭
কনখল রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম	— — —	১৪৪
কাঞ্চন	শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ	১১৪
কামারপুকুরে মহামহোৎসব	শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার	২৮৩
কেহ নাই আর	শ্রীভোলানাথ মজুমদার	২২
গীত	— — —	১১৬
গুরু-পূজা	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	২৩৮
জাগরণ	শ্রীনরেন্দ্রকুমার দত্ত	১৭
জীবনের উদ্দেশ্য কি ?	শ্রীগোষ্ঠবিহারী বসু, বি, এল	৬৭
ধর্ম্ম	শ্রীনরেন্দ্রকুমার দত্ত	৫৬
নিবেদন	শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার	৯৫
পাওহারী বাবা	ঐ	৭৮
পাগলের খেয়াল	অনৈক পাগল	৩৪,৮৫
পূজা	শ্রীবাণীকান্ত রায়	১৩৭
প্রভাতী—কৃষ্ণ-সম্মিলন	শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার	১৫১
প্রেম ও শান্তি	শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত	১০৭,১২৮
বাজার	শ্রীসুশীলমালতী সরকার	১৩৯
বাণী-বন্দনা	শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত	২৬২
বিবেক ও বৈরাগ্য	শ্রীভোলানাথ মজুমদার	২৫৩,২৬৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বৃন্দাবন	শ্রীসুশীলমালতী সরকার	২১১
ভক্তবর মনোমোহন	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এল	১১৩
ভক্তপ্রাণ হেমচন্দ্র	শ্রীঅমলচন্দ্র মিত্র	১৫৬
ভারতী-গীতি	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এল,	২৪
রামকৃষ্ণ-সংগীত	ঐ	২৩
ঐ	সেবক নিবারণচন্দ্র দত্ত	৭১,১৪৩
রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত	১৫৩,১৮০,২৩০
শ্রীকৃষ্ণ-গীতম্	শ্রীভোলানাথ মজুমদার	১১৯
শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী	শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার	২০০,২১৯,২৪৩
শ্রীবিবেকানন্দ	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত	১৯২
শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ	১৯০
শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতম্	ঐ	১
শ্রীরামকৃষ্ণ-আরতি	শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার	১১
শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাগীতি	ঐ	৪৫
শ্রীরামকৃষ্ণ-শয়নগীতি	ঐ	১৬৯
শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠযাত্রা গীতি	ঐ	১৯৩
শ্রীরামকৃষ্ণ-মকরমঙ্গল গীতি	ঐ	২১৭
শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠলীলা গীতি	ঐ	২৪১
শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব	— — —	২১৪
শ্রীরামচন্দ্র	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত	১৫৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ	শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার	২,২৬,৪৯,৭৩,৯৭,১২১,১৪৫,১৯৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব-সংবাদ	— — —	৬,১১৫,১৬৮,২৬১
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্	শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ	২৬২
সমালোচনা	— — —	১৬৫,২১৫,২৪০,২৬৪
সংসার	শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ	২১২
সন্ন্যাসীর ব্রহ্মবিজ্ঞান	শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত	১৭১
সাধক-সংগীত	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৬২
সে মোর কোথায়!	শ্রীভোলানাথ মজুমদার	২০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।
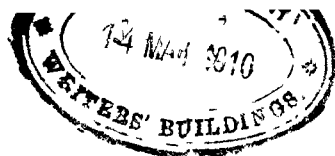
তত্ত্ব-মঞ্জরী।

বৈশাখ, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ গীতং।

নৃত্যতি কথমহ রহসি হসন্তী।
ঘনকুসুমকলিতা দেবী বাসন্তী॥
কোটিযোগিনীবৃতা ক্ষুদিরামগৃহে॥ ধ্রুবম্॥ ১
মলয়পবনমহো বহতি সুমন্দং।
কিরতি সজলকণকুসুমসুগন্ধং॥ ২
দশদিশো নির্ম্মলা ঝটিতি বিভান্তি।
চূতমুকুলে লঘু পিকা কূজন্তি॥ ৩
মুখরিতা দিঙ্মুখা মঙ্গলবাদ্যৈঃ।
বকুলকো মুকুলিতো রতিমুখমদ্যৈঃ॥ ৪
মধুব্রতঝঙ্কৃতমন্দারদামং।
ক্ষিপতি সুরপতিরিহ অবিরামং॥ ৫
ধাবতি সাগরমুদ্বেলগঙ্গা।
মঙ্গল-কল-কল-নাদতরঙ্গা॥ ৬
অপ্সরা নৃত্যতি কুচভরনম্রা।
পুলকরোমাঞ্চিত ক্ষুদিরামশর্ম্মা॥ ৭

স্মরহর মুরহর শ্রুতিধর প্রমুখাঃ।
স্বাগতা দেবতা শিশুপদপ্রণতাঃ॥ ৮
অঞ্চলচঞ্চলা চলতি হ রামা।
ধরণীধরধরণী "ধনি"-নামা॥ ৯
জয়তু গদাধর নদতি গগনং।
দ্বিতয়কলান্বিত শশধর শোভনং॥ ১০
মুঞ্চতি ক্ষিতিতলমতিবলদর্পাঃ।
কনককামসখকলিকাল সর্পাঃ॥ ১১
হরিহব কমলজাকর্ষণভ্রমিতাঃ।
নরতনুধাবণ সহ সঞ্জাতাঃ॥ ১২
হরিরিতি হরিরিতি ধ্বনতি মৃদঙ্গং।
গুম্ফিত ধিমিধিমি তালতরঙ্গং॥ ১৩
বাণী খে নাদিতানাহতশব্দে।
জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ কৃপাব্ধে॥
কিরতু শুভা তিথি কৌমুদীমিন্দোঃ।
যচ্ছতু করুণাং হে কৃপাসিন্ধো!॥ ১৫
গুরুপদভ্রমরভনিতগীতমিষ্টং।
সুখয়তু জনমিহ ভক্তবরিষ্ঠং॥ ১৬

শ্রীমৎ শরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

(পূর্ব্ব বর্ষের ২৪৭ পৃষ্ঠার পর)

৫৭। তিনি নানা ভাবে লীলা করছেন। তিনি মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী ও শ্যামাকালী। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা, মহাকালী, মহাকালের সঙ্গে বিরাজ ক'রছিলেন। শ্মশানকালীর সংহার মূর্ত্তি, শব শিবা ডাকিনী যোগিনীর মধ্যে

শ্মশানের উপর থাকেন, রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কোটীতে নরহস্তের কোটীবন্ধন। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা করতে হয়। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়-দায়িনী। গৃহস্থের বাটীতে তাঁহারই পূজা হয়।

৫৮। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে ঊর্ণনাভির কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বা'র ক' আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার, আধেয় দুই

৫৯। যখন জগৎ নাশ হয় মহা প্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নিদের কাছে যেমন একটা ন্যাতাব্যাতার হাঁড়ী থাকে, তার ভিতর সমুদ্রের ফেণা নীলবড়ি, ছোট পুঁটলি বাঁধা শশা বীচি, কুমড়ো বীচি, লাউ বীচি, এই সব পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে। দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন।

৬০। কালী দূরে কালো। জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোন রং নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখো, কোন রং নাই।

৬১। বন্ধন আর মুক্তি, দুইয়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত হয়ে যায়।

৬২। তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।

৬৩। জীবকে সংসারে বদ্ধ করা, তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে আর দৌড়াদৌড়ি হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা হয় কেমন করে? সকলেই ছুঁয়ে ফেল্লে বুড়ি অসন্তুষ্ট হয়। খেলা হলে বুড়ীর আহ্লাদ হয়। তাই "লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।"

৬৪। তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা করে বলে দিয়েছেন, "যা, এখন সংসার করগে যা। মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হলে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়, তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে।

৬৫। সংসার করছো, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন

রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

৬৬। মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে, সেই রঙ্গে ছুপবে। যেমন ধোপা ঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রংয়ে ছাপাও সবুজ। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখ, তো সেই রকম কথাবার্ত্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো, তা হলে ঈশ্বর চিন্তা, হরিকথা, এই সব হবে।

৬৭। মন নিয়ে সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান। পরিবারকে এক ভাবে ও সন্তানকে আর এক ভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।

৬৮। যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' এ কথা জোর করে বলে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' এই কথাটী রোক করে বলতে বলতে মুক্তই হয়ে যায়।

৬৯। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বা 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' বার বার বলে, সে তাই হয়ে যায়।

৭০। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে। আমার আবার বন্ধন কি। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারে থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে?

৭১। ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

৭২। কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এ সব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি, আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস করো।

৭৩। সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনক রাজার হয়েছিল। কিন্তু ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জ্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন।

৭৪। সংসারে থেকেও এক একবার নির্জ্জনে বাস করতে হয়। একলা সংসারের বাহিরে গিয়ে, যদি ভগবানের জন্য তিনদিনও কাঁদা যায়, সেও ভাল। এমন কি, অবসর পেয়ে একদিনও নির্জ্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল।

৭৫। যখন চারাগাছ থাকে তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে

ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুঁড়িতে হাতি বেঁধে দিলেও কিছু হয় না। সংসারের ভিতর, বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়, তাই বেড়ার স্বরূপ নির্জ্জন সাধন করতে হয়।

৭৬। যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, তা হলে ঘর থেকে সেইগুলি ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয় জলের জালা, বিষয় ভোগতৃষ্ণা জলতৃষ্ণা স্বরূপ। আচার তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয়না। এরূপ জিনিসও ঘরে রয়েছে— যোষিৎ সঙ্গ। তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার।

৭৭। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। বিবেক বৈরাগ্যরূপ হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়।

৭৮। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু; আর সব অসৎ, অনিত্য, দুই দিনের জন্য—এইটী বোধ।

৭৯। মানুষগুলি দেখতে সব এক রকম। কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারুর ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব এক রকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর, কারুর ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারুর ভিতর কলায়ের পোর।

৮০। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন।

৮১। সকলেই গুরু হতে চায়, শিষ্য কে হ'তে চায়?

৮২। লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন, আর আদেশ দেন, তা হলে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে, কে তোমার কথা শুনবে? আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়।

৮৩। যে লোকশিক্ষা দেবে, তার চাপরাস চাই। তা না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্য লোক! কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! হিতে বিপরীত হয়। ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তখনই কার কি রোগ, বোঝা যায়—উপদেশ দেওয়া যায়।

৮৪। আদেশ না থাকলে 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়—আমি কর্ত্তা। আমি কর্ত্তা, এই বোধ থেকেই যত দুঃখ আর অশান্তি।

৮৫। ঈশ্বর কর্ত্তা, তিনিই সব কর্‌ছেন, এ বোধ হলে সে জীবন্মুক্ত।

৮৬। জগতের উপকার করা। জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর, তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার, নচেৎ নয়।

৮৭। সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার, সেইটুকু কর্ম্ম করবে। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে হয়। আর বলবে, 'হে ঈশ্বর, আমার বিষয় কর্ম্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর, দেখছি যে, বেশী কর্ম্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই, মনে করছি—নিষ্কাম কর্ম্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। হয় তো দান সদাব্রত বেশী করতে গিয়ে, লোকমান্য হতে ইচ্ছা হয়ে পড়ে।'

৮৮। সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগলো, কালী দর্শন আর হলো না। আগে জো সো করে, ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালী দর্শন করতে হয়, তারপর দান যত কর আর না কর।

৮৯। কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম করতে বলচে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশী কর্ম্ম চলে না। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তি যোগই যুগধর্ম্ম।

৯০। সংসারী লোকদের যদি বল যে, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে, এই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুইটীর লোভে অনেকে হরিবোল বল্‌তে যেতো। হরিনাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে, তারা বুঝতে পারতো যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছুই নয়, কেবল হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে, আর 'যুবতী মেয়ে' কি না পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কি না—ধুলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

৯১। ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু

কখনও না কখন এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখন সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল।

৯২। যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ আছে, তেমনি ভক্তিরও সত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ আছে।

৯৩। সংসারীর সত্বগুণ কি রকম জান? বাড়ীটী এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা—মেরামত করে না। ঠাকুর দালানে পায়রাগুলো হাগ্‌ছে। উঠানে এখানে সেওলা পড়েছে, ওখানে সেওলা পড়েছে, হুঁস নাই। আসবাবগুলো পুরাণো, ফিট্‌ফাট্ করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই, একখানা হলেই হ'লো। লোকটী খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক, কারও কোনও অনিষ্ট করে না।

৯৪। সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটা আংটি। বাড়ীর আসবাব খুব ফিট্‌ফাট্। ঘরের দেয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোনও বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটি চুণকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানা রকম ভাল ভাল পোষাক। চাকরদেরও পোষাক। এম্‌নি এম্‌নি সব।

৯৫। সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, এই সব।

৯৬। ভক্তির সত্ব আছে। যে ভক্তের এইরূপ সত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে, অতি গোপনে। সে হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে,—সবাই জানছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে এত দেরি হচ্চে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট চলা পর্য্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হ'ল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না।

৯৭। ভক্তির রজো থাকলে, সে ভক্তের হয় ত ফোঁটা তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে, সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার এক একটী সোণার দানা। যখন পূজা করে, তখন গরদের কাপড় পরে পূজা করে।

৯৮। ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত—ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

৯৯। তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে, ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর, তিনি ত পর নন, তিনি ত আপনার লোক।

১০০। বৈদ্য তিন প্রকার। উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা ব'লে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে 'ওহে, ঔষধ না খেলে কেমন ক'রে ভাল হবে। লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য। বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যে শুধু উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লয় না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা কত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুন্‌ছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি—উত্তম আচার্য্য।

১০১। ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার, জ্ঞানীর পক্ষে তিনি নিরাকার।

১০২। যেমন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নাই, ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে সাকাররূপে দেখা দেন; কিন্তু জ্ঞানসূর্য্য উঠলে বরফ গলে যায়।

১০৩। বিচার করতে করতে কিছুই থাকে না। প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

১০৪। পূর্ণজ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। আমিরূপ লুনের পুতুল সচ্চিদানন্দ সাগরে নামলে গ'লে এক হয়ে যায়, আর কোনও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

১০৫। যখন চাষের জন্য পুকুর থেকে মাঠে জল আনে, তখন জলের কত কল্ কল্ শব্দ। যখন পুকুরের ও মাঠের জল একসা হয়ে যায়, তখন আর শব্দ হয় না।

১০৬। যতক্ষণ না কলসীপূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ, কলসীপূর্ণ হলে, আর শব্দ থাকে না।

২০৭। হাজার বিচার করো, 'আমি' যায় না, তাই তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল; ভক্তিপথেই ভগবানকে সহজে পাওয়া যায়।

১০৮। তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদাই তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়। যতক্ষণ ছেলে চুসী নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাটীর সমস্ত কাজকর্ম্ম করে। ছেলের যখন আর চুসী ভাল লাগে না—চুসী ফেলে চীৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ী নামিয়ে দুড়্ দুড়্ করে এসে ছেলেকে কোলে নেয়।

১০৯। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সেই ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানা রূপে নানা ভাবে ভক্তকে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার তিনিই নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে, বহুরূপীর নানা রং, কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আবার কখনও কখনও কোনও রংই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করেই কষ্ট পায়।

১১০। ভক্তি-পথ খুব ভাল আর সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়, আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

১১১। যদি আমার এক ঘটী জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার?

১১২। বেদে ব্রহ্মজ্ঞানের নানা রকম অবস্থা বর্ণনা আছে। সে পথ—জ্ঞান-পথ, বড় কঠিন পথ। বিষয় বুদ্ধির,—কামিনী কাঞ্চনে আসক্তির—লেশমাত্র থাকলে, সে জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

১১৩। বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। এই সাতটি ভূমি মনের স্থান। যখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে মন থাকে, তখন কেবল সংসার বা কামিনীকাঞ্চন চিন্তা। যখন হৃদয়ে মন আসে, তখন প্রথম চৈতন্যের বিকাশ। তখন চারিদিকে ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দর্শন হয়, সংসারের দিকে আর মন যায় না। যখন মন কণ্ঠে উঠে, তখন ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। মনের ষষ্ঠভূমি কপাল। তথায় মন গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়, কিন্তু সেই রূপকে স্পর্শ বা আলিঙ্গন করা যায় না। শিরোদেশে মন গেলে সমাধি হয় এবং ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্পর্শন হয়। এইরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা মানুষ বেহুঁশ হয়ে থাকে, কিছু খেতে পারে না, মুখে

দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই অবস্থায় একুশ দিন থাকলে, দেহ ছেড়ে যায়।* এ'সব কঠিন, ব্রহ্মজ্ঞানীর পথ।

১১৪। সমাধি হলে সব কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। পূজা জপাদি কর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম, সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাঁর নাম গুণ গান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

১১৫। সঙ্কীর্ত্তনে প্রথমে বলে, 'নিতাই আমার মাতা হাতী'—'নিতাই আমার মাতা হাতা।' ভাব গাঢ় হলে শুধু বলে, "হাতী" "হাতী।" তারপর কেবল 'হাতী' এই কথাটী মুখে থাকে। শেষে 'হা' বল্‌তে বল্‌তে ভাব সমাধি হয়। তখন যে ব্যক্তি এতক্ষণ কীর্ত্তন করছিল, সে চুপ হয়ে যায়।

১১৬। যেমন ব্রাহ্মণ ভোজন। প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সমুখে করে বসল, তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল 'লুচি আন' 'লুচি আন' শব্দ হতে থাকে। যখন খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে যায়। যখন দই আসে, তখন সুপ্ সাপ্,—শব্দ নাই বল্লেই হয়। খাবার পর নিদ্রা, তখন সব চুপ।

১১৭। গৃহস্থের বৌ অন্তঃস্বত্ত্বা হলে শাশুড়ী কর্ম্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে কর্ম্ম প্রায় করতে হয় না। ছেলে হলে একেবারে কর্ম্মত্যাগ। মা ছেলেটী নিয়ে কেবল নাড়া চাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা করে।

১১৮। সমাধি হবার পর প্রায় শরীর থাকে না। কারো কারো লোক শিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির, আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেউ কেউ ঝুড়ি কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারু দরকার হয়।

১১৯। মহাপুরুষেরা জীবের দুঃখে সর্ব্বদা কাতর। তাঁরা স্বার্থপর নন, যে আপনাদের জ্ঞান হলেই হল। স্বার্থপর লোকের কথা ত জানো। এখানে মোতো বল্লে মুৎবে না, পাছে তোমার উপকার হয়। দু পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুসে চুসে এনে দেবে।

(ক্রমশঃ)

* গুহ্য—মূলাধার, লিঙ্গ—স্বাধিষ্ঠান, নাভি—মণিপুর, হৃদয়—অনাহত, কণ্ঠ—বিশুদ্ধাখ্য, কপাল—(দ্বিদল) আজ্ঞাচক্র, শিরোদেশ—(সহস্রদল) সহস্রার।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরতি।

(কীর্ত্তনের সুর)

ভাল রামকৃষ্ণ আরতি বাজে।
ভকত মোহিত চিত চৌদিকে রাজে॥
(ভাল সেজেছে রে) (চাঁদকে যেমন তারায় ঘেরে)
ভূতলে অতুল ভূমি, ধন্য যোগোদ্যান।
(সে যে ধন্য হোলোরে) (ধরাধরে হৃদে ধোরে)
চিন্ময় গোলোক, যথা প্রভু বিদ্যমান॥
(সদা নিত্যলীলারে) (নিত্যধাম সম হেথা)
তরু লতা তৃণ পাতা চেতনা বিকাশে।
(তারা গান করেরে) (রামকৃষ্ণ গুণ গাঁথা)
রেণু পরমাণু মাঝে চিন্ময়ী ভাসে॥
(যেন কুমুদী হাসিছে) (পূর্ণ শশধরে হেরে)
সেবক ভকত রাম, হৃদয়েরি ধন।
(এমন সেবক আর নাইরে) (সেবক রামচন্দ্র সম)
যতনে রতন নিধি করিলা স্থাপন॥
(জীবের দুখে কাতর হয়ে) (হৃদয় সম্পুট খুলে)
প্রভুর মন্দির তথা প্রেম সরোবর।
সেবকের সেবা তাহে প্রীতির লহর॥
বেদীর রচনা তথি প্রফুল্ল কমল।
(কিবা শোভা হেরিরে) (শত কমল একাধারে)
ভকত হৃদয় সম শুদ্ধ সুবিমল॥
(স্বতঃ বিকশি রয়েছে) (প্রভু বসিবেন ব'লে)
বিকচ কমলোপরি প্রভু অধিষ্ঠান।
(ঐ যে দাঁড়ায়ে আছে গো) (ভকত জীবন ধন) (আহা কি মধুর হেরি)
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ, বস্ত্র পরিধান॥
সুবাস কুসুমমালা গলে সুশোভন।
(মালা আপনি দোলেরে) (পরিসর শ্রীবক্ষ পেয়ে)

(একি মালার গুণ কি গলার গুণ রে)
জয় জয় রামকৃষ্ণ দেব নারায়ণ ॥
কমলের দলে দলে ভকত সকল।
(যেন বিম্ব প্রতিবিম্ব খেলে)
আনন্দ-বিলাস করে যেন অলিদল ॥
(মধুপান ক'রেরে) (পদ কোকনদ মধু)
ভাবে ভোলা হয়ে কেহ পদে পড়ে ঢোলে।
(তারা মাতোয়ারা রে) (রামকৃষ্ণ মধুপানে)
বাহুতুলে নেচে কেহ রামকৃষ্ণ বলে ॥
(আন্ জানেনারে) (দিবানিশি রামকৃষ্ণ বিনে)
ধ্যানরত বসি কেহ শ্রীপদ ধেয়ানে।
বিবেক বিচারে কেহ বিজ্ঞান বাখানে ॥
ভাব বিভোর প্রভু হাসি সবে চাহে।
মরি কি সুন্দর শোভা মন্দির-গেহে ॥
(হেরি পরাণ জুড়ালো) (ত্রিতাপ জ্বালা দূরে গেলরে)
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
(বাজে কত বাদ্যরে) (প্রভুর আরতি কালে)
মধুর মৃদঙ্গ বাজে হৃদয়-রসাল ॥
জয় রবে ঘড়ী বাজে, বাজিছে কাঁসর।
ভাবে নাচে ভক্তগণ কিবা মনোহর ॥
দামামা ডম্বরু বাজে, ডঙ্কা বাজে ঘন।
(ঐ বেজেছে রে) (রামকৃষ্ণ নামের ডঙ্কা)
শঙ্কিত-হৃদয় ভাগে দুরন্ত শমন ॥
(ভয় দূরে গেলরে) (শমনদমন নাম-রোলে)
তালে তালি দিয়ে সবে নাচে হেলে দুলে।
জয় জয় রামকৃষ্ণ গাহে প্রাণ খুলে ॥
কুমার সন্ন্যাসীবর শ্রীযোগবিনোদ।
প্রভুরে আরতি করে বিনোদ বিনোদ ॥
(ভাল সেজেছে রে) (বিনোদ সজে বিনোদ সাজে)
পঞ্চদীপমালা-জ্যোতি, গন্ধ ধূপ ধূনা।

পুষ্পদলে, বস্ত্র, জলে, করে আরাধনা॥
ব্যজন বীজনে সাধে সুকোমল দেহে।
জয় জয় রামকৃষ্ণ সবে মিলে গাহে॥
(মনের আনন্দ পেয়েরে) (শ্রীআরতি দরশনে)
মধুর মাধুরী হের আরতির শোভা।
পরমপুলকপ্রদ ভক্ত-মনোলোভা॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ পতিতপাবন।
(আমায় দয়া করহে) (তুমিত কাঙ্গালের সখা)
জয় অগতির গতি ব্রহ্ম সনাতন॥
দেবতা দুর্লভ নিধি, দয়া অবতার।
(এমন দয়াল আর নাইরে) (দয়াময় রামকৃষ্ণের মত)
অহেতুক দীনবন্ধু, করুণাপাথার॥
ভকতি বিহীন প্রভু, স্তুতি নাহি জানি।
(কিছুই জানিনাহে) (ভজন পুজন হীন)
কৃপা করি দাও দীনে চরণ দুখানি॥
(আর কিছু চাইনাহে) (ও রাঙ্গা চরণ বিনা)
(ওহে, তোমার কাঙ্গাল তোমায় চাহে)

উপাসনা।

উপাসনা—কাহাকে বলে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে দুটা চাটু কথা বলা, অথবা সচন্দন ফুল বিল্বদলে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্মে প্রণত হওয়া, ঈশ্বরের উপাসনা করা নহে। আমরা ভগবানকে বলিলাম, 'ভগবান! তুমি অনন্ত, অসীম, তুমি দয়াময়, তুমি করুণাধার' তাহা হইলেই কি তাঁহার উপাসনা হইল? নাস্তিকেরা 'ভগবান নাই' বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, তুমি আমি বলিতেছি 'আছ' 'আছ' তাহা হইলেই কি তাঁহাকে উপাসনা করা হইল? তুমি বলিবে—'দেখ ভগবান! নাস্তিকেরা তোমাকে উড়াইয়া দিতেছে, কিন্তু তোমার ভয় নাই, আমরা তোমায় প্রতিপন্ন করিয়া বলিতেছি 'আছ' 'আছ'—এই হলেই কি তাঁহার উপাসনা করা হইল! তুমি আমি কীটাণুকীট তাঁহাকে প্রতিপন্ন না করিলে কি তিনি থাকেন না।

তাঁহাকে 'আছ' 'আছ' বলিলেই কি তাঁহার উপাসনা হয়? এই কথা বলিয়াই কি প্রাণের তৃপ্তিলাভ হয়? দুইটী সংগীত গাহিয়া, একবার বাহু তুলিয়া সংকীর্ত্তনে নাচিয়া, দুটী সৎকথা শুনিয়াই কি আমরা উপাসনার শেষ করিব? এইরূপ করিয়াই কি আমরা বুঝিব যে, ভগবানের যথেষ্ট উপাসনা করা হইল?

না, এরূপ হইলে আমাদের প্রকৃত উপাসনা হইল না। হৃদয় পরিবর্ত্তন করাই প্রকৃত উপাসনা। আত্মার কি উন্নতি হইল—এই জমাখরচ খতানই প্রকৃত উপাসনা। হৃদয়ের মলিনতা কত বাহির হইল, আর কতটুকু পবিত্রতাই বা তথায় প্রবেশ করিল, আমরা ঈশ্বর পথে কতটা অগ্রসর হইলাম এবং সংসারই বা কতটা পশ্চাতে পড়িল, এইরূপ আলোচনা করা এবং সেই মত কার্য্য করাই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা।

মানব অন্তরে বিবেক, বৈরাগ্য, এবং দুষ্কৃত কার্য্য জনিত অনুতাপ যদ্যপি দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, তথায় প্রকৃত উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। অনুতাপ ব্যতীত আত্মার উন্নতি ঘটে না। আমরা অনেক সময়ে অনেক লোককে অনুতপ্ত দেখিতে পাই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সূক্ষ্মরূপে দেখিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য অনুতাপ নাই। কাহারও কাহারও অনুতাপ প্রশংসা লাভের রূপান্তর, অর্থাৎ কোনও প্রকার সুনাম আগে ছিল, কোনও অন্যায় কার্য্য করাতে তাহা লোপ হইতে চলিয়াছে, এই জন্য তিনি লোকের কাছে অনুতাপ করতে লাগলেন, লোক দেখিলেই হা হুতাশ করে 'পা পিছলাইয়া গেছি' বলেন। এই রকম অনুতাপ প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষায়, এ অনুতাপে ঈশ্বর উপাসনা হয় না।

আর এক প্রকার অনুতাপ দেখিতে পাই, তাহা কেবল অহঙ্কার প্রকাশের জন্য। যেমন—'ছি, ছি, তাই ত, আমি হেন লোক, এমন কাজটা করে ফেল্লেম! ছি, ছি, ছুচো মেরে হাতে গন্ধ কল্লেম!' এ এক প্রকার অহঙ্কার প্রকাশ করার অনুতাপ। 'আমি বড় হয়ে, ছোট কাজটা কল্লাম'—এ আত্ম-গরিমা প্রকাশ করার জন্য অনুতাপ। এ সমস্ত অনুতাপ অনুতাপই নয়, এ সকল অভিমানব্যঞ্জক হৃদয়-ছলনা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছে না।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে একটী কথা আছে "Repent ye, for the Kingdom of Heaven is at hand." যখন যীশুবিদ্বেষীরা (এব্রাহেমেরা) জন ইত্যাদির সহিত ধর্ম্মবিবাদ করিতে লাগিল, তখন জন কহিয়াছিলেন, "এইরূপ করিলেই

কি তোমরা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিবে? এইরূপ একটা গোলমাল ও বিবাদ করিয়াই কি তোমরা ঈশ্বরকে লাভ করিবে? একটা অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া কি তোমরা হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চয় করিতে পারিবে? 'Repent, Repent' অনুতাপ কর, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, তবে ত ধর্ম্ম লাভ করবে!"

প্রকৃত অনুতাপ অতি বিরল। যে প্রাণে উহা বিরাজিত, সে প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদে এবং তথায় দীনতা এবং বিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারের অনুতাপই প্রকৃত অনুতাপ। এই অনুতাপে ঈশ্বরের উপাসনা হয়। যাহাদের এইরূপ অনুতাপ আছে, তাহাদের প্রাণে ভগবানের প্রতি আশা ভরসার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বলে "ভগবান! আমরা দীন হীন কাঙ্গাল, পাপী তাপী নরাধম, আর তুমি এমনি দয়াল, এমনই কৃপাময় যে, আমাদের জন্যও তোমার দয়া অনিবার রহিয়াছে।" প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তি নিজেকে দীন এবং ছোট দেখে, অথচ ভগবানের কৃপার প্রতি যথেষ্ট ভরসা রাখে। ভগবানের দয়ার প্রতি সর্ব্বস্ব নির্ভর করাই উপাসনা। যে ব্যক্তি প্রাণ মন তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিতে পারে, উপাসনার জন্য তাহার আর দ্বিতীয় কোনও প্রকার পন্থা আবশ্যক হয় না।

যাহাদের এইরূপ অনুতাপ আছে, যাহারা নিজেকে অধম মনে করে, অথচ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রাণ মন ঢালিয়া দেয়, তাহাদের মধ্যে প্রেমভক্তি আপনি জাগিয়া উঠে। তাহারা বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, কিন্তু ক্রমে তাহাদের প্রাণ শান্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। অনুতপ্ত হৃদয়ের আকর্ষণে ভগবান আর দূরে থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে তখন অসীম অনন্ত সর্ব্ব-ব্যাপীরূপে দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। তখন ভগবান তাহার নিকট হইতেও নিকটে এবং অন্তরের অন্তরে বিহার করেন। অনুতপ্ত হৃদয় তাঁহাকে প্রাণের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আলিঙ্গন করিয়া শীতল হয়।

দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ চলিয়াছে, আমরা কি করিলাম? কতটুকু জীবনের উন্নতি করিলাম? ভগবানকে লাভ করার উদ্দেশ্যে কতটুকু ব্যাকুল হইয়া কাঁদিলাম? আজ এই নববর্ষে, এস সকলে, তাঁহার শ্রীচরণে একবার জীবনজ্বালা ব্যক্ত করিয়া দুই ফোঁটা চক্ষের জল ঢালিয়া দি। তাঁহার প্রতি প্রাণের অভ্যন্তর হইতে প্রীতি উদ্ভূত করিয়া, এস সকলে বলি "হে দয়াময়, হে করুণাময়, আমাদিগকে তোমার প্রেমে উন্মত্ত করিয়া দাও, আমাদের

মন প্রাণ যেন তোমাতেই উন্মুখ থাকে, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্ম ভুলিয়া আমরা সংসারে আকৃষ্ট না হই। তোমার করুণা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই, আমাদের নিস্তার নাই। দয়াময়! দয়া কর, আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত অনুতাপ প্রদান করিয়া, প্রাণকে তোমার পানে আকৃষ্ট করিয়া, তোমার প্রেমে উন্মত্ত করিয়া দাও।"

পাপী তাপী নরে, আজিকে দুয়ারে,
ডাকিছে কাতরে, শুনহে দয়াময়।
পাপের দহনে, দহিছে পরাণে,
এসেছি চরণে, লইতে আশ্রয়॥
ভুলি তোমাধনে, সুখের কারণে,
ভবের কাননে, কাঁদিয়া চলেছি।
মোহের আঁধারে, পাপের বিকারে,
সে বন মাঝারে, পথ যে ভুলেছি॥
সুধার সরসে, ছাড়িয়া হরষে,
প্রাণের পিয়াসে গরল পিয়েছি।
সেই বিষপানে, দেখিনি নয়নে,
ডাকিয়ে জীবনে মরণে এনেছি॥
ভজিয়ে অসারে, মজিয়ে সংসারে,
ডুবেছি পাথারে, উঠিতে না পারি।
হয়েছি হীনবল, ঘিরেছে শত্রুদল,
ভরসা কেবল করুণা তোমারি॥
নাহিক শকতি ওহে জগপতি,
কিবা হবে গতি, এ ঘোর আঁধারে।
তব কৃপা বিনে, গতি যে দেখিনে,
আকুল পরাণে ডাকিহে তোমারে॥
এসহে দয়াল, ঘুচায়ে জঞ্জাল,
কাটিয়ে মোহজাল হওহে উদয়।
হেরিয়ে সে জ্যোতি, জাগুক শকতি,
পাইব সদ্গতি পূজিয়ে তোমায়॥

জাগরণ।

ধীরে ধীরে সান্ধ্য গগনের রবি অস্তমিত হইল, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার শ্যামল ছায়া ধরণীর গায়ে ছড়াইয়া পড়িল, কি যেন এক গভীর অবসাদে প্রকৃতি দেবী ম্লান হইয়া পড়িলেন। শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে, নর নারী আপনাপন বিষাদ জীবনের কাহিনী অর্দ্ধপথে অসমাপ্ত রাখিয়া, শান্তির আশায় কোন এক অনির্দ্দিষ্ট পথপানে নিদ্রাজড়িত নয়নে আশাপথ চাহিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

বাহ্যজগত স্থির ধীর নীরব নিস্পন্দ, যেন ঘোর সুষুপ্তি মগ্ন, চেতনার চিহ্নমাত্র নাই। আকাশে অসংখ্য তারকা মিটি মিটি জ্বলিতেছে—কাহার পানে চাহিয়া, কাহার আশায় কে জানে! আকাশের কোন কুক্ষিতে তাহাদের এই দৃষ্টি কেন্দ্রিভূত তাহা কে বলিতে পারে? অথবা তাহারা কাহার আশা-পথ চাহিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেছে, এ রহস্য কাহার গোচরীভূত? বাহ্যজগত কি সুপ্ত? ঐ যে আকাশে অগণন তারকা প্রহরীর ন্যায় জাগরিত, ঐ যে ঝির ঝির শব্দে মৃদু মন্দ মলয়-পবন বহিতেছে, ঐ যে অসংখ্য কুসুম-কোরক ফুটিয়া উঠিয়া তাহার পরিমল মলয়-মারুতের অঙ্গে মাখাইয়া দশদিশি আমোদিত ও প্রফুল্লিত করিতেছে, নদ নদী সেই একই রূপে চঞ্চল তরঙ্গমালা বক্ষে লইয়া তটভূমি চুমিয়া ছুটিতেছে, কৈ সুষুপ্তির ত কোন চিহ্ন নাই! কেবল নীরব নিস্তব্ধতা মধ্যে অলক্ষ্যে প্রকৃতি-দেবীর কর্ম্মের প্রবাহ ছুটিতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রান্তি নাই।

এই অবিশ্রান্ত প্রবাহমান কর্ম্মস্রোতের কি কোন লক্ষ্য নাই? কি কোন উদ্দেশ্য নাই? ইহা কে অস্বীকার করিবে? অবশ্যই আছে, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকের বিজয় ঢক্কার গুরু গম্ভীর নিনাদে [illegible] জগত মুখরিত, কাহারও সাধ্য নাই যে, এই মহান্ বিরাট কর্ম্মস্রোতকে একটা উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করে। সে উদ্দেশ্য কি? লক্ষ্য কি?—সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা, সমতা, প্রকৃতিদেবী এই আশা-বক্ষে পোষণ করিয়া এই দিগন্তব্যাপী, মালাব্দযুগকল্প ধরিয়া এই অবিরাম কর্ম্মস্রোতের মাঝে অচলা অটলা।

জগতের নর নারী সকলেই কি সুপ্ত? সকলেই কি গভীর অবসাদে ক্লান্ত, চিন্তাভারে খিন্ন, তন্দ্রাপীড়িত নয়নে জড়ভাবাপন্ন? ইহা বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন না। দেশের ও কালের ব্যবধান ছিন্ন করিয়া ঐ

দেখ, আর্য্যঋষিগণ জ্ঞানের খনি আলোড়িত করিয়া কি অপূর্ব্ব মণি গ্রথিত করিতেছেন। ঐ দেখ, মারবিজয়ী তথাগত গভীর যোগে ধ্যানের স্রোত ছুটাইয়া দিয়াছেন। ঐ যে ঈশার জলন্ত বিশ্বাসে অন্ধ দেখিতে পাইতেছে, খঞ্জ হাঁটিতেছে, ঘোর বাত্যাবিঘূর্ণিত তরঙ্গরাজি প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে। ঐ যে চৈতন্যের উচ্ছ্বসিত ভক্তির তরঙ্গে সমুদায় ভাসিয়া যাইতেছে। কত বলিব,—সর্ব্বশেষে ঐ যে দরিদ্র নগণ্য ব্রাহ্মণ সরলতায় জ্ঞানে ও প্রেমে সকলের হৃদয় মাঝে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিলেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া কি করিয়া বলিব, সকলে সুপ্ত, সকলে অলসতার কোলে সুখতন্দ্রাভিভূত। যে আশা হৃদয়ে ধরিয়া প্রকৃতি আজ মহিমাময়ী, সৌন্দর্য্যের রাণী, আত্মার জগতে কি তাহার কোন ক্রিয়া নাই, ইহা কি করিয়া অস্বীকার করিব? যে কর্ম্ম স্রোত আত্মার জগতের ভিতর দিয়া বহিতেছে, তাহাতে আরোহণ করিয়া মহাপুরুষগণ সত্য ন্যায় প্রেম ও পবিত্রতার কমনীয় ভূষণে ভূষিত হইয়া, মানব সমাজের আদর্শরূপে দণ্ডায়মান। ঋষিগণ অমৃত লাভের আশায় মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তথাগত মানবের দুঃখবিমোচনের আশায় রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া কঠোর তপোমগ্ন হইয়াছিলেন, ঈশা পশুপ্রকৃতি মানবকে পিতার অপার করুণা বুঝাইবার আশায় অকাতরে বলিদানকাষ্ঠ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এইরূপ কত শত মহাপুরুষের পদচিহ্ন আমাদের সমক্ষে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহাদের ওজস্বিনী বাণী মানবের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, দুর্ব্বল মানবজাতির ক্ষীণ স্নায়ু পেশিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে।

সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, সমস্ত দিনের ব্যস্ততা ব্যাকুলতা শান্ত হইয়াছে, শ্রান্তিহরা নিশাদেবীর আগমনে সকলে নিদ্রার কোমল অঙ্কে অঙ্গ ঢালিয়া সুখ নিদ্রায় বিভোর। কিন্তু প্রকৃতিদেবীর শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, নীরবে নিশ্চিন্তরূপে আপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর। যখন জনমানব কেহই জাগরিত নাই, পশুপাখির কাহারও সাড়াশব্দটি পর্য্যন্ত নাই, তখন চারিদিক নীরব নিস্পন্দ, সেই ঘোরা তিমিরাবরণা দ্বিপ্রহরা রজনীতে সাধক, আদর্শমানব, আশানদীতে অবগাহন করিয়া গভীর আত্ম-নিমজ্জন যোগে বদ্ধপরিকর। কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে যাহারা জাগরিত, তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য, সমস্ত মানবজাতির তুলনায় উহা নগণ্য।

সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, সরোবরে কমল শুকাইয়াছে, গোধূলি গগনের গায় সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়াছে, এ সমস্ত সত্য; আবার ঐ দেখ, কহ্লার ফুটিল, বেল জুঁই

মল্লিকা গন্ধরাজ সৌরভে দিক আমোদিত করিয়া হাসিল, আকাশ তারার মেখলায় সাজিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, ইহাও সত্য। এই দশা বিপর্য্যয়, ভাবের বৈচিত্র্য, ইহা ত দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ ঘটনা, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, অদ্ভুত নিয়মানুবর্ত্তিতা, লক্ষ্যের আশ্চর্য্য স্থিরতা, ভাবিয়া দেখিলে মহান্ বিষয়ে অভিভূত হইতে হয়। প্রকৃতিদেবী শত বিঘ্ন বাধা সত্বেও, সহস্র দশা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও, আপনার উদ্দেশ্যচ্যুত, আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না; আর মানব! তুমি আমি সামান্য আঘাত, অকিঞ্চিৎকর বাধা অতিক্রম করিতে শ্রম কাতর হইয়া পড়ি, নিরাশায় ভগ্নহৃদয় হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়ি, ইহাই কি আমাদের মানবজন্মের সার্থকতা।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে আবার উঠিবে, কমল শুকাইয়াছে আবার ফুটিবে, গোধূলির গগনে আবার প্রদোষের অরুণাভা খেলিবে, কিন্তু মানব! তোমার ক্লান্তিভরা দেহে, মালিন্যপূর্ণ হৃদয়ে, মোহতন্দ্রাজড়িত নয়নে কি আবার আলোক ফুটিবে না? তোমার সাধের জীবনপ্রদীপ যে নির্ব্বাণোন্মুখ, তোমার সাজান ফলপুষ্পশোভন কুঞ্জকানন যে শ্মশানে পরিণত, কুমুদ কহ্লার ভরা সরসী পূতিগন্ধময় পঙ্কে আবৃত, আর তুমি সুখ নিদ্রায় বিভোর।

ওঠ, ওঠ, হিমাচ্ছন্ন সিংহ! চেয়ে দেখ, তোমার চারি পাশে কেমন উজ্জ্বল বিমল কিরণ প্রতিভা বিকশিত জগত, তুমি যাহাকে সামান্য অকিঞ্চিৎকর জড় পদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসিতেছ, তাহার প্রত্যেক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য কর দেখিবে, অদ্ভুত শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ; ফলফুল প্রভৃতির পানে চাহিয়া দেখ, কি সুন্দর বিকাশ, কি আশ্চর্য্য পরিণতি; জগতের প্রতি কি নিঃস্বার্থ দান। আর তাহাদের উপদেশ বাণী কাণ পাতিয়া শুনো কি বলিতেছে—"বিকশিত হও, প্রকাশিত হও, জাগরিত হও, জগতকে মহিমান্বিত কর।" বাহ্য-জগত হইতে আমরা নিয়তই এই শিক্ষা পাইতেছি, আরও একটু অগ্রসর হইয়া বহির্জগত হইতে দৃষ্টি সরাইয়া অন্তর্মুখি করিয়া ঐ শুনো, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—"বিকশিত হও, প্রকাশিত হও, জাগরিত হও, সংবুদ্ধ হও।" বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন সুদূর অতীত হইতে কি এক ওজস্বিনী বাণী নব প্রভাতের সমীরণে খেলিতেছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" প্রভাতী সমীরণের সংস্পর্শে চারিদিকে কি একটী চাঞ্চল্যের, কি একটী চৈতন্যের অনুভব হইতেছে। দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অসন্তোষ, আলাযন্ত্রণার হাত এড়াইবার জন্য, ঘোর অজ্ঞান সুষুপ্তিকে আলিঙ্গন

করিয়াছ, কিন্তু হায় মানব! জাননা যে, ঐ সমস্ত অনর্থের একমাত্র প্রসূতি এই মোহ নিদ্রা। মিথ্যা ঘোর সংসার তরঙ্গ দেখিয়া বৃথা আতঙ্কে শিহরিতেছ, কল্পিত অবসাদে শ্রান্তি বোধ করিতেছ, ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত সুখদুঃখের জীবন-কাহিনী রচনা করিয়া কি অপূর্ব্ব নেশার ঘোরে চিরমগ্ন রহিয়াছ, এতই দুর্ব্বল চিত্ত যে নিজের প্রতি বিশ্বাসহীন, সেই হেতু আশাহীন, সততই নিরাশার সাগরে মুহ্যমা ফলে চেষ্টাহীন। বিশ্বাস নাই, আশা নাই, চেষ্টা আসিবে কোথা হইতে করী শক্তির অভাব, কাজেই জড়তা, তৎফলে জীবনে দুঃখ, সুতরাং শান্তিহীন।

ধীরে ধীরে পূর্ব্বভাগে তিমির লেখা অপসারিত হইতেছে, নিশা অবসান প্রায়, বিহঙ্গগণ কলগীতি গাহিতেছে, কাননে কুসুমপাঁতি ফুটিয়া প্রভাতী হিল্লোলে অঙ্গ দোলাইয়া তাহার সঙ্গে আপন সৌরভ মাখাইয়া দিক আমোদিত করিতেছে। ওঠ, ওঠ, সুপ্ত মানব! নিদ্রা ভাঙ্গিয়া নয়ন মেলিয়া চাও। দেখ, দেখ, নব রাগে স্বর্ণবর্ণ কিরণরাশি ছড়াইয়া মরিচীমালী উদিত হইতেছে, ঐ শুন কলতানে বিহঙ্গগণ অগ্রে তাহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। দেখ দেখ, সুন্দর শ্যামল ধরা অশ্রুসিক্ত ফুলদল লইয়া অর্চ্চনা করিতেছে, ওঠ ওঠ অশান্তিতাপিত তুমিও শয্যা ত্যাগ কর, অর্ঘপাত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হও, চেয়ে দেখ, তোমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বর বরাভয়করে আশীষ-অঞ্জলি লইয়া দণ্ডায়মান, যাঁহাকে তুমি অনন্তের কোন নিভৃত নিকেতনে রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামগ্ন ছিলে। উঠিয়া দেখ, তিনি তোমার হৃদয় দুয়ারে আসিয়া দণ্ডায়মান, তুমি আসন রচনা কর, অর্ঘ লইয়া চির ঈপ্সিত চিরবাঞ্ছিতকে বরণ করিয়া অশান্তিতাপিত পিপাসু চিত্তকে শান্ত কর।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার দত্ত।

সে মোর কোথায়!

১

ওহে সুধাকর—পূর্ণ শশধর,
সুধাবিন্দু যার ঢালিছ ধরায়,
পার কি সুধাংশু! পার কি বলিতে,
মহা সুধাসিন্ধু—সে মোর কোথায়!

২

বনের বিহঙ্গ, হে কোকিল ভৃঙ্গ,
করিছ নিতুই যার গুণ-গান,
পার কি তোমরা,—পার কি বলিতে,
কোথা আছে মোর সে গুণ-নিধান!

৩

মাগো স্রোতস্বিনি! এ ভব-সংসারে,
বিতরিছ যার করুণা-আসার,
পার কি জননি! পার কি বলিতে,
সে করুণালয় কোথায় আমার!

৪

কাননে কাননে, কুঞ্জে কুঞ্জে যার,—
গায়ের সৌরভ কর বিতরণ,
পার ফুলবালা! পার কি বলিতে,
কোথা মম সেই সৌরভ-ভবন!

৫

পার কি গো উষা! পার কি বলিতে,
কোথা মম সেই সৌন্দর্য্য-আধার!
হ'য়েছ সুন্দরী, ভুবন মোহিনী,
সৌন্দর্য্যের কণা লইয়ে যাহার।

৬

যাহার আলোকে আলোকিত হ'য়ে,
ভূলোকে পুলকে কর আলো দান,
পার কি হে রবি! পার কি বলিতে,
কোথা মম সেই মহা জ্যোতিষ্মান!

৭

বাঁচাও ভুবন, ওহে সমীরণ,
লইয়ে নিঃশ্বাস পবন যাহার,
পার কি বলিতে, আছে সে কোথায়,
সে মহাসমীর প্রাণেশ আমার!

৮

বল গো প্রকৃতি! বল দয়া করি,
তোমারে কাতরে এ দীন সুধায়,
প্রাণনাথে মোর, লুকাইয়ে তুমি,
নিভৃতে গোপনে রেখেছ কোথায়!

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

কেহ নাই আর!

(১)

হে প্রাণেশ! তুমি মোর,
প্রাণ মন, জীবন-জীবন।
হৃদয়-জলধি-নিধি,
তুমি মোর সাধনার ধন॥

(২)

তুমিই আমার নাথ,
জীবনের সরবস্ব-সার,
পিতামাতা-বন্ধু-সখা,
সমুদয় তুমিই আমার॥

(৩)

এ ভব জলধি জলে,
দেহ-তরী সদা ভাসমান,
একমাত্র কর্ণধার,
তুমি তার, হে মহাপরাণ।

(৪)

এ সংসারে তুমিই ত,
প্রিয়তম, আপন আমার,
তুমি ভিন্ন, অন্য মোর,—
কেহ নাই,—কেহ নাই আর!

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

রামকৃষ্ণ-সংগীত।

কীর্ত্তন—একতালা।

গাও গাও ভাই, আনন্দে সবাই (মধুর) রামকৃষ্ণনাম বদনে।
(ওরে) হেলায় যাবি পারে, সংসার দুস্তরে, ঘুচে যাবে মোহবন্ধনে॥
(ভব কর্ণধার ঐ এসেছে)
'মা' 'মা' ব'লে কেঁদে গঙ্গার পুলিনে, (ও তা'র) কতদিন গেছে কেই বা তা জানে,
(ওসে) এসেছে গোপনে, সেধেছে বিজনে, (হ'য়ে) বঞ্চন কাম কাঞ্চনে॥
(নিজে সাধনের ধন হ'য়ে) (জীবের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে)
(দীনের ঠাকুর দীনের বেশে)
কোন যুগে হেন হয়নি হবেনা (কেউ) কখন এমন দেখেনি দেখবে না,
(জীবের) দুয়ারে দুয়ারে কেঁদেছে ফিরেছে জীবের দশা হেরি নয়নে॥
(যে না এসেছে, নিজে সেধে গেছে) (এমন দয়াল আর দেখি না)
তনুখানি তা'র দয়াতে বিকল, সংসার-বিদেশে আঁধারের আলো,
(ওসে) কৃপার তরণী ভাসায়ে আপনি, ডেকে ডেকে গেছে দীনজনে॥
(ভব কর্ণধার ঐ এসেছে) (এমন দয়াল আর কে আছে)
(নিজে দ্বারে দ্বারে ডেকে গেছে)
চারি বেদ মথি রামকৃষ্ণ নাম, (তা'র) চারি বর্ণে সুধা ঝরে অবিরাম,
(ওরে) পান ক'রে নে না, যত দীনজনা, (আর) ভবে আনাগোনা রবে না॥
(এমন দিন আর হবে না) (জীবের ভাগ্যের আর নাহিক সীমা)

ভয় নাই ভাই আব্রহ্ম পাতকি, নাম সার কর কে আছ নারকী,
সে যে বকল্‌মা নিয়েছে, সব ভার গেছে (আর) কর্ম্মফলে মোরা ভয় করিনে॥
(কর্ম্মফলের কর্ত্তা এসে) (দয়াল রামকৃষ্ণ এসে)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভারতী গীতি।

(আজি) ভারতে ভারতী এল, নতি চরণে।
করে হেম-বীণা, তুলিয়ে মূর্চ্ছনা,
রাগ রাগিণীধ্বনি মধুর তানে॥
বহে সঙ্গীত-লহরী গো—
(তা'র) (ভাসে গায়ক মন প্রাণ)
গীত-ব্রহ্মবারি,
পিয়ে অঞ্জলি করি সুজনে॥
শুনি মঙ্গল ভজন গো—
দলে দলে শুন, পল্লীবালগণ
করে উচ্চারণ ;
জ্ঞান-কমল ফুটিল গো—
(হৃদি-সরসে দলে দলে)
সৌরভ উড়িল,
(মন) ভ্রমর ছুটিল পিয়াসী প্রাণে॥
ঐ মা কেমন সেজেছে গো—
অভয় দিতেছে, মানব মেতেছে
জগত জেগেছে ;—
জ্ঞান-হৃদয়-রঞ্জিনী গো—
(এস মানসে বস মা গো)
(দিব্য) জ্যোতি বিকাশিনি (মানস) আঁধার নাশ কৃপা করি অধীনে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

অবনীতে আবির্ভাব।

(১)

হে প্রাণেশ! স্বরূপ-বিচারে,
তুমি নহ নন্দের নন্দন,
নহ তুমি, নহ জীবনেশ!
যশোদার যাদু বাছা ধন।

(২)

বিশ্বরূপ! স্বরূপ তোমার,
চিন্তি যদি, এই মনে হয়,
নহ তুমি বসুদেব-সুত,
নহ তুমি, দেবকীতনয়।

(৩)

হরি! তব চিন্তিলে স্বরূপ,
মনে হয় স্বতঃই আমার,—
তুমি নহ, দশরথ-সুত,
নহ তুমি কৌশল্যা-কুমার।

(৪)

অজ তুমি, আদি অন্তহীন,
পরব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড নিলয়,
তব অণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
তব সত্ত্বা এ ব্রহ্মাণ্ডময়।

৫

তুমি—

রূপহীন, ওহে বহুরূপি!
গুণহীন, হে গুণনিধান,
তুমি সূক্ষ্ম পরমাত্মা রূপে,
ঘটে ঘটে সদা বিদ্যমান।

৬

যুগে যুগে তবে যে তোমার,
অবনীতে হেরি আবির্ভাব,
সে ত নাথ! এস গো স্থাপিতে,
সনাতন সত্য ধর্ম্ম ভাব।

৭

সে ত নাথ! নাশিতে দুর্জ্জনে,
ভক্ত বাঞ্ছা করিতে পূরণ,
কর ওহে ভকত বৎসল!
ভক্তকুলে জনম গ্রহণ।

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ পৃষ্ঠার পর)

৫২০। সাধুদের মধ্যে যাঁদের সামান্য আধার, তাঁরা লোক্-শিক্ষা দিতে ভয় পান; হাবাতে কাঠ নিজে এক রকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখী এসে বসলে, ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঁঠ। একাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

১২১। ঈশ্বরের কার্য্য আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই বুঝা যায় না। ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করবেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখলেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল পড়ছে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন, ভাই, কি আশ্চর্য্য! পিতামহ ভীষ্মদেব, যিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদচেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম বল্লেন, "কৃষ্ণ! তুমি বেশ জান, আমি সেজন্য কাঁদচি না। যখন ভাবচি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান নিজে সারথি, তাদেরও দুঃখের, বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে করে কাঁদচি যে, ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

১২২। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার মানতে হয়। একজন গভীর বনে শব সাধন করছিল, করতে করতে কত বিভীষিকা দেখতে লাগলো, শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে গাছে চড়ে ছিলো, সে এই সব দেখে, নেমে এসে শবের উপর বসে মাকে ডাকতে লাগলো। একটু পরেই মা সাক্ষাৎকার হয়ে বল্লেন 'বর নাও'। সে প্রণাম করে মাকে বল্লে 'মা! যে এত আয়োজন কল্লে, তাকে তোমার দয়া হলোনা, আর আমি কিছুই জানি না, সাধনহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হলো কেন মা?' ভগবতী বল্লেন 'বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাট হয়ে গেল এবং আমার দর্শন পেলে।'

১২৩। আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হয়, আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

১২৪। যদি কেউ ঈশ্বর দর্শনের পর শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞান লাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পার, আবার ভেঙ্গে ফেলতেও পার।

১২৫। বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের হুঁস আর কোন মতে হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

১২৬। উট কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ে, তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর আবার যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে

গেল, কি অসতী হোলো, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল, কত শোক পেলে, কিন্তু কিছুদিন প'র সব ভুলে গেল, সেই ছেলের মা, আবার একদিন চুল বাঁধলে, গয়না পরলে। একটা মেয়ের বিয়ে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে, আবার বছর বছর ছেলে মেয়েও হচ্ছে। মোকর্দ্দামা করে সর্ব্বস্ব যায়, আবার মোকর্দ্দামা করে। যে সব ছেলে পুলে হয়েছে, তাদের খাওয়াতে, পরাতে, কি ভাল জায়গায় রাখতে পারে না, তবুও বছর বছর ছেলে হচ্ছে।

১২৭। সংসারী লোকের আবার কখনও কখন সাপের ছুঁচো গেলা গোছ হয়। গিলতেও পারেনা, ওগরাতেও পারে না। বেশ বুঝেছে যে সংসারে সার নাই—আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া—তবু ছাড়তে পারে না। তবু ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

১২৮। সংসারী লোককে সংসার থেকে সরিয়ে যদি ভাল জায়গায় রাখা যায়, তা হলে হেদিয়ে হেদিয়ে মরে যাবে। বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই আনন্দ, তাতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়, যদি তাকে এনে ভাতের হাঁড়িতে রাখো, সে মরে যাবে।

১২৯। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে, তবে এই কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি থেকে জীব মুক্ত হতে পারে।

১৩০। হচ্চে, হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্, এ সব মন্দ-বৈরাগ্য। যার তীব্র-বৈরাগ্য তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল, মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল।

১৩১। যার তীব্র-বৈরাগ্য সে ভগবান বৈ আর কিছু চায় না। সংসারকে পাতকুয়া দেখে; মনে হয় বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কালসাপ দেখে, কাছ থেকে পালিয়ে যায়। "বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বর চিন্তা করবো"—এ কথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক্।

১৩২। তীব্র বৈরাগ্যের একটা গল্প শোনো। একটা দেশে খুব অনাবৃষ্টি হয়েছে, চাষারা সব খানা কেটে দূর থেকে নদীর জল মাঠে আনছে। একজন চাষার ভারি রোক, সে প্রতিজ্ঞা কল্লে, খানায় নদীর জল এনে তবে ছাড়বে। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ খুঁড়ে যাবে। এদিকে নাওয়া খাওয়ার বেলা হলো। চাষার স্ত্রী মেয়েকে দিয়ে মাঠে তেল পাঠিয়ে দিলে, মেয়ে গিয়ে বল্লে 'বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ভাত খাবে চল।' সে বল্লে, 'তুই যা, আমার এখন কাষ আছে।' বেলা

দুপুর একটা হোলো, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। তখন তার স্ত্রী মাঠে এসে বল্লে, 'এখনও নাওনি কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি! এখন এই পর্য্যন্ত থাক না, আবার না হয় কাল করবে, কি খেয়ে দেয়ে করবে।' এই শুনে সে স্ত্রীকে গালাগালি দিয়ে, কোদাল হাতে করে তাড়া করলে। স্ত্রী বেগতিক দেখে দৌড়ে পালালো। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে, তখন নদীর জল কুল কুল করে মাঠে আসতে লাগলো। চাষার মনে আনন্দ আর ধরে না। তখন সে বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বল্লে 'নে এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ।' এইটী তীব্র বৈরাগ্যের উপমা। আর একজন চাষা সেও মাঠে জল আনছিলো। তার স্ত্রী গিয়ে যখন বল্লে 'অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই'—তখন সে কোদাল রেখে বল্লে, 'তুই যখন বলচিস তা চল্।' সে চাষার আর মাঠে জল আনা হলোনা। এটী মন্দ-বৈরাগ্যের উপমা। খুব রোক না হলে যেমন চাষার মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বর লাভ হয় না।

১৩৩। কামিনীকাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা চলে যায়।

১৩৪। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। এই কাঞ্চনের জন্য পরের দাসত্ব করতে হয়, স্বাধীনতা চলে যায়, মনের মত কাজ করতে পারা যায় না।

১৩৫। জয়পুরে গোবিন্‌জীর পূজারিরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই, তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তারা না গিয়ে বলেছিল 'রাজাকে আসতে বলো।' তারপর রাজা ও আর পাঁচজনে মিলে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে আর ডাকতে হতোনা, নিজেরা গিয়েই উপস্থিত। 'মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি, এই নির্ম্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন' বলে গিয়ে সব দাঁড়াতে লাগলো। কাজেকাজেই আসতে হয়, আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতে খড়ি, এই সব।

১৩৬। বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হলো, তখন বীরভদ্র ভাবলেন যে, লোকে যদি না জেনে এদের কাছে কোন অপরাধ করে, তবে তাদের ভারি অনিষ্ট হবে। এই ভেবে তিনি তেরশো নেড়ী ঠিক করলেন এবং একদিন শিষ্যদের গঙ্গাস্নান করতে পাঠালেন।

একশো ন্যাড়ার মনে কিরূপ একটা সন্দেহ উপস্থিত হোলো, তারা ভাবলে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করতে নাই, মহাপাপ হবে, তারা এই ভেবে, সরে পড়লো। বাকি বারশো যখন ফিরে এলো, তাদের বীরভদ্র বললেন, যে তোমরা এই তেরশো নেড়ীকে বিবাহ করো। স্ত্রীসঙ্গ হতেই তাদের সে তেজ তপস্যা সব চলে গেল, আর কিছুই রইলো না।

১৩৭। দেখছো ত, কত পাশকরা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, সাহেবদের চাকরী স্বীকার করে, তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল 'কামিনী'। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে, এখন আর হাট তোলবার যো নাই! তাই অত অপমান স্বীকার, অত দাসত্বের যন্ত্রণা।

১৩৮। যদি একবার তীব্র-বৈরাগ্য হয়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তা হলে আর মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাকলেও মেয়ে মানুষে আসক্তি থাকে না—তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বক পাথর খুব বড় হয় আর একটা অতি সামান্য হয়, তা হলে লোহাকে কোনটা টেনে লবে? বড়টাই টেনে লবে। ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর। কামিনী কি করবে?

১৩৯। যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না। তিনি ঠিক দেখেন যে, মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর তাই মা বলে সকলকে পূজা করেন।

১৪০। আচার্য্যের কাজ করা বড় কঠিন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও লোকে শুনবে না। সে উপদেশের কোনও শক্তি নাই। আগে সাধন করে বা যে কোনরূপে হোক্ ঈশ্বরকে লাভ করতে হয়। তাঁর আদেশের পর আচার্য্য হওয়া যায়, লেকচার (Lecture) দেওয়া যায়।

১৪১। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়।

১৪২। মানুষের কি সাধ্য যে, অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে।

১৪৩। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নাই!

১৪৪। যদি সদ্গুরু হয়, তাহলে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

১৪৫। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি-অকর্ত্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি ত জীবন্মুক্ত হয়ে গেল, তার আর ভয় নাই।

১৪৬। মায়া বা অহং মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায়, তা হলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

১৪৭। আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র—যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে, লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই।

১৪৮। জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু মায়া বা অহঙ্কার বশতঃ নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

১৪৯। এক একটী উপাধি হয় আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালপেড়ে কাপড় পরে, অমনি দেখবে তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে, সে অমনি সিস্ দিতে আরম্ভ করে, আর সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে টানতে থাকবে।

১৫০। টাকাও একটী বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়, আর সে মানুষ থাকে না।

১৫১। একটা ব্যাঙের একটী টাকা ছিল। তার গর্ত্ত ডিঙ্গিয়ে একটা হাতী চলে গিছিল। ব্যাঙ রেগে বেরিয়ে এসে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগলো, আর বল্লে, কার এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যায়। টাকার এত অহঙ্কার!

১৫২। যে আমিতে সংসারী করে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই আমিই খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে এই 'আমি' মধ্যখানে আছে ব'লে। জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায় তা হলে দুইটা ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ একজল লাঠিটার দরুণ দুটা দেখাচ্ছে। অহংই ঐ লাঠি। লাঠি তুলে নাও, সেই একজলই থাকবে।

১৫৩। "বজ্জাৎ-আমি" বলে যে, আমায় জানে না। আমার এত

টাকা, আমায় চেয়ে কে বড় লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরী করে থাকে, তবে প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপর চোরকে খুব মারে, তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায়। "বজ্জাৎ-আমি" বলে, জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে। এত বড় আস্পর্দ্ধা।

১৫৪। দুই একটী লোকের সমাধি হয়ে "অহং" যায় বটে কিন্তু প্রায় সকলের যায় না। হাজার বিচার কর "অহং" ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত হয়। আজ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ী বেরিয়েছে।

১৫৫। যদি একান্তই "আমি" যাবে না, তবে থাক্ শালা "দাস-আমি" হয়ে। 'হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু আমি দাস' এই ভাবে থাকো। দাস-আমি, ভক্ত-আমি, এরূপ আমিতে দোষ নাই। মিষ্ট খেলে অম্বল হয় কিন্তু মিছরী মিষ্টের মধ্যে নয়।

১৫৬। জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগত প্রাণ, দেহাত্মবুদ্ধি অহংবুদ্ধি যায় না, তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ।

১৫৭। যদি ঈশ্বর লাভের পর "দাস-আমি' বা "ভক্ত-আমি" থাকে সে ব্যক্তি কারও অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোণা হয়ে যায়, তরবারের আকার থাকে কিন্তু তাতে হিংসা করা চলে না।

১৫৮। নারকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝড়ে পড়ে গেলে কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটী টের পাওয়া যায় যে, এককালে এইখানে নারকেলের বেল্লো ছিল। সেই রকম যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে, তার অহঙ্কারের দাগমাত্র থাকে, কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকে।

১৫৯। "আমি দাস, তুমি প্রভু" "আমি ভক্ত, তুমি ভগবান" এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

১৬০। ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানও হয়। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু' 'আমি ছেলে, তুমি মা,' এই অভিমান রাখতে চায়।

১৬১। ভক্তি করলেই অমনি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি বা রাগাভক্তি না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, তাঁর উপর ষোলআনা মন হবে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ ভালবাসা হবে, তবে তাঁকে পাবে।

১৬২। আর এক রকম ভক্তি আছে, তার নাম বৈধি-ভক্তি। এত জপ করতে হবে, উপোস্ করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এত উপচারে পূজা করতে হবে, এতোগুলি বলিদান দিতে হবে এ সব বৈধি ভক্তি। এ সব করতে করতে তবে রাগ-ভক্তি আসে।

১৬৩। বিধিবাদীয় ভক্তি — যেমন হাওয়া পাবার জন্য পাখা করা, কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। সেইরূপ কারু কারু রাগভক্তি আপনাপনি হয় ছেলে বেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে।

১৬৪। যতক্ষণ না ঈশ্বরের উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচাভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।

১৬৫। যার কাঁচাভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা করতে পারে না। পাকাভক্তি হলে ধারণা করতে পারে। কাঁচে যদি মশলা মাখান থাকে, তা হলে যা ছবি পড়ে, রয়ে যায়, কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, তা থাকে না।

১৬৬। সংসারের জ্বালায় জ্বলে যে গেরুয়াবসন পরে, সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। আবার কাজকর্ম্ম নাই সুতরাং বৈরাগ্য হোলো, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। ৩।৪ মাস বাদে বাড়ীতে পত্র দিলে, 'আমার কর্ম্ম হইয়াছে, তোমরা ভাবিত হইও না, সত্বরই বাড়ী যাইব।' আর এক রকম বৈরাগ্য দেখা যায় যে, সব আছে, কোনও অভাব নাই, কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। এই বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

১৬৭। মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেকও ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, তা হলে ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি আছে, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া—বড় ভয়ঙ্কর!

১৬৮। সাধারণ লোক সাধনা করে, ঈশ্বরে ভক্তি করে, আবার সংসারেও আসক্ত হয়—কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে।

১৬৯। নিত্য-সিদ্ধ যেমন মৌমাছি;—কেবল ফুলের উপর ব'সে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয় রসের দিকেও যায় না।

১৭০। দয়া আর মায়া অনেক প্রভেদ।' দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া—আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী ভাইপো ভাগ্‌নে বাপ্ মা এদের উপর ভালবাসা; দয়া সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা।

১৭১। ব্রহ্ম সত্ত্বরজোতমঃ তিনগুণের পার; প্রকৃতিরও পার।

১৭২। অদ্বৈত জ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়। তখন দেখে, সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি আছেন। চৈতন্যলাভের পর আনন্দ। তাই—'অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ'।

১৭৩। আত্মজ্ঞানীরা বলে 'সোহম্' অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা'। এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এমত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে, অথচ 'আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা' এ কিরূপে হতে পারে!

১৭৪। আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, এ সব আত্মার কোনও অপকার করতে পারে না, তবে দেহাভিমানীদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছুই করতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

পাগলের খেয়াল।

আনন্দময়ী আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী মা কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নামধারিণী, জীবগণ মোহ বিনাশিনী হে ভগবতি! আনন্দ-স্বরূপ নিত্য সত্য অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ শিব, রাম, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি আখ্যাধারী হে ভগবান! এই পাগলের পাগলামী করিবার শক্তি দাও। বৈশ্লেষিক ও সাংশ্লেষিক সূত্রে অনুশীলনপূর্ব্বক গমনাগমন করিয়া তোমাদিগেরই কৃপাবলে তোমাদিগকে স্থূলে সূক্ষ্ম কারণে মহাকারণে দর্শন করিয়া এই পাগল যেন বিভোর হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর—এই বর দাও।

হে ভগবতি, হে ভগবান্, এই পাগল বাল্যকালাবধি তোমাদের বিবিধ আখ্যা শ্রবণ করিয়া আসিতেছে। সময়ে সময়ে এই সব আখ্যা লইয়া ডাকিয়াও শান্তি অর্থাৎ মনের উদ্বিগ্নতা নিবারণ অনুভব করিয়াছে; কিন্তু সে ক্ষণিক, একবার যায়—একবার হয়—আবার যায়—আবার আসে—এই রূপে সংসার-সমুদ্রের অনন্তকালের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে ভাসিয়া ভাসিয়া পাগলের জীবনের প্রায় বার আনা অতিবাহিত হইয়াছে। বার আনা

অর্থে সচরাচর জীবন সংখ্যায় তুলনায় গৃহীত হইল। কাহার যে কখন বরি আনা, বা আট আনা, বা চারি আনা হয়, তাহা মহাকালের অন্তরালে অবস্থিত, কাহারও দেখিবার বা জানিবার উপায় নাই।

এই পাগলের জীবন-তরঙ্গে সময়ে সময়ে ভীষণ ঝড় লাগিয়াছে। হে ভগবান, হে ভগবতি, তোমাদের নাম সকল ধরিয়া পাগল তখন ডাকিয়াছে ও অনায়াসে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক দিন হঠাৎ মনে উদয় হইল যে, এই সব বিভীষিকারূপ তাড়নার হস্ত হইতে একেবারে নিস্তার পাইবার কি কোন উপায় নাই? এই দেহ ধারণ কি এই কষ্ট ভোগ করিবার নিমিত্তই? কত রকম কষ্ট। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক। এই পাগলের হঠাৎ যেন একদিন চমক ভাঙ্গিল। জগতের সমুদায় জীবকেই এই কষ্টে অভিভূত দেখিতে পাইলাম। এই সমস্তের কারণ এই পাগল কত লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কেহই মনোমত উত্তর প্রদানে শান্তি দিতে পারিল না। তবে এই পাগলের কেবলমাত্র একটা বোধ হইল যে, একদিন না একদিন কোন সদুত্তর মিলিবে।

একি! হে ভগবান্! হে ভগবতি! তোমরা আবার একাধারে পুরুষমূর্ত্তিতে কামারপুকুর গ্রামে শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণ আখ্যা ধরিলে! কারণ, এ নামেও বাল্য-সংস্কারের নাম সকলের ন্যায় এই পাগলের মনটাও হঠাৎ যেন গলিয়া গেল, হৃদয় কত শীতল হইল।

একি? পাগলের পাগলামীর মাত্রা বাড়িল নাকি? এ আবার একটা খেয়াল দেখিতেছি নাকি? পাগলের মন কি প্রতারিত হইতেছে? আমাদের শাস্ত্রে 'ছলনা' নামে একটা কথা আছে, এবং এই ভগবান ও ভগবতী বহু বহু স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহার ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এও একটা তাই নাকি? হইলেও হইতে পারে, দেখা যাক।

আবার জানা গেল, নূতন ভাব, নূতন প্রেমের তরঙ্গ। অতি গোপন ভাব, অতি সঙ্কোচ ভাব, অতি দীন ভাব, শেষে কিনা আমার মত পাগলের জন্য, কলির জীবের উদ্ধারের জন্য, শিক্ষা দিলেন বকলমা ভাব! একি! এই বেটাছেলের মধ্যে মা, বাবা—ভগবান ভগবতী, দুই ভাবই কি আছে! কে যেন মন তোমায় বলিল, 'বাঁধি রাস্তায় অনুধাবন কর, আছে।'

রে পাগলের মন! পাঁচভূতের কথায় ভুলিসনে। তারা সব তাদের ছাঁচে

ফেলে আরও ঘোরাবে বলে ফাঁদ পেতে বসে আছে। রে মূর্খ পাগলের মন, একটু সহ্য করে, একবার ভাল করে পাক না করে, ধাঁধি রাস্তা বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সূত্রে বিচার কর, এখনও এই রামকৃষ্ণের ভিতর তোর সেই চিরসঞ্চিত বাল্যসংস্কারবদ্ধ ভগবান ও ভগবতীকে দেখিতে পাইবি। মন একটু স্থির হও, এখনই প্রভু রামকৃষ্ণের কৃপায় দেখিবি, যে রামকৃষ্ণ, সেই কালী, সেই শিব সেই দুর্গা, সেই রাধা, সেই শ্রীকৃষ্ণ, সেই যীশু, সেই মহম্মদ, সেই শক্তি ও সেই গুরু।

হে অস্থির মন, তুমি রামকৃষ্ণদেবকে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছ, এ চেষ্টা কেন? কেন মন তুমি এত লালায়িত হইয়াছ? কি কারণে এত উৎকণ্ঠিত? অবশ্যই কোন বিশেষ কার্য্য ঘটিয়াছে, যে নিমিত্ত মন তুমি কারণ অনুসন্ধান করিতেছ। কোন কার্য্য হইলেই তথায় তাহার কারণ আছেই, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইহা চৈতন্য জগতের একটী প্রধান ও প্রথম সূত্র বলিয়া অনুমান হয়। ভাবিয়া দেখ, অনন্ত ভাবাবিশিষ্ট এই জগতের উৎপত্তি হইতে ধ্বংস পর্য্যন্ত এই প্রধান সূত্রে গ্রথিত, ইহা তুমি শত চেষ্টা করিয়াও উড়াইয়া দিতে পারিবে না।

সেই নিমিত্তই মন, তোমার ব্যথা পাইবার কারণ অনুসন্ধানে তুমি এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ। তুমি বোধ হয় ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছ। অথবা তোমার চির একঘেয়ে ভাব আর ভাল লাগিতেছে না, সুতরাং তুমি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছ। তুমি যে সকল লইয়া আনন্দ করিবে ভাবিয়াছিলে, তাহা নিরানন্দে পরিণত হইয়াছে। তুমি নির্ব্বোধের মতন চাকচিক্যে ভুলিয়াছিলে, সে চাকচিক্য কে যেন অপসারিত করিয়াছে। সেটা অস্থায়ী বলিয়া কে যেন দেখাইয়া দিল। যাহাদের সংসর্গে, পার্থিব নশ্বর বস্তুগুলি, পরম আনন্দের ও অবিনশ্বর ভাবিয়া, পাইবার জন্য এত লালায়িত হইয়া কত চেষ্টা করিলে, কত উদ্যমে বার বার পাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে, কিন্তু কে যেন তোমাকে সে পথে বাধা দিয়া তোমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল, তোমাকে হতাশ করিল। তোমার চির সঞ্চিত আশার মস্তকে কুঠারাঘাত হইল। মন, ভাবিয়া দেখ, এই কারণেই তোমার এত যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ ঘটিল। যাহাদিগকে তোমার পরম আত্মীয় ও আপন ভাবিয়াছিলে, কে যেন দেখাইয়া দিল যে, তাহারা তোমার কেহই নয়। যাহাদের জন্য এতরূপ কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ

করিবার চেষ্টা করিলে, তাহারা তোমায় ফাঁকি দিল। তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ কে যেন মায়াবাজীতে তোমার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইল। তখন তুমি অকূল পাথারে পড়িয়া তোমার ললাটে করাঘাত করিতে লাগিলে, এবং যাহাকে এতদিন একবারও মনে কর নাই, সেই ঈশ্বর সহসা তোমার অন্তরে জাগরূক হইলেন, অর্থাৎ কে যেন বলিলেন, 'আমি ভগবান তোর আছি, ভয় কি?' মন, তুমি তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিলে—

তুমি বলিতে লাগিলে :—হে ঈশ্বর। কে তোমায় দয়াময় বলে? এই কি তোমার দয়া? আহা! অমুকের এমন শ্রীবৃদ্ধি হইল, আর আমার ভাগ্যে কিনা এরূপ ক্লেশ যে, ইচ্ছা করিলে এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া পুত্র কন্যার মুখে দিতে পারিতেছি না। পাগলের মন। স্থির হও,—একটু সুস্থ ও সরল হইয়া ভাব দেখি, তোমার এত কষ্ট কেন? এখনি দেখিতে পাইবে, তুমি যাহাতে সংযুক্ত হইয়া অজ্ঞানে বিভোর ছিলে, কে যেন তাহা হইতে তোমাকে বিযুক্ত বা তফাৎ করিয়া দিয়াছে সুতরাং এখন তুমি সেই বস্তুর অভাব বোধ করিতেছ। মন, বেশ তলাইয়া বোঝ, এই অভাবটাই তোমার যত কষ্টের মূল।

রে পাগলের মন,—মনে কর, তোমার কোন একটী যুবতীর প্রতি অনুরাগ হইল। কেহ যেন তাহা তোমাকে পাইতে দিল না। কিন্তু মন, তুমি তাহার মিলনাভাব বশতঃ মহাদুঃখে পতিত হইলে। তাহাকে পাইবার জন্য কত যুক্তি কত মতলব খাটাইতে লাগিলে, সবই বিফল হইল। তুমি বোধ করিলে, তোমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মন দেখ, এখানেও সেই অভাবই দুঃখের মূল। অথবা ধরা যাক যে মন, তুমি সেই চারুহাসিনী বরবর্ণিনী তোমার মনমোহিনীকে লাভ করিলে। তাহার সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া দিবারাত্র তাহাকে লইয়া সম্ভোগ করিতে লাগিলে। তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই রমণীর সেবায় নিযুক্ত হইলে এবং তোমার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিলে।

মন, যে চাকচিক্যের ও মোহের আকর্ষণে প্রথমে ঐ যুবতীকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলে, আজ দশ বৎসর পরে হঠাৎ একদিন দেখিলে সে চাক-চিক্য নাই? তাহার মাংসপেশী সব শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া দশ বৎসর পূর্ব্বে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলে, আজ যেন কাহার চির প্রথা বা নিয়মানুসারে সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বিরূপ ও বিকৃত হইয়াছে।

তাহাকে দেখিলে এখন আর সে ভাব আইসে না। সেই যুবতী এখন প্রৌঢ়া, পুত্র কন্যার মাতা হইয়া তাহাদের সেবায় কালাতিপাত করিতেছে। তোমার দিকে একবারও চাহিয়া দেখে না। এখন সংসারের তাড়নায় তোমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। কেবল অহর্নিশি তোমাকে অভাব জানাইতেছে। তুমি তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত রাস্তার মুটের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। এখন আর তোমার সে পূর্ব্ব আনন্দ নাই। অর্থাভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বভাবের নিয়মে তোমারও যুবা-শরীর কে যেন ভাঙ্গিয়া দিল। ব্যাধি আসিয়া চাপিয়া ধরিল। সেই 'অভাব' পীড়ন করিল। হতাশ হইয়া পড়িলে। মন, তোমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন বলিল যে, ইহা প্রকৃত সুখ নয়, কারণ প্রকৃত সুখের বিরাম নাই। সে আনন্দের বাজার ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার ক্ষয় নাই। মন দেখ, এখানেও সেই অভাবই মূল।

আরো দেখ, তুমি অর্থের নিমিত্ত কত জুয়াচুরি বাটপাড়ি করিলে, দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া, এমন কি জীবনপাত করিয়াও অর্থ সঞ্চয় করিলে। কিন্তু কে যেন কোন মায়ায় দুই দিনের মধ্যে তোমায় তাহা হইতে বঞ্চিত করিল। হয় চোরে লইল, না হয় ব্যবসায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হাহাকার আরম্ভ করিলে। লোকে তোমায় কত মূর্খ বোকা ইত্যাদি বাক্যে তোমার অন্তরে আঘাত দিতে আরম্ভ করিল। কিম্বা যদি, তোমার ভাগ্যে অর্থ ব্যাঙ্কে বা লোহার সিন্দুকে স্থিতি করিলেন, তাহাতেও মন তোমার শান্তি নাই। তাহা রক্ষার ভাবনায় তোমার চাঞ্চল্য দিবারাত্র আরম্ভ হইল। কিসে বৃদ্ধি হইবে তজ্জন্য দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলে। ধন বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্য, তোমার অর্থের দ্বারায় অন্য পাঁচজনার ধন ছলনায় অর্থাৎ চতুরতার সহিত অপহরণ করিয়া বৃদ্ধি করা মাত্র। রাত্রে যে সুখে নিদ্রা যাইতে তাহাতেও ব্যাঘাৎ ঘটিতে লাগিল। তোমার আনন্দ বা শান্তি কোথায়? ভাবিয়া দেখ, এত অর্থেও তোমার নিরানন্দ হইল। কে যেন হঠাৎ বলিল, ইহাতে তোমার আরাম কোথায়? তখনও যদি তোমার চৈতন্য না হয়, তখন তোমাকে অন্য উপায়ে আঘাত করিল, অর্থাৎ তোমার কোন পরম আত্মীয়কে সহসা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। তুমি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলে। যে অর্থের আনন্দে বিভোর ছিলে ও তোমার সুখ চরিতার্থ করিতেছিলে, তাহা আর তখন তোমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। আর সে সুখ নাই, দিবারাত্র হাহাকার মাত্র। মন তখন তুমি দেখিলে, ধনজনে সুখ নাই, আবার অভাবে পড়িলে।

যেদিকে দেখা যায়, সেই দিকেই মন দেখিলে—অভাব অভাব অভাব। সুতরাং সংসারের ভিতর হে পাগলের মন, যাহাতে তুমি লিপ্ত হও তাহাতেই ঠকিয়া যাইতেছ ও অবশেষে সেই অভাবজনিত কষ্ট বোধ করিতেছ। তাই এই অভাব বোধ আর যাহাতে না হয়, তাই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছ।

মন, তোমার একটা সন্দেহ উপস্থিত। তুমি বলিতেছ, যখন তোমার জ্ঞান হয় নাই—শিশু ছিলে, তখন কোন অভাব ছিল না, এবং কোন কষ্টই পাও নাই, ক্রমশঃ পাঁচজন পারিষদ মিলে এত গণ্ডগোল,—ইহাদের সংসর্গ না করিলেই হইল। মন, তোমার এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। এস একটী নব-প্রসূত সন্তান লইয়া বিচার করিয়া দেখি।

আমরা দেখিতে পাই, শিশুসন্তান কখন চুপ করিয়া খেয়ালা করে, কখন কাঁদে। মন, যদিও তুমি এক সময় ওরূপ ছিলে কিন্তু তোমার কি সে অবস্থার কিছু স্মরণ আছে? কখনই না। শিশু কাঁদে কেন? অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, কোন অভাব হইয়াছে বলিয়াই কাঁদে। এই অভাব পূরণ যখন হয়, যে উপায়ে হোক, তখন আনন্দ হয় ও হাসিয়া থাকে। দেখ মন, শিশু কাঁদে অভাবের জন্য, যুবা কাঁদে অভাবের জন্য, প্রৌঢ় বৃদ্ধ প্রভৃতি সবাই কাঁদে সেই এক অভাবের জন্য। শিশু যখন কাঁদিল, জননী স্তন দিয়া তাহাকে চুপ করাইলেন। এ ক্ষেত্রে শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহার সেই অভাব বলিতে হইবে। কিন্তু সময় বিশেষে স্তন দিয়াও যখন শিশুর কান্না থামিল না, তাহার মাতা নানাবিধ কারণ অনুসন্ধান করিয়াও যখন কিছু ধরিতে পারিলেন না, তখন ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া ডাক্তার ডাকাইয়া ঔষধাদির দ্বারা সে কষ্ট নিবারণ করিলেন। তাহার অভাব দূর হইলে সে আবার হাসিল। একই অভাব সর্ব্বত্রেই বিশেষ বিশেষ রূপে দেখা যায়, এবং তাহা সম্পূরণ করিবার নিমিত্তও জগতে যাবতীয় আয়োজন হইয়া রহিয়াছে। আমরা লেখা পড়া করি অর্থোপার্জ্জনের জন্য, শাস্ত্রাদি পাঠ করি জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, ভাল জল বায়ু দেখিয়া আবাস স্থান নির্দ্দেশ করি স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য। আমাদের অভাব হইলেই অশান্তি হয় এবং তাহা নিবারণের নিমিত্ত আমরা তাহার উপায় স্থির করিয়া থাকি।

দেখ পাগলের মন, আমাদের অভাব নিবারণের জন্য আমরা যে সকল উপায় অবলম্বন করি, তাহা পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং সাময়িক অভাব পূর্ণ হইবার পরক্ষণেই পুনরায় অভাবজনিত ক্লেশে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। আমরা এইরূপ

সর্ব্বদা অভাব অনুভব করিতেছি ও তাহা বিমোচনের ব্যবস্থাও হইতেছে, অর্থাৎ দুঃখে সুখে এক রকম করিয়া দিন কাটিয়া যাইতেছে। আরো মন দেখ, মোটামুটি ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কতিপয় স্থূল স্থূল অভাবই আমরা বুঝিয়া থাকি। আমরা স্থূল ভাব অতিক্রম করিয়া [illegible] আমাদিগকে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে যে, আমাদের জন্মিবার সূত্রপাত হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত [illegible] নাই। যখন জীবনের সঞ্চার হয় তখন [illegible] থাকি। তখন সমুদায়ই অভাব। ক্রমে অভাব সকল আপনিই পূর্ণ হইতে থাকে। তখনকার অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অথবা মাতাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। মাতৃশোণিত [illegible] দেহকে পরিপোষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে [illegible] হইবার পরও আমাদের অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। আমাদের শারীরিক অভাব অর্থাৎ দেহ বর্দ্ধিত করিবার উপায় পৃথিবীতে আছে এবং তাহার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। ভোজ্য সামগ্রী আমরা সৃজন করি নাই এবং বলবীর্য্য প্রাপ্ত হইবার প্রণালী আমাদের কল্পিত নহে। দেহ সম্বন্ধীয় অভাব যেরূপে বিদূরিত হয়, দৈহিক যন্ত্র বিশেষের অভাব বিদূরিত হওয়াও আমাদের ইচ্ছা বা কার্য্যাধীন নহে। প্রত্যেক যন্ত্রের অভাব কে যেন আপনাপনিই সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

মন দেখ, দৈহিক অভাব যেমন কে পূরণ করিতেছে, মানসিক অভাবও সেইরূপে সম্পূরণ হইয়া থাকে। মানসিক বা দৈহিক অভাব হইলে, দেহ ও মন উভয়েই ক্লেশ পায় এবং তাহা পূর্ণ হইলে উভয়েই শান্তি লাভ করে। বলকারক খাদ্য আহার করিলে শারীরিক বলাধান হয় তজ্জনিত মনও সুস্থ থাকে। মন, ইহাকে তোমার সম্পূর্ণ অভাব পূরণ বলা যায় না। মন, একটী বস্তুর অভাব তোমার সদাই অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার নাম জ্ঞান। কোন বিষয় তোমাতে উদিত হইলেই তখনই তাহার তত্ত্ব বাহির করিবার নিমিত্ত তুমি চিন্তিত ও ব্যস্ত হও। যেমন দেহান্ত পর্য্যন্ত দেহের অভাব পূরণ হয় না, সেইরূপ তোমার বিলয় কাল পর্য্যন্ত তোমার অজ্ঞানতাও বিদূরিত হয় না। অর্থাৎ যাহার সাহায্যে বা অস্তিত্বে তুমি যে দেহ আবাসে বাস কর, তাহার বিলয় বা পরিবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত তোমার অজ্ঞানতা বিদূরিত হয় না। এইজন্যই তোমার কষ্টের পার নাই।

বুঝিয়াছি মন, তাই অভাবের উচ্ছেদ করিয়া যাহাতে চিরশান্তিতে থাকিতে পার, তাই আনন্দময়ী মা, পতিতপাবন রামকৃষ্ণ, বলিয়া তোমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিতেছ। তাই বুঝি ভগবান ও ভগবতীকে, ব্রহ্ম ও শক্তিকে দেখিবার জানিবার ও লইয়া আনন্দসম্ভোগ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ। তাই বুঝি যাচাইয়া লইতেছ, আর না ঠক; আর না অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরীভূত হও। বেশ মন, তোমাকে ধন্যবাদ। খুব যাচাইয়া লও। এখন একবার স্থিরচিত্তে বোঝ দেখি। তখন যে ভগবানকে দোষারোপ করিয়াছিলে, এখন সে গুলি তাঁহার নিষ্ঠুর কার্য্য অথবা তাঁহার করুণা বা দয়া, এস, ইহাই আমরা দুজনে নির্জ্জনে একটু বিচার করি।

দেখ মন, খুব নিভৃতে পরামর্শের দরকার। কেননা তোমার যে কতকগুলি পারিষদবর্গ আছে, তাহাদের লইয়া বা তাহাদের কোনরূপ সংস্রবে থাকিয়া পরামর্শ করিলে চলিবে না। কেননা তাহাদের মতলব মতই ও আশার ছলনায় এতদিন এত কাণ্ড করিলে। ফল কি পাইলে? লাভ লোকসান খতাও, এই দণ্ডেই দেখিবে, কেবল লোকসান, অশান্তি ও অনুতাপ। অভাব অভাব অভাব। মন, তোমার পারিষদবর্গরা এক একজন এক এক ভীষণ শুম্ভ নিশুম্ভ সদৃশ। ইহাদের মধ্যে প্রধান যেগুলি, তাহাদের একবার ভাব দেখি।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য শুধু এরা নয়! আবার এই সব পারিষদবর্গের অন্যান্য সহস্র সহস্র অনুচরও আছে, যাহারা ঐ বড় বড় ছ'জনার চাটুকার বা মোসাহেব। তাহারা অত্যন্ত জটিল ও এত সতর্কে এক এক জনকে এত উপায়ে সহায়তা করে যে, অবোধ মন, তুমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পার না। তোমার পারিষদবর্গের চাটুতায় তোমাকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মন, একে একে ভাব দেখি।

কাম—ইহার হস্ত হইতে কি কখন রক্ষা পাইয়াছ? ইহার কি ভীষণ তাড়না তা কি তোমার স্মরণ নাই। এই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কি না প্রয়াস পাইয়াছ। কত লোকের মনস্তাপ দিয়াছ। অপরের কথা দূরে থাক, তোমার নিজের আবাস যে মনুষ্যদেহখানা তাহার কি না লাঞ্ছনা করিয়াছ? শেষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, সুতরাং তোমার আর সে স্ফূর্ত্তি নাই—তুমি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছ—যৌবনেই বার্দ্ধক্য আনিয়াছ ও ব্যাধির তাড়নায় জেলে [illegible] মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিয়া থাক। মন, [illegible] সব পূর্ণ

কথা স্মরণ কর। হাসিয়া গায়ের জোরে উড়াইয়া দিতে পারিবে না। বিচার করিয়া দেখ, সেই অভাবে আসিয়া পড়িলে।

তেমনি ক্রোধ, ইহার অধীনে যখন পড়িয়াছ, তোমার সুখের সংসারে ছাই পড়িয়াছে। হয় পরের গঞ্জনা বলিয়া যাহা বোধ হইয়াছে, তাহা নিবারণ করিতে গিয়া, ইহার প্রকোপে পড়িয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া ফেলিলে! যাহাতে হয় ত তোমার কারাবাস না হয় ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হয়। অথবা অন্যায়পূর্ব্বক পরকে ফাঁকি দিতে গিয়া কোন মোকদ্দমায় লিপ্ত হইলে, যাহাতে তোমার সর্ব্বস্বান্ত হইল। রাস্তার ভিখারী হইয়া কষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল। পুনরায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অনুসন্ধান করিলে,—অভাবকে দেখিতে পাইলে।

এখন মন, বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, সংসারে তোমার মতলব মতন যে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহা কে যেন সম্পূর্ণ হইতে দিল না। প্রতি পদক্ষেপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এখন এমন এক স্থানে পড়িয়াছ, যেখানে কোন যুক্তি বা তর্ক খাটিতেছে না। অসহায় হইয়া পড়িয়াছ। তোমার অনুচরেরা এখন তোমায় দুর্ব্বল দেখিয়া আপাততঃ ঘৃণা করিয়া গোপনে লুকাইত ভাবে আছে। আবার কেহ তোমাকে সবল করিলেই তাহারা পুনরায় জুটিয়া তোমাকে বিনাশের চেষ্টা করিবে। এইরূপে একে একে লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপ পারিষদবর্গের তাড়নায় অস্থির হইয়া যত্দূর ক্লেশ পাইবার সম্ভব তাহা পাইয়াছ। সাবধান, তাই বলিতেছি,—এস নির্জ্জনে দুটা মনের কথা কই।

এবার বেশ নির্জ্জন হইয়াছে। এস আমরা দুজনে দেখি, হঠাৎ কেন দয়াময়ী মা কালী, বা শিব, বা কৃষ্ণ, বা যীশু, বা আল্লা ইত্যাদি যে কোন উপাধি-বিশিষ্ট ভগবানের নাম কেনই বা মনে জাগরূক হইল? এবং কেনই বা হঠাৎ তাঁহাকে দোষারোপ করিয়া কতকগুলি আক্ষেপ করিলাম।

দেখ মন, তুমি ভ্রমবশতঃ যখন যে ছাঁচে পতিত হইলে, তখনই তাহাদের অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইলে। যখন তাহার সম্ভোগ অবসান হইল, আর তাহা লইয়া থাকিতে পারিবে না। নূতন নূতন ছাঁচে পড়িতে পড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অস্থির হইয়া পড়িলে। কিছুই তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারিল না। শেষে হয়ত দেখিলে যে, তোমার আবাস স্থান দেহটা পর্য্যন্ত একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তুমি ভাবিতে লাগিলে,—আহা যৌবনে যে ছাঁচে পড়িয়াছিলাম, সেইটাই যেন খুব সুখের ছিল। এখন চেষ্টা করিয়াও তাহা

ফিরাইয়া পাইবার উপায় নাই। তোমার দেহটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তোমার ভাঙ্গা ঘরে তোমার অনুচরেরা মাঝে মাঝে পদার্পণ করিয়া জুলুম করিতেছে। তাহাদের সহবাস এখন তোমার ভাল লাগিতেছে না। লোকে তোমায় 'পৈতা পুড়াইয়া ব্রহ্মচারী' বলিয়া উপহাস করিতেছে।

মন একবার ভাব দেখি, তুমি এতদিন এত কাণ্ড করিলে, এখন নিরুপায় হইয়া পড়িলে, কে তোমায় আবার নূতন এক ঈশ্বরের উপাধি বিশেষ স্মরণ করাইয়া, তোমার নিরস শুষ্ক হৃদয় পুনরায় সরস ও আশাপূর্ণ করিল? বেশ স্থিরচিত্তে চিন্তা করার আবশ্যক।

ভগবান শব্দটী যেই তোমার হৃদয়ে উদয় হইল, অমনি অত যে কষ্ট যেন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া গেল। যেই দেখিলে ইহা ত মন্দ নয়, পতিতপাবন বা দয়াময় ভগবান বলিয়া বা চিন্তা করিবামাত্র, মন, তুমি বলীয়ান হও, তোমার অন্তরে বড় আশার সঞ্চার হয়, তখন তুমি ভাবিতে লাগিলে, যাহার প্রকোপে পড়িয়া তুমি নিরাশ ও ভগ্নহৃদয় হইয়াছ, এই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহার সম্বন্ধে একটা কোন ব্যবস্থা হইলেও হইতে পারে। পুনরায় সেই পূর্ব্ব অপহৃত বস্তু প্রত্যাশী হইয়া ভগবান ভগবান করিতে লাগিলে। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যাহাতে উহা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। অর্থাৎ যাহার বিয়োগে ক্লেশ পাইয়া ভগবানকে ডাকিতেছ, তাহার সংযোগ অন্বেষণ করিতেছ। কারণ তুমি তখনও তাহা বই অন্য কিছু জান না। তাহাতেই তুমি ডুবিয়াছিলে, তোমার সংস্কার আবার তোমাকে তাহাতেই টানিতেছে।

দেখ পাগল মন, এই ভগবান ভগবান নাম করা, এখন ধরতে গেলে তোমার সেই পূর্ব্ব অপহৃত বস্তুর নামান্তর মাত্র। এখন ভগবান বলার উদ্দেশ্য সেই পূর্ব্ব বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যদি টাকার শোকে হতাশ হইয়া পড়িয়া থাক ত ভগবান এখন তোমার, সেই টাকা ছাড়া আর কিছু নয়, অর্থাৎ টাকারূপী ভগবানকে তুমি চাহিতেছ। যদি কোন আত্মীয়ের বিরহ যন্ত্রণায় ভগবান ভগবান করিয়া থাক, তোমার ভগবান-ভাব তবে সেই অপহৃত আত্মীয় ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তুমি যে যে ছাচে পড়িয়া জর্জ্জরীভূত হইয়াছ, তাহাদের সহবাস-সংস্রব ত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর। মন, তুমি কি ইহা বুঝিতে পারিতেছ না,—যে একবার তোমায় এক বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সে আবার সেই অযথার্থ বা অনিত্য বস্তু কিরূপে দিবে? তবে 'কল্পতরু' তাঁহার এক নাম। তোমার প্রার্থিত বস্তু দিতে পারেন, আবার

কিছুদিন বাদে ঠিক এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে। মন সাবধান হও। বেশ স্থির হইয়া বোঝ। ঈশ্বরের নামে এত বল পাইয়াছ, যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছ। কেবলমাত্র যাঁহার নামে এত ফল পাইলে, তাঁহাকে লইয়া কি উপভোগ করিতে ইচ্ছা যায় না? যাঁহার নামে এত আনন্দ হইল, যাঁহার নামে আশার সঞ্চার হইল, তাঁহাকে লাভ করিলে না জানি কি হয়। অর্থাৎ আজীবন যে অভাবের তাড়নায় এত দুঃখ কষ্ট পাইলে, সে অভাব আর কি থাকে?

দেখ মন, তুমি কি অন্ধকারেই পড়িয়াছিলে। কে তোমায় সর্ব্বসময়ে সর্ব্বাবস্থা হইতে টানিয়া উদ্ধার করিল ও প্রতিবারেই অভয় দান করিল? কে তোমায় পদে পদে দেখাইল যে, যাহাতে যাহাতে সত্য জ্ঞান করিয়া উন্মাদ হইয়া বিভোর হইয়াছিলে, তাহা সত্য নহে, অর্থাৎ যে যে অবস্থায় যে ভাবে বা যে রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলে, সেই সেই ভাব বা রূপ সত্য নহে। উহা অন্যান্য রূপ সমূহের অস্থায়ী একটা যৌগিক ভাব বা রূপবিশেষ। তাহা চিরপ্রথানুসারে অনন্তকাল ধরিয়া জন্মায়, মোহ উৎপাদন করে ও তাহার কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় লয় হয় বা অন্যরূপে পরিবর্ত্তন হয়। ইহা সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির এক লীলা বিশেষ। দেখ দেখি মন, কে তোমাকে অহেতুক ভালবাসায় সর্ব্ব অনিত্য হইতে টানিয়া টানিয়া তুলিতেছে? কে এখন প্রতি পদে পদে দেখাইতেছে যে, এটা তাহা নহে, যাহাতে তোমার অভাব মোচন হইবে? ইহা কি সেই করুণাময়ের দয়া নহে? মন, পূর্ব্বে যে সকলের বিয়োগে এত অসহ্য হইয়া ভগবানকে দোষারোপ করিয়াছিলে, এখন কি সেগুলি তাঁহার দয়ার কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না? সেই পূর্ব্বের অনুতাপ কি এখন আনন্দে পরিণত হইতেছে না? এখন বুঝ মন যে, ভগবানকে লাভ করা ভিন্ন অভাব মোচন বা চিরানন্দ লাভের অন্য কোন উপায় নাই, এবং অনুসন্ধানে ও বিচারে তাহাই তুমি জ্ঞাত হইলে।

ধন্য মন, ধন্য তুমি, এখন তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া পণ পর্য্যন্ত রাখিতে প্রস্তুত আছি। তুমি চেষ্টা করিয়াও অনিত্যে ধাবমান হইয়া আর নিশ্চিন্ত থাকো দেখি, কেমন সেখানে তিষ্ঠিতে পার? দয়াময় তোমার টিকি ধরিয়া টানিয়া তুলিবেনই তুলিবেন। এই জন্যই ভগবান দয়াময় ও পতিতপাবন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং আনন্দস্বরূপ তাঁহার আখ্যা হইয়াছে। তাঁহাতে পূর্ণানন্দ, তাহার বিরাম নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যে ভগবানের নামে তোমার এত কাণ্ড হইল, দুর্ব্বল হইয়াছিলে, বল পাইলে, অশান্তি

ভোগ করিতেছিলে, কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলে, এস মন; এখন তুজনায় বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্ সেই ভগবান জিনিসটা কি? এবং কি করেই বা তাঁহাকে লাভ করিয়া চিরশান্তিতে থাকিতে পারা যায়? (ক্রমশঃ)

জনৈক পাগল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাগীতি।

(কীর্ত্তনের সুর)

ভজ রামকৃষ্ণ প্রভু জীবন ধন।
জীবনধন ভজ শ্রীরাঙ্গাচরণ
জীবের সৌভাগ্য হরি ধরায় উদয়।
(আর ভয় নাই রে) (ভব পারাবার পারে)
প্রেমানন্দে নৃত্য করে ভকত নিচয়॥
(কি আনন্দ হোলো রে) (হৃদয় রতন পেয়ে)
প্রভু সঙ্গ সাধ সর্ব্ব হৃদয়ে উদ্ভব।
(তারা চরণ সেবা চায় গো) (নিত্যধামের সেবক সবাই)
ঘরে ঘরে লয়ে করে আনন্দ উৎসব।
(সুখের বন্যা এলো গো) (রামকৃষ্ণ কৃপা গুণে)
উৎসব শেষেতে হয় ভোজনায়োজন।
(প্রভুর সেবা হবে গো) (ভকত কুটীর মাঝে)
কমল আসন দেয় প্রভুর কারণ॥
(প্রভু বসিবেন ব'লে)
নয়নের প্রেমনীরে শ্রীপদ ধোয়ায়।
কমনীয় কেশদামে যতনে মুছায়॥
(পাছে চরণে বাজে গো)
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন তবে।
আনন্দে মগন চিত ভক্তগণ সবে॥
(আনন্দের আর সীমা নাই রে) (ভকত হৃদয় মাঝে)
কেমনে বাখানি সেই মধুর রন্ধন।
জুড়াইতে রহু দূরে গন্ধে মাতে মন॥

মার্জ্জিত থালেতে শোভে অন্ন পরিপাটি।
তাহারে বেষ্টিয়া রহে ব্যঞ্জনের বাটি ॥
সুগব্য ঘৃতের কিবা সুগন্ধ বিস্তার।
শাক ভাজি দিয়ে প্রভু করেন আহার।
(পদ্ম হস্তে মাখি মাখি)
পলতা সুকুতা প্রভু প্রদানি বদনে,
'বড়ই সুন্দর' বলি শ্রীমুখে বাখানে ॥
দাল মেখে খান সাথে সঙ্গে বড়ি ভাজা।
রহস্যে বলেন হেসে 'এতে বড় মজা' ॥
কত পরিহাস জানে গো) (রসের সাগর প্রভু)
ডালনা আস্বাদি ক'ন 'অতি চমৎকার'।
শুনিয়া ভকত প্রাণে আনন্দ অপার ॥
খাইতে খাইতে প্রভু ছানার কালিয়া।
'অতীব মধুর এটি' বলেন হাসিয়া ॥
অম্বল চাখিয়া প্রভু শিহরি উঠিলা।
মরি কিবা রামকৃষ্ণ ভোজনের লীলা ॥
দধি ক্ষীর পরমান্ন খা'ন হাসি হাসি।
ভক্তহৃদে কি আনন্দ, কেমনে প্রকাশি ॥
(এমন ভাষা নাই গো) (আনন্দে প্রকাশ করি)
সন্দেশ জিলিপি গজা রসগোল্লা আর।
(কত মিষ্ট শোভে গো) (প্রভুর সেবার তরে)
'লাট গাড়ী'* নাম দিয়ে করেন আহার ॥
(ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে) (ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু)
ভোজন শেষেতে প্রভু সহাস্য বদন।
বাম হস্তে করিলেন উদর শোধন ॥
(প্রভু হাত বুলায় গো) (ভকতে উল্লাস দিতে)

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'পথে জনতা সত্ত্বেও তথায় লাট সাহেবের গাড়ী উপস্থিত হইলে, যেমন পথ পরিষ্কার হইয়া সেই গাড়ী চলিয়া যাইবার রাস্তা হয়, পরিপূর্ণ উদরে মিষ্টান্নের স্থিতিও তদ্রূপ।'

কর্পূর বাসিত জলে করি প্রভু পান।
হাসি হাসি মুখে যত ভক্ত পানে চান॥
'অতি বেশ' 'খুব হোলো' মুখে বার বার।
শুনিয়া সকল প্রাণে হরিষ অপার॥
অবশেষে করিলেন প্রভু আচমন।
'তোমা সবে খাও নাগো' বলেন বচন॥
তাম্বুল যোগায় কেহ মশলার সনে।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লয়ে দেন শ্রীবদনে॥
গৃহেতে পাইয়ে আজ রামকৃষ্ণ নিধি।
সেবক-হৃদয়ে নাই আনন্দ অবধি॥
সমাদরে কত মত সেবা যত্ন করে।
(যতনের ধন পেয়ে)
পুলকে শ্রীপদ দুটি হৃদি মাঝে ধরে॥
প্রসাদ পাইয়ে সব ভক্তগণ নাচে।
(ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ কোরে) (সেবানন্দে মত্ত হয়ে)
কাতরে এ দীন তার বিন্দুকণা যাচে॥

এককড়ি সংগীত।

(দশম বর্ষের ১৮৭ পৃষ্ঠার পর।)

হস্ না হরির চরণ ছাড়া।
বাঁধ্‌না রে মন, যুগল-চরণ, দিয়ে তোর ঐ ভক্তি-দড়া॥
কাঁদ্ দেখি মন হরি বলে, বরষি প্রেম-অশ্রুধারা।
নইলে পরে, বৃথা যে রে, সার হবে তোর ঘোরাফেরা॥
যদিরে ঐশ্বর্য্যে ভুলে, হরিকে তুই হস্‌রে হারা।
শেষের দিনে, তরী বিনে, কেঁদে যে তুই হবি সারা॥
মিছে কেন থাকিস্ বসে, হয়েছিস্ যে কুটের বাড়া।
ভাব্ দেখিরে, করবি কি রে, খাবি যখন যমের তাড়া॥
জানিস্ না কি এ সংসারে, একেই যে তোর কপাল পোড়া।
আমার [illegible] কেন ভুলে, আছিস্ ভবে আগাগোড়া॥
এককড়ি বলে শমন এলে, যেতে হবে খাড়া খাড়া।
বল্ দেখিরে, কেমন ক'রে, কাটাবি তুই শেষের ফাঁড়া॥ ৫॥

কাজ কি আমার হরি বলে।
যদি অদৃষ্টের ফল সদাই ফলে॥
কপট নিষ্ঠুর যে জন, ভক্তে কাঁদায় সুযোগ পেলে।
কেন মিছে তাঁহার কারণ, ভাসি সদাই নয়ন-জলে॥
বুঝেছি তাঁর যত দয়া, দয়া-হীন সে সর্ব্ব-কালে।
দয়াময় বলে যে জন, বদ্ধ সে জন ভ্রম-জালে॥
দয়া যদি থাক্‌তো তাঁহার, ভক্তে কেন দুঃখ দিলে।
নাম জপিযে এই ফল শেষ, ডুব্‌তে হল অতল-জলে॥
ভক্ত-বৎসল কে বলেরে, ভক্ত-হন্তা বলা চলে।
তাঁর দয়া মায়া সকল মিছে, ঘটেরে সব কর্ম্ম-ফলে॥
যা করলে তা কর্‌লে হরি, থাক্‌বে যদি থাকো ভুলে।
চির দুখে রাখলে যদি, সুখ দিবে কি জীবন গেলে॥
এককড়ির এই মিনতি, শমন নিকটে এলে।
দয়া যদি থাকে তোমার, রেখো তবে চরণ-তলে॥ ৫॥

আয় দেখি মন ভবের হাটে।
কিন্‌তে হবে ধর্ম্ম রতন, হাটের খরচ বাঁধনা গেঁটে॥
বিপদ-পঙ্কে পূর্ণ যে রে, কেমন করে ঘুরবি হাটে।
সাম্‌লে তোকে ঘুরতে হবে, ধীরে ধীরে চল্‌না উঠে॥
হরিনামের যষ্ঠি খানি, ধর দেখি মন জোরে এঁটে।
পতনের ভয় আর রবে না, শ্রম হবে না রাস্তা হেঁটে॥
এমন আমার কপাল পোড়া, বাঞ্ছিত-ফল নাহি জোটে।
ভাল করে দ্যাখ্‌না খুঁজে, পাস্ যদি তুই কাছে-পিঠে॥
কখন আর কিন্‌বিরে তুই, হাটের বেলা যাচ্ছে কেটে।
নিজের অভাব বুঝ্‌লি না মন, ঘুরে বেড়াস্ বেগার খেটে॥
আসল কাজে অষ্টরম্ভা, মুখেতে খুব খই যে ফোটে।
ধর্ম্ম-কর্ম্মের বেলাতে মন, কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে॥
সে নাম নিলে যে দিনেতে, জীবন-সূর্য্য বস্‌বে পাটে।
এককড়ি বলে মনের সুখে, বসে থাকিস্ পারের ঘাটে॥ ৬॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

আষাঢ, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৪ পৃষ্ঠার পর)

১৭৫। সুখ দুঃখ দেহধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র, কিন্তু সে জেলে গিছিল, তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। দেহধারণ করলেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে।

১৭৬। শ্রীমন্ত কত বড় ভক্ত, আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছিলো।

১৭৭। একজন কাঠুরে—পরমভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন, কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটেই খেতে লাগলো।

১৭৮। দেবকীর কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দর্শন হোলো, কিন্তু কারাগার ঘুচলো না।

১৭৯। এ সব কি জানো, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। যে কয়দিন ভোগ আছে, দেহধারণ করতে হয়। একজন কাণা গঙ্গাস্নান করলে, সব পাপ ঘুচে গেল, কিন্তু কাণা চোখ আর ঘুচলো না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ।

১৮০। দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে; ঐ ঐশ্বর্য্য কখনও যাবার নয়। দেখনা—পাণ্ডবদের অত বিপদ।

কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায়নি। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত কোথায়?

১৮১। বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরে রতিমতি তত বাড়বে।

১৮২। কলিকাতার বাড়ীর দিকে যত আসবে, কাশী থেকে তত তফাৎ হবে, আবার কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে।

১৮৩। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই তাঁতে ভাব ভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়।

১৮৪। জ্ঞানীর ভিতর এক টানা গঙ্গা বইতে থাকে। তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। সে সর্ব্বদা স্ব-স্বরূপে থাকে। ভক্তের ভিতর এক টানা নয়, জোয়ার ভাঁটা হয়—হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর টুপুর' 'টাপুর টুপুর' করে।

১৮৫। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি; মণির জ্যোতিঃ বল্লেই মণি বুঝায়, আবার মণি বল্লেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাবলে জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না, আবার জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না।

১৮৬। এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধি ভেদে নানা রূপ। যেখানে কার্য্য সেইখানেই শক্তি। জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল।

সচ্চিদানন্দই আবার আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন।

১৮৭। শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে—শুদ্ধভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়।

১৮৮। সত্যকথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়।

১৮৯। যখন নির্জ্জন সাধন কর্‌বে, তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নি, আত্মীয়, কুটুম্ব, কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে সাধনের সময় ভাব্‌বে, আমার কেউ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব; আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে।

১৯০। চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই।

১৯১। একবার পরেশমণিকে ছুঁয়ে সোণা হও, সোণা হবার পর

হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোঁতা থাক, মাটি থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাকবে।

১৯২। অবধূতের চব্বিশটী গুরুর মধ্যে চিল একটী গুরু। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধরছিলো। একটী চিল একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। চিলের মুখে মাছ দেখে হাজার কাক তার পিছনে কা কা করে তাড়া করলে। চিল যে দিকে যায়, কাকগুলোও সেই দিকে যায়। শেষে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা চিলের মুখ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলো চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে ছুটলো। চিল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা গাছের ডালের উপর বসে ভাবতে লাগলো যে, 'ঐ মাছটা যত গোল বাঁধিয়েছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।' অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা করলেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ (অর্থাৎ বাসনা) থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হলেই কর্ম্মক্ষয় হয় আর শান্তি হয়।

১৯৩। অবধূতের আর একটী গুরু ছিল মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখ্‌লেন যে, সঞ্চয় করতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে, তাদের সঞ্চয় করতে নাই।

১৯৪। এ নিয়ম সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন করতে হয়, তাই সঞ্চয়ের দরকার। পন্‌ছী (পাখী) আউর দরবেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখীর ছানা হলে সঞ্চয় করে—ছানার জন্য মুখে করে খাবার আনে।

১৯৫। ভগবানের শরণাগত হয়ে লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। আমি যদি হরিনামে নাচি, লোকে আমায় কি বলবে, এ সব ভাব ত্যাগ কর।

১৯৬। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়। লজ্জা, ঘৃণা ভয় জাতি-অভিমান, জীবের এ সব পাশ। এ সব গেলে তবে সংসার হতে মুক্তি হয়।

১৯৭। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।

১৯৮। ভগবানের প্রেম দুর্ল্লভ জিনিস। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেই নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয়, তবেই ভক্তি হয়।

১৯৯। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মণ একবারে ঈশ্বরেতে লীন হয়।

২০০। ভক্তির পর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক হয়, বায়ু স্থির হয়ে যায়। আপনিই কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকের গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাকশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়।

২০১। অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিলেন, তখন কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল, আর কোনও দিকেও দৃষ্টি ছিল না। এমন কি চোখ ছাড়া আর কোনও অঙ্গ দেখতেই পান নাই। এইরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

২০২। প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হলে, বাহিরের জিনিস ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। আর নিজের দেহ—যা এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়।

২০৩। ঈশ্বর দর্শনের আর একটী লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ করে উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।

২০৪। যারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাদের কথা গোলমেলে। একজন পণ্ডিত বলেছিল "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম দিয়ে সরস কর।" বেদে যাঁকে "রস স্বরূপ" বলেছে, তাঁকে কিনা নীরস বলে! এতে বুঝতে হবে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, কখনও জানে নাই, তাই এরূপ গোলমেলে কথা। একজন বলেছিল—"আমার মামার বাটীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।" এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।

২০৫। অনেকে ঐশ্বর্য্যের—বিভব, মান, পদ, এই সবের অহঙ্কার করে, কিন্তু এ সব দুদিনের জন্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না।

২০৬। টাকার অহঙ্কার করতে নাই। যদি বলো যে, আমি ধনী, তো ধনীর আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া, আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উড়ে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু নক্ষত্র যেই উঠলো, তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো, আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে চন্দ্র উঠলো; তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল, চন্দ্র মনে কল্লেন, আমার আলোতে জগৎ হাসচে, আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি—দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণ উদয় হোলো;—সূর্য্য উঠ্‌চেন। চাঁদ মলিন হয়ে গেল—খানিক পরে দেখাই গেল না! এই গুলি ধনীরা যদি ভাবে, তবে আর ধনের অহঙ্কার থাকে না।

২০৭। তাঁকে জেনে—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে, আর এক হাতে সংসারের কার্য্য কর।

২০৮। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ সংসার মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে মানুষ 'আমার' 'আমার' করে, আর মায়ায় বদ্ধ হয়ে, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে, মানুষ আরও ডোবে। মায়াতে মানুষ এমনই অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারেনা।

২০৯। তাঁকে যদি লাভ ক'র্ত্তে পারো, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না, যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে জীব জগৎ সব তিনিই হয়েছেন। যখন ছেলেদের খাওয়াবে, ভাব্‌বে—যেন গোপালকে খাওয়াচ্চি। পিতা মাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে, লোকের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকেনা। তখন দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়েই থাকে, ভক্তের সেবা করে। সর্ব্বভূতে তিনি আছেন জেনে, তাঁর সেবা দুজনে করে।

২১০। ঈশ্বরের শরণাগত হও, তা হলে সব পাবে।

২১১। সংসারে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত—রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই, ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার। তবে উপায় আছে,—মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে, তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

২১২। একেবারে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাবার দরকার নাই। যখন অবসর পাবে, কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে দু' একদিন থাকবে, যেন কোন সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে, যেন কোনও বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় নিয়ে আলাপ করতে না হয়। হয় নির্জ্জন বাস, নয় সাধুসঙ্গ, সংসারী লোকের উপায়।

২১৩। যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু, তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, সর্ব্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন, যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না, আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে, তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এই গুলি সাধুর লক্ষণ।

২১৪। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়, অসৎকে ভাল বাসলে—যেমন দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা, এই সব ভালবাসলে, ঈশ্বর

যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে।

২১৫। মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হলে তবে তত্ত্বকথা মনে উঠে।

২১৬। যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নেতি নেতি ক'রে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে, তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বর—মায়া জীব জগৎ। তখন বোধ হয় জীবজগৎ শুদ্ধ তিনি।

২১৭। যদি একটা বেলের খোলা শাঁস আর বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন যদি বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল একবার দেখতো। তুমি কি খোলা আর বীচি ফেলে দিয়ে কেবল শাঁসটা ওজন করবে? না ওজন করতে হলে খোলা বীচি সমস্ত ধরতে হবে, তবে বলতে পারবে বেলটা এত ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বীচি। বিচার করবার সময় বেলের শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার ব'লে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে সমস্ত জড়িয়ে এক ব'লে বোধ হয়। তখন বোধ হয় যে, যে সত্ত্বাতে শাঁস, সেই সত্ত্বা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলেই সব বুঝিয়ে যাবে।

২১৮। অনুলোম আর বিলোম। ঘোলেরই মাখন আবার মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে, তবে মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তবে ঘোলও হয়েছে। যদি আত্মা থাকে, তবে অনাত্মাও আছে।

২১৯। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা, যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। যিনি ঈশ্বর ব'লে গোচর হন, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।

২২০। তাঁকে যে জেনেছে সে দেখে যে, তিনিই সব হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীব, জন্তু, ভাল, মন্দ, শুচি অশুচি সমস্ত।

২২১। পাপ পুণ্য আছে, আবার নেই। যদি তিনি অহংবুদ্ধি রেখে দেন, তা হ'লে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ-পুণ্য-জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু'একজনেতে অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন, তারা পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের পার হয়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভাল-মন্দ-জ্ঞান থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পারো—"আমার পাপ পুণ্য সমান হয়ে গেছে, তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি"—কিন্তু অন্তরে জানো যে, সব কথা মাত্র—মন্দ কাজটী করলেই মন ধুগবুগ করবে।

২২২। ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস-আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে—'আমি দাস তুমি প্রভু'। সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ ভাল লাগে; ঈশ্বর বিমুখ লোক ভাল লাগে না, ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হোলো, এরূপ ভক্ততেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।

২২৩। তাঁকে ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই হোলো। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘটী হলেই হোলো। চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিঁপড়ে গিছিল, তার সব পাহাড়টার কি দরকার? একটা দুইটা দানা হলেই হেউ ঢেউ হয়।

২২৪। সরলতা লাভ পূর্ব্বজন্মের অনেক তপস্যা না থাকলে হয় না। কপটতা—পাটোয়ারি—এ সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দেখনা—ভগবান যেখানেই অবতার হয়েছেন সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল! নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল! লোকে কথায় বলে—'আহা কি স্বভাব; যেন নন্দ ঘোষ'।

২২৫। যদি পাগল হতে হয়, সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয়, ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

২২৬। লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা। সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ান কিনা তাঁহাকে আহুতি দেওয়া। কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নেই। এমন লোক যারা ব্যাভিচারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, সে যায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

২২৭। অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি করছি'—এটী অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর! তুমি করছ' এইটী জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা।

২২৮। আমি আমি করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাছুর 'হাম্ মা' 'হাম্ মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে, রোদ নাই, বৃষ্টি নাই, হয়ত কসাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে, সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ারি হবে। লোকে তার ভিতর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয়নি। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ীভুঁড়ি

গুলো নিয়ে তাঁত তৈয়াবি করে। যখন ধুনরীব তাঁত তোয়ের হয়, তখন ধোন্‌বার সময় 'তুঁহু' 'তুঁহু' বলে। আব 'হাম্ মা' 'হাম্ মা' বলে না। তুঁহু তুঁহু (তুমি, তুমি) বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তাব মুক্তি। আব কর্ম্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।

২২৯। জীব যখন বলে 'হে ঈশ্বর। আমি কর্ত্তা নই তুমিই কর্ত্তা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' তখনই জীবেব সংসাব যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবেব মুক্তি হয়, আব এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসতে হয়না।

২৩০। ঈশ্বরকে দর্শন না কবলে অহঙ্কাব যায়না। যদি কাক অহঙ্কাব গিয়ে থাকে তাব অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

২৩১। ঈশ্বব দর্শনেব লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন কবেছে, তাব চাবটি লক্ষণ হয় (১) বালকবৎ (২) পিশাচবৎ (৩) জড়বৎ (৪) উন্মাদবৎ।

২৩২। যাব ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তাব বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত, কোন গুণেব আঁট নাই। আব শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবাব কখন জড়েব মত চুপ০ করে বসে থাকে। কখন পাগলের মত হাসে কাঁদে নাচে গায়। এই বাবুব মত সাজেগোজে, আবাব খানিক পরে ন্যাংটো—বগলের নীচে কাপড় বেখে বেড়াচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম।

উৎকট বিজ্ঞানবিৎ তাঁহাব গভীব গবেষণাব দ্বাবা এখনও জগতের উৎপত্তির দিনটী স্থির নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি সফলকাম হইবার আশা সুদুবপরাহত ভাবিয়া বিজ্ঞানেব হাল ছাড়িয়া নিশ্চেষ্ট হন নাই। কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে এই ধরাধামে আদম হবাব বংশধরগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহা লইয়া বিকট প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কর্ণভেদী কোলাহলে মানব সমাজ, এখনও মুখরিত। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে মানব-মনে ধর্ম্ম বুদ্ধির প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে, তাহা লইয়া পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী যথেষ্ট মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া স্তূপাকার পুস্তক লিখিয়া কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে এখনও সন্দিহান। এই জগতে যে পরিমিতকাল আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তাহার সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। প্রত্যেক প্রাণী-

শরীরে যেরূপ দুইটী শক্তি (Centripetal ও Centrifugal force কেন্দ্রানুগশক্তি ও কেন্দ্রাতিগশক্তি) পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে কার্য্য করিয়া উহাকে পরিপুষ্ট বর্দ্ধিত ও জীবিত রাখিতেছে, সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম যেন মানবজীবনকে নিয়মিত করিয়া উহার অস্তিত্ব সম্পাদন করিতেছে। এই কর্ম্মসংভূত কর্ম্মময় মানবজীবনে যেমন কেহ এক মুহূর্ত্তকাল কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়নক আমরা কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্ম আমাদিগকে পেষিত করিয়া যাইবে—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

ইহা যদ্রূপ সত্য, কর্ম্মের অঙ্গীভূত ধর্ম্ম প্রতি মানবজীবনে অনুস্যূত থাকিয়া তাহাকে পোষণ করিতেছে, ইহাও তদ্রূপ সত্য।

যাহা কিছু রহস্যপূর্ণ, যাহা কিছু দুর্জ্ঞেয়, তাহারই সমস্যা নিরাকরণেই মানবের ধীশক্তি নিয়োজিত, মানবের পূর্ণ মনুষ্যত্বই যেন উহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্য ঋষিকুল হইতে প্রতিভাশালী মনীষীগণ পর্য্যন্ত এই সত্যই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা এপর্য্যন্ত যে সমুদয় গভীর গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আলোকে আমার ক্ষীণদৃষ্টি যতটুকু দেখিতে বুঝিতে শক্য হইয়াছে, তাহারই আলোচনার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'ধর্ম্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থনির্ণয় করা বিধেয়, অন্ততঃ আমরা যেরূপ অর্থে উহাকে গ্রহণ করিব, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস বিচারের পূর্ব্বে দেওয়া উচিত, নচেৎ বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে।

ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি? তাহা নির্ণয় করিবার অগ্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্য অর্থ যাহা আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা বলা প্রয়োজন। ধর্ম্ম আমরা অনেক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রথমতঃ বস্তুর স্বভাব যাহা তাহাকে তাহার ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, যেমন জলের শৈত্য ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ আশ্রম বিশেষকেও ধর্ম্ম কহে, যেমন ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নীতিকে ধর্ম্ম আখ্যা দিয়া থাকি, যথা—সত্যপ্রিয়তা, দানশীলতা, ক্ষমা, ঔদার্য্য, শম, দম ইত্যাদি। চতুর্থতঃ লৌকিক ও সামাজিক রীতিনীতিকে ধর্ম্ম শব্দে গ্রহণ করি। বংশ বা কুল পরম্পরাগত যে সমুদয় প্রথা চলিত আছে, তাহাও সময়ে সময়ে ধর্ম্ম আখ্যায় আখ্যায়িত হয়। তারপর অপরস্তু হিন্দু মুসলমান

প্রভৃতি নানা জাতির ভগবৎ উদ্দেশ অবলম্বিত ভিন্ন ভিন্ন সাধন প্রণালীকেও ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, যথা—হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ইত্যাদি। এই এতগুলি অর্থে আমরা প্রায়শঃ ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করি।

উপরে ধর্ম্ম শব্দের সাধারণ অর্থসমূহ লিখিত হইয়াছে, উহার মধ্যে কোন একটীকে ধর্ম্ম এবং অপরটিকে অধর্ম্ম বলিয়া বাদবিতণ্ডা বাঁধাইবার উদ্দেশ্য দীন প্রবন্ধলেখকের নাই, অথবা অযথা চুলচেরা তর্কবিতর্ক করিয়া বৃথা শক্তিক্ষয়, কালক্ষেপ ও সহৃদয় পাঠকবর্গের চিত্ত-চাঞ্চল্য করিবার উদ্দেশ্যও নাই, তবে ভিন্ন ভিন্ন মতালোচনা করিয়া তন্মধ্যে সার-নিষ্কাশনের অধিকার সকলেরই আছে, আমরা এই স্থলে সেই পন্থা অবলম্বন করিব। আমাদের বিচার্য্য বিষয় প্রধানতঃ তিনটি; ১ম, ধর্ম্মশব্দের অর্থনির্ণয়, ২য়—ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি; ৩য়—ধর্ম্মের লক্ষ্য। এই তিনটি বিষয় স্মরণে রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ধৃ + মন প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি। যাহার দ্বারা মনুষ্যত্ব ধৃত হয় তাহাই ধর্ম্ম। কেহ বলেন, যাহা দ্বারা লোক রক্ষা হয় অর্থাৎ সমাজ রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম। মনুষত্ব ও সমাজ উভয়ের মধ্যে সীমাজ্ঞাপক রেখা টানা একটু কঠিন, যাহারা ধর্ম্ম অর্থে মানব ধর্ম্ম, মনুষত্ব বুঝেন, তাঁহাদের মতে যাহা দ্বারা মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিগুলি সম্যক্ পরিপুষ্ট স্ফুরিত হইয়া মানবের সর্ব্বাঙ্গীন্ পূর্ণতা ও সার্ব্বজনীন কুশলতা সম্পাদন করেন, তাহাই মানব-ধর্ম্ম। "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"—যাহা হইতে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক মঙ্গল এবং অন্তে (মৃত্যুর পর) মোক্ষ লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাঁহাদের মতে ধর্ম্মের ভিত্তি সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা অন্যরূপ অর্থ করেন, সেটি অনেকটা এইরূপ—সমাজ অর্থে দলসমূহ, অর্থাৎ সমষ্টিকে বুঝায়, বিন্দু বিন্দু জলকণা মিশিয়া যেমন বিশাল জলস্রোত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা জমিয়া যে প্রকার অত্যুচ্চ গিরিরাজীতে পরিণত হয়, তদ্রূপ এক একটী ব্যষ্টি জীব একত্রিত হইয়া বিরাট মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা করে। ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ মতানুযায়ী সর্ব্বাগ্রে এই মানব পশুধর্ম্মী ছিল, ক্রমশঃ অভিব্যক্তির সোপান পরম্পরায় বর্ত্তমান কীর্ত্তিমান মানব পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে। সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে কতকগুলি নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়,—সেইগুলি হইল নীতি, প্রবৃত্তির দমন শিক্ষা করিতে হয়, সংযম অভ্যাস করিতে হয়, কর্ত্তব্য জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ করিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকার বিধিবদ্ধ নিয়মের পালন সমাজ রক্ষার অনুকূল, অতএব এই গুলি ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপক্ষের মত।

উভয় পক্ষের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল, এক্ষণে আসুন ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করি। মানবজাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, অতি আদিমকালে এই মানুষ সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মী ছিল, তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন চিন্তা তাঁহাদের অসংস্কৃত বুদ্ধিতে স্থান পাইত না, তাহারা সম্পূর্ণরূপে আপন পশুপ্রবৃত্তির অধীন ছিল, কেবল আত্মসুখান্বেষণে ধরাবক্ষে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, প্রবৃত্তির অঙ্কুশ তাড়নে যথা ইচ্ছা কলুষাচারের অনুষ্ঠানে সুখ অনুভব করিত, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, কি প্রকারে প্রকৃতিদেবীর অজ্ঞাতবিধানে সেই মূঢ় বর্ব্বর অসভ্য মানবসমাজে চিত্তবৃত্তি উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে সভ্যমানব পদবীতে আরোহণ করিতে লাগিল! অভিব্যক্তি স্তরে স্তরে কর্ত্তব্যবুদ্ধির বিকাশ লাভ ঘটিতে লাগিল, ধর্ম্মবুদ্ধির উন্মেষ হইতে লাগিল। পশু প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে দুইটি সর্ব্ব প্রধান, একটী ক্ষুৎপ্রবৃত্তি অপরটী কামপ্রবৃত্তি। কামপ্রবৃত্তি, বংশবৃদ্ধি ও সমাজরক্ষার অনুকূল হইলেও ক্ষুৎপ্রবৃত্তির প্রবল পীড়নে বংশরক্ষা ও সমাজরক্ষা সুকঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। যেখানে জীবের আহার জীব, মানুষের আহার মানুষ, সেখানে জীবন সংগ্রামে দুর্ব্বলের জীবন আশা কিছুমাত্র নাই।

রাক্ষসাচার নরমাংস ভক্ষণ, এক সময়ে প্রায়ই সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। অমানিশার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে যাহাদিগের মুখ চিরদিনের জন্য আবৃত তাহারাই ভাগ্যবান, ঐতিহাসিক যাহাদিগের দুষ্কৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহারাই ধরা পড়িল, মানুষে মানুষের মাংস আহার করে এইটী কি বীভৎস ব্যাপার! দেখিলেও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। হোমর হিরডোটাস্ প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ অনেক দেশের রাক্ষসাচার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পুরাকালে সাইক্লপ ও লেষ্ট্রোগণ সিথীয় ও মাসাগেটী জাতি নরমাংস ভক্ষণ করিত। ফিজি অধিবাসীরা এখনও নরমাংসপ্রিয়, কঙ্গোদেশে খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে মৎস্য, ছাগ, মেষ-মাংসের ন্যায় নরমাংস বাজারে বিক্রয় হইত। চট্টগ্রামবাসী কুকি জাতি নরমাংস ভক্ষণ করিত ইত্যাদি। এই প্রকার কত উল্লেখ করিব, ইতিহাসের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ইহার জলন্ত সাক্ষী। সেই নিকৃষ্ট অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানুষ আজ এত সভ্য হইয়াছে, ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। মানুষকে যখন তাহা অপেক্ষা অধিকতর বলশালী জীবের সহিত বাস করিতে হয়, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া দল বাঁধিয়া বাস করিতে হয়। ভীষণ ব্যাঘ্র সিংহ সরীসৃপ প্রভৃতির করাল দংষ্ট্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য,

আপনাপন শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য, দলের পুষ্টিসাধনে তৎপর হইতে হয়, এইরূপ মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার চেষ্টা হইতে সমাজ সৃষ্টি ধীরে ধীরে আরম্ভ।

এক্ষণে ধর্ম্মের সহিত সমাজের কি সম্বন্ধ দেখা যাউক; দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রধান কারণ—আপনাকে এবং স্বজনবর্গকে সকলের পীড়ন হইতে রক্ষা—এইরূপে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ভাব হইতে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বিকশিত হইয়া উঠে, প্রবৃত্তির দমন আবশ্যকে হয়, অল্পে অল্পে কলুষ আচারের নিবারণের নিমিত্ত নানা নীতিসূত্র গ্রথিত করিতে হয়—নিয়মের শৃঙ্খলা আঁটিতে হয়, যে সকল নিয়ম দ্বারা সমাজ রক্ষিত হয়—সমাজের বন্ধনী দৃঢ় হয় তাহাই ধর্ম্মসূত্র, অতএব যাহা দ্বারা লোক বা সমাজ রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম। প্রতিপক্ষের যুক্তির সার্থকতা এইরূপে ঘটিল। এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন—আচ্ছা, এইরূপে না হয় মানব সমাজের সৃষ্টি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি হইয়াছে; কিন্তু মনুষ্যেতর জীবে কি ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই? ঐ যে সিংহ ব্যাঘ্র অনায়াসে নিরীহ ছাগ শিশুকে গলাধঃকরণ করিতেছে, ভীষণ সরীসৃপ কত নির্দ্দোষী প্রাণীকে উদরসাৎ করিতেছে, ইহার জন্য তাহাদিগকে দণ্ডলাভ করিতে হয় কি না, ধর্ম্মের ন্যায়ে দায়ী হইতে হয় কি না? ইহার উত্তরে—এক্ষণে যাঁহারা Survival of the fittestএর দুন্দুভি ধ্বনিতে দিক্ নিনাদিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন—ইহা ঠিকই হইতেছে, দুর্ব্বল সকলের ভক্ষ্যরূপে বিধিনির্দ্দিষ্ট হইয়া ধরাধামে আসিয়াছে, ইহার নিমিত্ত হা-হুতাশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রাণী কখন দয়া-পরবশ হইয়া 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' ভাব অবলম্বন করিয়া আপন জঠরানল নিবৃত্তির জন্য বাতাহারী হইয়া বসিবে না। নীতিশাস্ত্রকারগণ এখানে নীরব, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অশীতি লক্ষ যোনি অতিক্রম করিয়া মানবজন্মেই ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন—উহার পূর্ব্বে নহে। প্রকৃতিদেবীর এটা কৃপা কি অকৃপা তাহা পাঠক বুঝিয়া লউন, মোটের উপর প্রাণীবর্গ যাহা কিছু করে natural instinct বশেই করিয়া থাকে, সহজ সংস্কার বশে চালিত হইয়া করে, ইহাই জগৎ-বিধান। আচার্য্য-হাক্সলি মহাশয় উহার নামকরণ করিয়াছেন Cosmic progess এবং তাঁহার মতে উহা unmoral অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বহির্ভূত। জড়-জগতের আদান প্রদানের মধ্যে ও নিকৃষ্ট প্রাণীজগতের জীবন সংগ্রামের ভিতর পরস্পর রক্তপাত এবং আপনাপন আহার সংস্থানের চেষ্টার মধ্যে কোন ধর্ম্মাধর্ম্মের হিসাব নিকাশ নাই. উহাকে immoral না বলিয়া unmoral বলাই আচার্য্যের মতে

যুক্তিসঙ্গত; এবং যে নিয়মে, যে বিধানে, উন্নত মানব-মনে বিবেক বুদ্ধির উদ্রেক হয়, কর্ত্তব্য বুদ্ধির উন্মেষ হয়, তাহার নাম দিয়াছেন ethical process, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের ভাব যত এইখানে। জ্ঞানকৃত অপকর্ম্মই পাপ বলিয়া গৃহীত হয়, অজ্ঞানে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া পাপ বা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। আবার কেহ বা এই অজ্ঞানতাকেই মহাপাপ বা অধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন না।

পাঠক বোধ হয় অধৈর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, তবে ধর্ম্ম কি? আমি তজ্জন্য পাঠকের নিকট অগ্রেই নিবেদন করিতেছি যে, এই পথ বড়ই দুর্গম—অতি সাবধানের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে,—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"—তবে নৈরাশ্য অবলম্বন অবিধেয়, যতক্ষণ আমাদের সমক্ষে "মহাজনং যেন গতঃ স পন্থা" বিরাজমান।

উপরে উক্ত হইয়াছে, যাহা দ্বারা সমাজ রক্ষিত হয় তাহাই ধর্ম্ম—অর্থাৎ যে রীতিনীতির পালনে, যে নিয়ম প্রণালীর অনুষ্ঠানে সমাজগ্রন্থী দৃঢ়ীভূত হয় তাহাই ধর্ম্ম। এক্ষণে দেখা যাউক—অভিব্যক্তির সোপান পরম্পরায় যে প্রকারে সেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন অতীতের বর্ব্বর অসভ্য মানবসমাজ বর্ত্তমান শিক্ষিত সভ্য জ্ঞানী সমাজে পরিণত হইয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে কত বৈলক্ষণ্য, কত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পশুর ধর্ম্ম অসভ্য বর্ব্বর সমাজে অনুষ্ঠিত হয় না, আবার অসভ্যের পালনীয় ধর্ম্ম সভ্যতম মানব-সমাজে গৃহীত হয় না। সমাজের ন্যায় ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনীয়। ব্যাকরণ যেমন ভাষার অনুসরণ করে ধর্ম্মও সেইরূপ সমাজের অনুসরণ করে। এখানে সামাজিক আচার রীতি নীতি পদ্ধতিকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মকে যাঁহারা এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। যেখানে ধর্ম্ম সমাজের মুখ চাহিয়া চলে, সমাজের গতি লক্ষ্য করিয়া চলে, সেইখানে ধর্ম্মের মহত্ব থাকে না, তাহার গৌরবের লাঘব ঘটে। এখানে ধর্ম্মের অর্থ দেশাচার, কালবিশেষে অবলম্বিত সামাজিক রীতিনীতি পদ্ধতি, এই মাত্র।

কেহ কেহ উপাসনা, বন্দনা, যজন যাজনকে ধর্ম্ম স্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অসভ্য বর্ব্বর সমাজের অনুষ্ঠিত পূজাপদ্ধতির সহিত উন্নত সুসভ্য মানবের পূজাপ্রণালীর মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। বর্ব্বরসমাজে প্রেতপূজা, অনুন্নতসমাজে প্রকৃতি (nature)

পূজা, এবং সভ্যসমাজে প্রতিমা পূজা," এইরূপে অভিব্যক্তির স্তরে স্তরে মানব-প্রকৃতির ব্যাবৃতি পরিমাণে ধর্ম্মবিশ্বাস ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান স্বতঃই বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দেব-সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে প্রেতসৃষ্টি। এই মানব যখন দেবতা পূজা শিখে নাই, তখন প্রেতাত্মার পূজা করিত এবং তাঁহার সন্তোষার্থে কতই বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠান করিত। নানা কারণে প্রেতাত্মার উদ্দেশে নরবলি দিবার প্রথা ধর্ম্মরূপে নানা সমাজে গৃহীত হইতে দেখা যায়। পেরুদেশে কাহারও পীড়া হইলে প্রেতাত্মার নিকট আপন পুত্রকে বলি দিয়া রোগমুক্ত হইবার কামনা করিত। ট্রোজানদিগের হস্তে পাট্রকলসের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রেতাত্মার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গ্রীক সেনাপতি পাট্রকলসের সমাধি-ক্ষেত্রে দ্বাদশটী ট্রোজানকে বলি দিয়াছিলেন। আগষ্টস্ জুলিয়সের প্রেতাত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য পেরুসিয়ার তিনশত অধিবাসীকে বলি দিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতির মধ্যে যে রীতি প্রচলিত ছিল, অসভ্য ও বর্ব্বরদিগের মধ্যে সে রীতি তদপেক্ষা কত বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকা সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। যেখানে প্রতিমা পূজা, সেখানে প্রকৃতি ও প্রেতপূজা দেখা গিয়া থাকে। পেকিংয়ে প্রকৃতিদেবীর পূজার্থে এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকে Temple of Heaven বলে এবং সেই মন্দির প্রাঙ্গণের চতুঃপার্শ্বে অপরাপর দেবদেবীর মন্দির আছে, তাহাদিগকে Temple of Earth ও Temple of invisible deity ইত্যাদি বলা হয়। এরূপ সত্ত্বেও তথায় প্রেতপূজাও বিশেষ ঘনঘটার সহিত চলিয়া থাকে। আবার তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণেরও ত্রুটি নাই। সে যাহা হউক, প্রত্যেক স্তরের মানবসমাজের অবস্থানুযায়ী পূজাপদ্ধতি বন্দনা যজন যাজনকে ধর্ম্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। সোপানরাজির কোনও সোপানকে উপেক্ষা করিবার নহে। অতীত উপেক্ষা করিলে বর্ত্তমান বুঝা যায় না এবং বর্ত্তমান উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যৎ মিলিবে না। মানবসমাজ যে স্তরের ভিতর দিয়া আসিয়া সভ্য হইয়াছে, সভ্য মনুষ্যের প্রত্যেককে সেই সেই স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, অনুবৃত্তির (Heredity) নিয়মই এই। মানবসমাজে অবস্থানুযায়ী ঈশ্বর উদ্দেশে গৃহীত পন্থাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না।

সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ কিন্তু এখানেও ক্ষান্ত হন না, তাঁহারা ঈশ্বর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্মের বাহিরের একটী আবরণ স্বরূপে স্বীকার করেন। এবং

যাঁহারা মনুষ্যত্বের পক্ষপাতী তাঁহারা ইহাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের সারভাগ কি? তাহার তত্ত্ব ত মিলিতেছে না। ধর্ম্মের একটী মূল ভাব আছে, একটী সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ করিতে গিয়া মতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে গিয়া কতকগুলি রীতি নীতি অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। মানব সৃষ্টির আদি-কাল হইতে যে এক হৃদয় উন্মাদক আকাঙ্ক্ষা, অনির্ব্বচনীয় তৃষ্ণা মানবপ্রাণকে আলোড়িত করিতেছে—তাহাই সাধক, মহাপুরুষ, এবং অবতারগণ যুগে যুগে ভাষায় ও কর্ম্মে প্রকাশ করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানের অবতারণা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন মত হইলেও উহার মধ্যে একতার ও সামঞ্জস্যের স্থান আছে, নানাত্বের মধ্যেও একত্বের সুবর্ণসূত্র রহিয়াছে, ধর্ম্মের প্রাণভূত সেই বস্তুটিই প্রকৃত সার। মত মতান্তর অনুষ্ঠানাদি বাহিরের ব্যাপার।

এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিকে যত ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটিয়াছে, যত মতান্তরের ঝঞ্ঝাবায়ু বহিয়াছে, তাহার সহিত জগতের অন্য কোন প্রদেশের তুলনা হয় না। কেহ বলেন,—অহো, কি সুন্দর সত্য আর্য্য-ধর্ম্মের বিমল উজ্জ্বল আলোকে গগন উদ্ভাসিত; অপরে বলেন,—ঐ দেখ অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের পতাকা গগনে উড্ডীয়মান; তৃতীয় ব্যক্তি ক্রুশ হস্তে অগ্রসর হইয়া বলেন—দেখ পাপী, তোমার জন্য কি মহান্ আত্মত্যাগ, এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর। ইহা অপেক্ষা আরও কত গুরুতর অভিনয় ভারতবক্ষে অভিনীত হইয়া আসিতেছে। একজন বলেন—হোমকুণ্ড কৈ? যুপকাষ্ঠে ছাগ কই? প্রেতাত্মা কৈ? দক্ষিণার আয়োজন কিরূপ? আবার শুন, একজন বলিতেছেন, শিব, শিব, এ সমুদয় কি? রক্তপাতে মঙ্গল কামনা, প্রেতপূজার অনুষ্ঠানে প্রেমময়ের আরাধনা? কি অজ্ঞানতা! দাও যজ্ঞকুণ্ড নিভাইয়া, তোল সেইখানে চৈত্য নিশান, কর বিহার। হরি! হরি! আবার জঞ্জাল ঘটিল, দয়াসিন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বীভৎস ক্রিয়াকলাপে চারিদিক ছাইয়া ফেলিল, পঞ্চমকার নব ধর্ম্মের সৃষ্টি করিল। আবার রব উঠিল, মাভৈঃ! হর, হর, মায়ার আবরণ ছিন্ন কর, চিরমুক্ত তুমি, বদ্ধ—এ অজ্ঞানতা ত্যাগ কর, শুদ্ধসত্ত্ব তুমি, দুর্নীতি কপটাচারের প্রশ্রয় দিওনা, বল—চিদানন্দরূপশিবোহম, চিদানন্দরূপশিবোহম, মাটে মাঠে কাননে কান্তারে মঠ স্থাপনা কর। আবার স্বচ্ছ সরোবর পঙ্কিল হইয়া পড়িল। অমনি জাহ্নবীতটে মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল, রাঙা পায়ে সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজিল; ভয় নাই, ভয় নাই, এসেছে এসেছে

রব উঠিল, যুগধর্ম প্রবর্ত্তিত করিতে নূতন মানুষ এসেছে, এস এস সংকীর্ত্তনে যোগ দাও, কে কোথায় পতিত আছ কেঁদনা, তোমায় কোলে লইবার জন্য স্বয়ং প্রেমময় উপস্থিত, শত গ্রন্থি চীর পর, ছিন্নকন্থা অঙ্গবাস কর, তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হও, যম নিয়মের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে না, কেবল মুখের কথায়—হরিবোলে অবহেলে ভবনদী পার হইবে। এইরূপে ধার্ম্মিকের রক্ষা ও আর্ত্তের পরিত্রাণের জন্য ধর্ম্মবন্যা কতবার এই ভারত-ভূমিকে প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কতবার ছুটিবে।

এইরূপ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মতবাদ সৃষ্ট হউক ক্ষতি নাই, বাহ্যতঃ প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও উহাদের প্রত্যেকর অন্তস্থলে একটী সত্য নিহিত আছে, সেইটীই ধর্ম্মের মূল, আর সমুদয় বাহিরের বস্তু। সত্য উপলব্ধির প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতে নানা ধর্ম্মমতের উৎপত্তি। উপদিষ্ট মতমতান্তরের পালনে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, মনুষ্যত্ব লাভ ঘটে না, ইহার সাক্ষী সম্প্রদায়িক ইতিহাস।

বুধমণ্ডলী ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—কেহ বলেন প্রেম, কেহ বা নির্ভর, অপরে বিস্ময়, কেহ বলেন ভয়। মহাত্মা থিওডোর পার্কারের মতে Sense of dependence হইতে (নির্ভরের ভাব হইতে) ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি, পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেনসারের মতে wonder (বিস্ময়) হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, য়িহুদী ধর্ম্মের মূল ভাব ভয়, কেহ বা ভাব হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি স্বীকার করেন। নির্ভর, বিস্ময়, ভয়, এ সমুদয় বুদ্ধিসৃষ্ট, ভাবের উৎপত্তি বুদ্ধির পূর্ব্বে। বর্ব্বর ভাবসর্ব্বস্ব, অসভ্য ভাব-প্রধান, সভ্যে ভাবাধিক্য; যে ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া বর্ব্বর উদ্ভিদের উপাসক, অসভ্য সূর্য্য, সমুদ্র, মেঘের উপাসক, সেই ভাবের দ্বারাই চালিত হইয়া সুসভ্য শিক্ষিত মানব চৈতন্যের উপাসনায় নিযুক্ত। ভাবই ধর্ম্মের প্রসূতি, বুদ্ধি তাহার ধাত্রী। এইরূপে পাঁচজনে পাঁচপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

উপরিলিখিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মতদ্বৈধের মধ্যেও সুস্পষ্ট একতাসূত্র লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসুতা। ধর্ম্ম সত্যেরই অনুধাবন করিয়া থাকে, সত্যকে অবলম্বন করিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। "ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ" এই লক্ষণ দ্বারা নানা অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করা যায়। সত্য উপলব্ধির প্রবল আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগরূক না হইলে, ধর্ম্মজীবনের আরম্ভই হয় না। বিশ্বাস-নয়নে সত্যকে দর্শন

করিয়া তাহার অনুগত হওয়াই ধর্ম্ম "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে, অয়নায়।" ধর্ম্মের সারতত্ত্ব এইখানে নিহিত। যাহা কিছু মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, সমুদয়ের মূলভিত্তি এইখানে প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন ঋষি Emerson তাঁহার Over soul প্রবন্ধের এক স্থানে এই সত্যটী সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"What we commonly call man, the eating drinking, planting, counting man does not, as we know him, represent himself, but misrepresents himself. Him we do not respect, but the soul, whose organ he is, would he let it appear through his action, would make our knees bend. When it breathes through his intellect it is *genius* ; when it breathes through his will it is *virtue,* when it flows through his affection it is *love,* and the blindness of the intellect begins, when it would be something of itself. The weakness of the will begins when the individual would be something of himself. All reform aims in some one particular, to let the soul have its way through us in other words to engage us to obey."

"আমরা সচরাচর যাকে মানুষ বলি, যে মানুষ আহার করে, পান করে, কৃষিকার্য্য করে, কেরাণীগিরি করে, এ মানুষ দেখিলে প্রকৃত মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং পরিচয়ের ব্যাঘাত হয়, সেই মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি না; কিন্তু সেই আত্মা (পরমাত্মা), মানুষ যাহার যন্ত্র স্বরূপ, যদি মানুষ তাহাকে নিজ কার্য্যে প্রকাশ হইতে দেয়, তবে তাহার নিকট আমাদের মস্তক অবনত হয়। এই মহান আত্মা যখন মানবের বুদ্ধি দ্বারা প্রবাহিত হয়, তখন সে বুদ্ধি প্রতিভার আকার ধারণ করে; যখন হৃদয়কে আশ্রয় করে তখন প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়। যখন আমাদের বুদ্ধি স্বতঃই একটী কিছু হয়ে দাঁড়াতে চায়, তখন আমাদের বুদ্ধির অন্ধতা প্রকাশ পায়, যখন মানুষ নিজে একটী কিছু হতে চেষ্টা করে তখনই মানব ইচ্ছার দুর্ব্বলতা আরম্ভ হয়। সকল প্রকার সংস্কারের একই উদ্দেশ্য— আমাদের মধ্য দিয়া সেই মহান আত্মাকে প্রবাহিত করা অর্থাৎ আমাদিগকে তাহার অনুগত করা।" ইহা সত্য, অতি সত্য।

ধর্ম্মশাস্ত্রের যতই অনুশীলন থাকুক না, ধর্ম্মানুষ্ঠানের যতই আড়ম্বর হউক

না, তর্কছটা ব্যাখ্যাঘটার যতই জটিলতা থাকুক না, মূলসত্য, সারবস্তু ঐটি ভিন্ন আর কোনটি নয়। যাঁহারা সামাজিক রীতি নীতি রক্ষণে, কুলক্রমাগত আচারের পালনে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে, ধর্ম্মজ্ঞানে নিজেকে ধার্ম্মিক ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাইতেছেন তাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী, ধর্ম্মলাভ, ধর্ম্মের লক্ষীভূত সত্য লাভ, তাঁহাদের জীবনে সুদূরপরাহত। বীর ভিন্ন কেহ ধর্ম্মলাভে সমর্থ নহে, যাহার দেহে জীবন নাই, ধমনীতে শোণিত নাই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নাই, বক্ষে সাহস নাই, ধর্ম্ম উপার্জ্জন তাহার পক্ষে আকাশ-কুসুম। যাহার অনুষ্ঠানে সংসারাসক্তির হ্রাস হয় না, পাপের প্রতি ঘৃণা হয় না, পুণ্যের ক্ষুধা প্রবল হয় না, পবিত্রতা সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জন্মে না, তাহা ধর্ম্ম নহে; যাহার পালনে জীবনে শক্তিসঞ্চার হয় না, হৃদয়ের প্রসারণ হয় না, অন্তর নির্ম্মল হয় না, ভাবের উৎস খুলিয়া যায় না, তাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা বিষবৎ ত্যাগই বাঞ্ছনীয়, হউক তাহা পিতৃপিতামহের গৃহীত পন্থা, হউক তাহা ধর্ম্মাচার্য্যের আদেশ, হউক ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন, তাহার মূল্য এক কপর্দ্দকও নহে।

ধর্ম্মের লক্ষ্য সত্য লাভ, ধর্ম্মাবহ পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার, সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী ও প্রেমিকমণ্ডলী এইরূপ অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিব, এবং অপরে, যাঁহারা ধর্ম্মের লক্ষ্য সমাজ রক্ষা, পারলৌকিক সুখ, ঐহিক মঙ্গল, এইরূপ নিকৃষ্ট অর্থে ধর্ম্মশব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই। আবার কেহ কেহ ধর্ম্ম অর্থে "ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং" প্রভৃতি কয়েকটি গুণের উল্লেখ করেন, যাঁহারা এইরূপ অর্থে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের গূঢ় মহৎভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এগুলি বাহিরের ক্রিয়া, ধর্ম্ম উহার প্রাণ, ধর্ম্মের ভিত্তির উপর উক্ত গুণাবলীর সৌধ নির্ম্মিত; গুণগুলি ফুল, ধর্ম্ম তন্মধ্যস্থ রস, ধর্ম্ম ঐ গুণ গুলির সঞ্জীবনী শক্তি।

এইবার উপসংহার করা যাউক, এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল তাহার সংক্ষেপে সার নিষ্কর্ষণ করিলে কি পাওয়া যায় দেখা যাউক। ধর্ম্মবিশ্বাস স্বাভাবিক। সেই অতীতের অসভ্য বর্ব্বর মানবসমাজ হইতে বর্ত্তমান শিক্ষিত সুসভ্য মানবসমাজ পর্য্যন্ত অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম বুদ্ধির ক্ষীণ সূত্র অভিব্যক্তির সোপান পরম্পরায় ধীরে ধীরে পরিস্ফুট উন্মেষিত হইয়া আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অশিক্ষিত অসভ্য মানব হইতে জ্ঞানী

বিজ্ঞসমাজ পর্য্যন্ত কেহ বা ভয়ে কেহ বা বিস্ময়ে কেহ বা প্রেমের সহিত এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির উদ্দেশে আপনাকে নত করিতেছে, এবং তাহা হইতে ধীরে ধীরে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অনুষ্ঠানের অভ্যুদয় ঘটিতেছে, এবং কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে মানব হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া ছুটিয়াছে, তাহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই, এবং যতদিন না ধর্ম্মাবহ পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিতেছে, ততদিন ইহার বিরাম নাই, আকাঙ্ক্ষার পর্য্যাবসান নাই। ধর্ম্মের ইহাই লক্ষ্য। মানব হৃদয় যতদিন এইরূপ ভাবে ধর্ম্মের মর্ম্ম, ধর্ম্মের প্রভাব ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে না পারে, ততদিন সে নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় স্থূল বিষয় লইয়া পড়িয়া থাকে, আর ধার্ম্মিক প্রেমিক মহাজনেরা উহা'র গভীর সত্যভাবের মধ্যে মন প্রাণ নিমজ্জিত করিয়া তন্ময় হইয়া যান, এবং তাঁহাদের মুখে অহর্নিশি এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে থাকে—

"Virtue, I am thine, save me, use me. Thee will I serve day night in great, in small, that I may be not virtuous, but virtue.

শ্রীনরেন্দ্রকুমার দত্ত।

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া এ দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ হয়, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। অবশ্যই অনেকে হিন্দুশাস্ত্রের এ মত কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবেন—কারণ এক্ষণে আর পূর্ব্বেকার মত লোকে শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না। বিশ্বাসের যুগ চলিয়া গিয়াছে—সন্দেহের যুগ সবলে পূরা তেজে চলিতেছে। দু' বৎসরের বালককে একটী গল্প বলো—সে বলিবে, এটা কি সত্যি? পরস্পর কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না। কেন এরূপ হইল জানিনা, বোধ হয় যুগধর্ম্মে এরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, যুক্তি ও তর্ক ভিন্ন কেহই কোন কথা বর্ত্তমানকালে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না—যতই কেন শাস্ত্রের দোহাই দাওনা। তবে অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানব জন্ম লাভ হয়, হিন্দুশাস্ত্রের এ কথা বিনা যুক্তিতে কেহই গ্রহণ করিবেন না। বিজ্ঞানশাস্ত্রের এত উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে যে "অভিব্যক্তিবাদ" "Theory of Evolution" এক্ষণে সকলেরই নিকট

অল্প-অধিক পরিচিত। "অভিব্যক্তিবাদ" জনসমাজে সুপ্রসিদ্ধ মৃত মহাত্মা ডারবিন (Darwin) কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হয়। অভিব্যক্তিবাদের যৌক্তিকতা ও সত্যতা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অভিব্যক্তিবাদ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, প্রাণপঙ্ক (protoplasm) হইতে কত লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভিতর দিয়া ক্রমোন্নতি হইয়া মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বিজ্ঞানের কথা—ইহা ডারবিনের মত। তবে অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথা, যাহা শাস্ত্রে আছে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আধুনিক বৈজ্ঞানিকদেরও তো সেই মত। এই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য কি? শতবর্ষকাল পুত্রকলত্রাদি লইয়া সুখে দুঃখে ন্যায় অন্যায় উপায়ে অল্প-বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়া বা কতক অর্থ সঞ্চিত করিয়া দেহ অবসান করাই কি এ জীবনের উদ্দেশ্য? কখনও তাহা এ দুর্লভ জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না—তবে কীট পতঙ্গ ও ইতর প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য জীবন কিসে শ্রেষ্ঠ, কিসে উন্নত? ইতর প্রাণীরাও তো সুখে দুঃখে নিজ নিজ উপায় ও কৌশলে, জীবন সংগ্রাম চালাইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে তাহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য কিসে? যদি জীবন সংগ্রাম চালানই উদ্দেশ্য হয়, তবে ক্রমোন্নতি হইল কেন? দয়া, পরদুঃখকাতরতা, প্রভৃতি যে সকল গুণ নিম্ন প্রাণীগণের মধ্যে অতি অল্পরূপে দৃষ্ট হয়; মনুষ্য জীবনে সেই সকল গুণের চরমোৎকর্ষ লক্ষিত হয়। সেই সকল সদ্‌গুণের যদি উপযুক্ত ব্যবহার না হইল তবে মনুষ্য জন্মলাভের সার্থকতা কোথায়?

যে অর্থের সদ্ব্যয় হইল না—সে অর্থ থাকা না থাকা তুল্য কথা। মনুষ্য সহজে ত নানা গুণের আকর। দয়া, ধর্ম্ম, স্বার্থত্যাগ, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি উচ্চবৃত্তি মনুষ্য মাত্রের হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে। এই সকল সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করিবার শক্তি সকলেরই আছে—এবং মানব-হৃদয়-কন্দরে নিহিত গুণাবলী অনুশীলনে উৎকর্ষ লাভ করে—সমুজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় মাত্র। হীরকাদি বহুমূল্য রত্নরাজি ভূগর্ভে যখন প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন তাহাদিগের সমুজ্জ্বলতা ও দীপ্তি আদৌ লক্ষিত হয় না, কিন্তু রত্নাকরের সযত্ন চেষ্টায় তাহারা কিরূপ উজ্জ্বলতা ধারণ করে তাহা সকলেই অবগত আছেন। মনুষ্যহৃদয় বসুন্ধরার ন্যায় অসীম ও তাহা নানাবিধ রত্নের আকর, কিন্তু কয়জন সেই নিহিত রত্নের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েন—আর কয়জনই বা সেই রত্ন উদ্ধার করিয়া উহা সমুজ্জ্বল করিবার প্রয়াস

পান। অনেকেই নিজ হৃদয়ে লুক্কাইত গুপ্তরত্নের বিষয় আদৌ অবগত নহেন, কেহ বা অবগত থাকিয়া কেবল আলস্য বশতঃ উহার অনুসন্ধান চেষ্টা করেন না। আত্ম-দৃষ্টি (Self-introspection) কয়জনের আছে ? "আমিকে" জানিবার আদৌ আমাদের স্পৃহা হয় না—"আমিকে" জানিতে পারিলে আর কিছুরই ভাবনা থাকে না। কোথায় "রত্ন" "ধন" এই লইয়া তো আমরা উন্মাদ, কিন্তু কস্তূরি-মৃগের ন্যায় আমরা নিজের হৃদয় নিহিত রত্নের সন্ধান না পাইয়া দিগদিগন্ত বৃথা অনিত্য রত্নের উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আত্মোন্নতি যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা আদৌ নাই, যে রত্ন সংগ্রহ করিলে আর দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না, যে রত্ন সংগ্রহ করিলে চিরদারিদ্র্য-রূপ সংসার জ্বালা এড়ান যায়, যে রত্ন লাভে মনুষ্য অমর ও মৃত্যু-বিজয়ী হয়—সেই রত্ন তুচ্ছ করিয়া বৃথা অনর্থের সন্ধানে এই মনুষ্যজন্ম নষ্ট করিতেছি—ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! যখন মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে, তখনই জানিতে হইবে যে, আমরা অনন্ত অক্ষয় অমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াছি, তবে যে সন্তান পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অসৎ সংসর্গে অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখ প্রাপ্তির আশায় নানারূপ অত্যাচারে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া সকলের আক্ষেপের স্থল হয়—তাহার বিষয় পৃথক। এই অমূল্য মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া অনন্ত রত্নের অধিকারী হইয়াছি, ইহা সম্যক ধারণা হইলে আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই, কারণ "রত্ন" আমার করতলগত জানিয়া অতি অল্প লোকেই তাহার অসদ্ব্যয় করিয়া থাকে, বিশেষতঃ যদ্যপি বুঝিতে পারে যে, এ রত্নের বিনিময়ে অমরত্ব লাভে সমর্থ হইব, তাহা হইলে সে রত্ন কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট ও অপব্যয় করে না। রত্নের অপব্যয় না হইলে এবং তাহার সদ্ব্যবহার হইলে তাহার সার্থকতা হয়। আমরা যে রত্নের অধিকারী তাহার উজ্জ্বলতার জন্য আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে অব্যবহারে উহা কলঙ্কিত না হয় তাহার প্রয়াস পাইতে হইবে, তাহা হইলে ঐ রত্ন ব্যবহারে উজ্জ্বলতর হইবে এবং উহার দীপ্তিতে ঘন অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া উন্নতির সোপান অনেকের দৃষ্টিপথে আনিয়া দিবে। সেই আলোকে আমরা জ্যোতির্ম্ময়ধামে অক্লেশে প্রবেশ লাভে সমর্থ হইব।

এ জীবনের তবে উদ্দেশ্য কি ? অনন্ত রত্নবিভূষিত হৃদয় লইয়া জগদীশ্বরের

চরণপ্রান্তে উপহার দেওয়া ভিন্ন আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে। মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মপন্থা অবলম্বনই উহার প্রধান সহায়। যদ্যপি তাঁহাকে এ জীবনে আপনার বলিয়া চিনিলাম না ও জানিলাম না তবে এ জীবনে কাজ কি? যদ্যপি তাঁহাকে প্রেমময়, দয়াময়, কৃপাসিন্ধু জানিয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত না হইলাম তবে বৃথা জীবনভার বহনের আবশ্যক কি? যদ্যপি অনিত্য সংসারের মায়া কাটাইয়া সেই পরমধন নিত্যবস্তু না পাইলাম তবে বৃথা মনুষ্য দেহ কেন ধারণ করিলাম? দারা পুত্রকে লইয়া যদ্যপি প্রেমময়— তাঁহাকে ভুলিলাম তবে মানব-জীবনে সার্থকতা কোথায়? তাঁহাকে জানিবার চিনিবার ও আপনার বলিয়া ধারণা করিবার শক্তি ও যুক্তি তিনি মনুষ্যকেই দিয়াছেন, আমি মনুষ্য হইয়া যদি সে শক্তি ও যুক্তির সদ্ব্যবহার না করিলাম তবে সেই শক্তির আধার—এই দেহ কেন গ্রহণ করিলাম? তাঁহার মহিমা দিগদিগন্তে গীত হইবে বলিয়া তিনি মনুষ্যকে গন্ধর্ব্বকণ্ঠ করিয়াছেন ও সঙ্গীত কলাবিদ্যার চরমোৎকর্ষ সাধনের যন্ত্রাবলী মনুষ্য কণ্ঠেই দিয়াছেন। তাঁহার উপাসনার উপযোগী করিয়া মনুষ্যের হস্তপদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহাকে ধারণা করিবার শক্তি মনুষ্য মস্তিষ্কে নিহিত রহিয়াছে, তাঁহার রূপ ভাবিবার শক্তি, তাঁহার প্রেমে অভিভূত হইবার শক্তি প্রেমপ্রাণ মনুষ্য হৃদয় ও মন ভিন্ন আর কোথায়? তাঁহার সহিত তন্ময় হইয়া, তাঁহাতে লীন হইয়া রসাস্বাদন করিবার জন্য যোগ-শক্তি মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জীবে সম্ভবে? তাঁহার প্রাণারাম, ভুবনমোহন, জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার শক্তি মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জীবে নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, মনুষ্য জীবনলাভ করিয়া যদি তাঁহার প্রদত্ত শক্তিরাজীর জীবনে বিকাশ করিবার কোন চেষ্টা না করিলাম তবে সে জীবনে প্রয়োজন কি? মনুষ্যজীবন ও পশুজীবনে পার্থক্য কোথায়? তাহাদিগের অর্থাৎ পশুদিগেরও হস্তপদ মুখ চক্ষু কর্ণ সব আছে, তদ্দারাও জীবনযাপনের ক্রিয়াবলী অক্লেশে নির্ব্বাহ হয় তবে মনুষ্যের হস্ত পদ ইত্যাদি পশুদিগের ন্যায় হইল না কেন? ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে। তাঁহাকে বুঝিবার জানিবার, তাঁহার সাধনা করিবার উপযোগী করিয়াই মানবের বাহ্যেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই বলি, মনুষ্য জীবনের কেবল একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহাকে—সেই পরমপুরুষকে লাভ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে এ জীবনে তাঁহাকে পাইবার যত্ন করে, তাঁহার গুণগান করে, তাঁহার গুণ-গাঁথায় কর্ণ-সুখ লাভ করে, তাঁহার আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করে, তাঁহার

সাধনা ভিন্ন যাহার অন্য দ্বিতীয় কর্ম্ম নাই, সেই নরকুলে ধন্য, তাহারই জীবন সার্থক হয়, সেই যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য। শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "মানুষ কিনা মানহুঁষ"। "হুঁষ" যাহার নাই, যে মায়াঘোরে চির নিদ্রিত, কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ ও বদ্ধ ও তাহাতে অচেতন—সে মানুষ নহে। যাহার "হুঁষ" আছে, যিনি চৈতন্য বস্তু লাভে ব্যগ্র, যিনি চৈতন্য বস্তু ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ এবং যিনি কামিনী-কাঞ্চন মদে বেহুঁস বা অচেতন নহেন, তিনিই মানুষ। কিন্তু আমরা মানুষ হইয়া মানুষের কর্ত্তব্য করিতেছি কৈ? ভাই, যাহাতে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য করিতে পারি, তাঁহাকে জানিতে চিনিতে পারি, আইস তাহার জন্য তাঁহার নিকট ভক্তিভবে যুক্তকরে প্রার্থনা করি, কাতর প্রার্থনা তিনি শুনিবেনই—কারণ তিনি আমাদিগের পরমাত্মীয় দয়ালঠাকুর, আমাদিগের জন্যই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। তিনিই তো আমাদিগকে "বকল্মা" দিতে বলিয়া গিয়াছেন। এসো, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে "বকল্মা" দিয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা করি।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী বসু, বি, এল্।

রামকৃষ্ণ-সংগীত।

(সেবক নিবারণচন্দ্র দত্ত রচিত।)

(২৪)

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ পাহি মাং।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রক্ষ মাং॥
পড়েছি বিষম মায়ার ফেরে, রয়েছি মত্ত মোহের ঘোরে,
এ দুস্তর ভব পারাবারে রামকৃষ্ণ ত্রাহি মাং॥
দূরে যাক্ বিষয়ানুরক্তি, তোমার ধ্যানে হউক শক্তি,
তব শ্রীচরণে প্রীতি ভক্তি রামকৃষ্ণ দেহি মাং॥
পরাণ সঁপেছি ও রাঙ্গা পায়, পারের ভার তোমার দায়,
নাহি আমার অন্যোপায়, হে রামকৃষ্ণ গুণধাম॥

(২৫)

রামকৃষ্ণ পদে মন রাখ অনুক্ষণ।
দূরে যাবে সব জ্বালা, জুড়াবে জীবন॥
শ্রীচরণ সুধাহ্রদে, ডুব দেরে মন সাধে,

ডুবিলে তোমার হবে সুধাময় জীবন,
পাবি তাহে যে রতন,
তার কাছে মোক্ষরতন—
অতি তুচ্ছ অপদার্থ হইবে তখন ॥

(২৬)

ফুলমালা প'রে, ফুলসাজে সেজে, বাজে হের প্রাণ-মন চোর।
ও চাঁদ অধরে, প্রেম সুধা ঝরে, কর পান মম চিত-চকোর ॥
পরাণ ভরিয়ে করি সুধাপান, গাও সুধাময় রামকৃষ্ণ নাম,
ভবক্ষুধা যাবে, পিয়াস মিটিবে, টুটিবে তোমার করম-ডোর ॥

(২৭)

হৃদি-নিকুঞ্জে প্রেমমঞ্চে বিহর,
হেরি পরাণ ভরি, করি জীবন সফল।
আছি নাথ আশার আশে, তোমার মুখ চাহিয়া,
দীনের আর কি আছে সম্বল বল ॥
তব অনুরাগে কর অনুরাগী, হে প্রেমিক-যোগী—
কর প্রাণ মন বিমল ॥
ভাবিতে তোমার ভাব, উথলি উঠুক ভাব,
দূর হোক সব অভাব, লভিয়ে কৃপা শান্তিজল ॥

(২৮)

(যাঁরে) ভাবিলে ভাব-সিন্ধু উথলে,
পায় ত্রাণ ভব-সিন্ধু সলিলে,
ভাবেন যাঁরে চন্দ্রভালে,
ভাব সে পুরুষ-সুন্দরে।
বদন ভরিয়ে খুলিয়ে প্রাণ,
গাও সেই হরিনাম সুতান,
নেহার নয়নে বাঁকা সে ঠাম,
প্রেমাধার জন-বন্ধুরে।
মগন প্রাণে ধীরে জাগায়,
নামের মৃদু মধুর বায়,
মোহ আঁধার দূরে পলায়—
জ্ঞানারুণোদয় হেরে ;—
ত্যজিয়ে ভবের বৃথা বিবাদ,
গাও রে নাম মিটায়ে সাধ,
এসরে পূজি শ্যামচাঁদ—
ভকতি পূরিত অন্তরে ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণভরসা

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

২৩৩। কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে আদি কাণ্ড। রজোগুণ থেকেই কর্ম্মের উৎপত্তি। রজোগুণে ক্রমশঃ কাজের আড়ম্বর বেড়ে যায়, তাই রজোগুণ থেকে ক্রমে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, আর কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে। সত্ত্ব-গুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

২৩৪। কর্ম্ম ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে, তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা—কিনা কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করবে না। যেমন পূজা জপ তপ করছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়, কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়।

২৩৫। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নামই কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি, অনাসক্ত হয়ে কাজ করছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব করলুম, কি অনেক গরীব কাঙ্গালদের সেবা করলুম,

মনে করলুম যে, অনাসক্ত হয়ে করেছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছে হয়েছে, জানতে দেয় না।

২৩৬। যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে কেবল তাঁরই একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব।

২৩৭। কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে করতে পারি। আর যেন বেশী কর্ম্ম জড়াতে ইচ্ছা না হয়।'

২৩৮। কর্ম্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা করছি, আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম্ম।

২৩৯। ভক্তি লাভ করলে বিষয় কর্ম্ম আপনাআপনি কমে যায়, আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

২৪০। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্ম—জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়—উদ্দেশ্য নয়।

২৪১। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয় তিনিই কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা।

২৪২। সাধন করতে করতে আরও এগিয়ে পড়। শেষে জানতে পারবে যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

২৪৩। একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। হটাৎ একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হলো। ব্রহ্মচারী তাকে বল্লেন 'ওহে, এগিয়ে পড়ো, এগিয়ে পড়ো।' ব্রহ্মচারীর কথামত কাঠুরে একদিন এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। সে গাড়ী গাড়ী কেটে এনে বাজারে বিক্রয় করতে লাগলো, আর বড় মানুষ হয়ে গেল। কিছুদিন পরে আবার এগিয়ে দেখে যে, নদীর ধারে রূপোর খনি। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে বিক্রয় করতে লাগলো। এত টাকা হলো যে, আণ্ডিল হয়ে গেল। তারপর আরও এগিয়ে নদী পার হয়ে দেখে সোণার খনি। ক্রমে হীরে মাণিক পর্য্যন্ত পেয়ে গেল। তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হোলো। তাই বলছি যে, যা কিছু করনা কেন, এগিয়ে গেলে আরও ভাল জিনিস পাবে। একটু জপ তপ করে উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরোনা, যা হবার তা হয়ে গেছে। আরো এগোও, আরো এগোও। আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে, ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্ত্তা হবে।

২৪৪। ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও। ডুবে যাও। এ সমুদ্রে ডুব দিলে মরবার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড হয় না। যারা অজ্ঞান, তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই। ঈশ্বর প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে?

২৪৫। 'আমার জিনিস' 'আমার জিনিস' করে কোন জিনিসকে ভাল-বাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। সকলের প্রতি ভাল-বাসা দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ, এঁরা দয়া রেখেছিলেন।

২৪৬। সংসার করতে দোষ কি? তবে সংসারে দাসীর মত থাক। দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে 'আমাদের বাড়ী।' কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়ত কোন্ পাড়াগাঁয়ে। মনিবের ছেলেকে মানুষ করে আর বলে 'হরি আমার বড় দুষ্টু হয়েছে'। 'আমার হরি' মুখে বলে বটে, কিন্তু মনে জানে হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

২৪৭। সংসার করনা কেন, তাতে দোষ নাই, তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর। জেনো যে, বাড়ী ঘর পরিবার আমার নয়, এ সব ঈশ্বরের, আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে, আর তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে।

২৪৮। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্শ্চার।

২৪৯। হাজার বলো, বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চারধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতোই থাকে।

২৫০। ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল, কর্ম্ম—ফুল।

২৫১। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং—ট-অ-ম্। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্ম ত্যাগ হয়।

২৫২। যে পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য নাই, সে পণ্ডিতই নয়।

২৫৩। যদি আদেশ হয়ে থাকে, তা হলে লোক শিক্ষা দিতে দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

২৫৪। বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটী কিরণ আসে, তাহলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

২৫৫। প্রদীপ জ্বাললে বাদ্‌লে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে, ডাকতে হয় না। তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাকতে হয় না। তাঁর নিজের এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে। কত বড় বড় লোক, খাবার, টাকা কড়ি, শাল দোশালা এনে তাঁকে নেবার জন্য খোসামোদ করে।

২৫৬। চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বলতে হয় না, লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।

২৫৭। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না। তাঁর যদি একবার কটাক্ষ হয়, তাহলে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে?

২৫৮। ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়, তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোকশিক্ষা দিতে থাকেন, মা, তার পিছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন, সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

২৫৯। চাপরাস্ থাকলে তবে লোকে মানবে। ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোক শিক্ষা হয় না। যে লোকশিক্ষা দেবে, তাঁর খুব শক্তি চাই।

২৬০। অমৃতসাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে হউক, এ সাগরে পড়তে পারলেই হল। মনে কর, অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়ো, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন করলেই তুমি অমর হবে।

২৬১। মোটামুটি যোগ তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ আর ভক্তিযোগ।

২৬২। এ যুগে জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তারপর আবার দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে—আমি সেই ব্রহ্ম।

আমি শরীর নই,—আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ এ সকলের পার।

২৬৩। যদি রোগ শোক সুখ দুঃখ এসব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দব্ দব্ করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে, অথচ বলছে—কৈ হাত ত কাটে নাই, আমার কি হয়েছে?

২৬৪। এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন।

২৬৫। ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার মানে এ নয় যে, ভক্ত এক জায়গা। যাবে, জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে—যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরে যান, তাহলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

২৬৬। ভক্ত ঈশ্বরের সাকাররূপ দেখতে চায়, ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তি দেন, জ্ঞানও দেন।

২৬৭। কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে, তা হলে গড়ের মাঠ, সুসাইটী সবই দেখতে পায়। এখন কলকাতায় কেমন করে আসি!

২৬৮। জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। ভাব সমাধিতে রূপ দর্শন হয়, আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়।

২৬৯। ভক্ত বলে—'মা সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়, তাহাতে কামনা আছে, করলেই ফল পেতে হবে। আর কর্ম্ম করতে গেলেই তোমায় ভুলে যাবো। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন তোমায় না পাচ্ছি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম্ম থাকবে, সেটুকু কর্ম্ম যেন অনাসক্ত হয়ে করতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ করবে, তখন তোমার কর্ম্ম করবো, নচেৎ নয়।'

২৭০। যদি এখানে বসে ভক্তিলাভ করতে পার, তা হলে তীর্থে যাবার কি দরকার? তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হলো, তাহলে তীর্থ যাওয়ার ফল হলো না। ভক্তিই সার আর তাহাই একমাত্র প্রয়োজন।

২৭১। চিল-শকুনি অনেক উঁচুতে উঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে। সেই প্রকার অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়, আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম করতে বলেছে, আমরা অনেক করেছি। এদিকে তাদের মন ভাগাড়ে অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে। ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা কড়ি মান সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এই সব নিয়ে ব্যস্ত।

(ক্রমশঃ)

পাওহারী বাবা।

(পূর্ব্ব বর্ষের ২০৯ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাওয়ারী বাবা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, রাত্রে কেহ আশ্রমে থাকিতে পাইবেক না। তিনিও সমস্ত দিনের মধ্যে আর বাহিবে আসিতেন না। তাঁহার সেবক ভক্তগণ আর তাঁহার সহিত দেখা করিতেও যাইতে পারিতেন না। তাঁহাকে যাহার যাহা দিবার সাধ হইত, তিনি তাহা কুটীরস্থ সম্মুখের দালানে রাখিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন। প্রত্যেক জিনিসের উপর একটী 'রাম' নাম লিখিয়া দিতে হইত, নতুবা তিনি তাহা স্পর্শ করিতেন না। গভীর নিশিতে তিনি একবার গঙ্গাস্নান করিতে বাহিরে আসিতেন এবং সেই সময়ে যে যাহা রাখিয়া যাইত, তাহা ইচ্ছা ও আবশ্যক মত লইতেন। তিনি বৎসরান্তে রথের সময়ে যখন রথ টানা হইত, সেই সময়ে একবার বাহিরে আসিয়া কিয়দ্দূরে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেন, অবশেষে তাহাও বন্ধ করিয়া দেন; তখন কেবল রথের সময়ে বাহির হইয়া কুটীরের দ্বারে বসিয়া রথ দেখিতেন।

এই সময়ে তিনি পুনরায় একবার প্রয়াগের মাঘ মেলায় স্নানার্থ গমন করেন। যে কয়দিন তথায় ছিলেন, একটী কুটীর বাঁধিয়া দিবসকাল তন্মধ্যে কাটাইতেন এবং সায়াহ্নে নির্জ্জনে কোথায় যে চলিয়া যাইতেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। প্রভাতে আবার কুটীরে ফিরিয়া আসিতেন। বহুদিন হইতে সূর্য্যালোকবিহীন ও নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিতি হেতু তাঁহার দেহ পুষ্পের ন্যায় কোমল ও তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। প্রয়াগে গঙ্গাতট পর্ণকুটীরে কিছু দিবস থাকায় প্রখর সূর্য্যকিরণের উত্তাপে এবং তীব্র হিম-বায়ু স্পর্শে

তাঁহার দেহের চর্ম্ম উঠিয়া যাইতে লাগিল, সর্দ্দি কাশি বুকে বসিয়া স্বরভঙ্গ হইয়া গেল, এবং প্রতিদিন জ্বর হইতে লাগিল, সর্ব্বশরীর রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার আশ্রম-পার্শ্ব-নিবাসী কতকগুলি পরিচিত দীন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ঔষধ খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম পাওহারী বাবা তাঁহাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাদের আগ্রহের জোরে তিনি ঔষধ লইতে স্বীকার করেন। তখন তাঁহারা অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে একটী পাচন প্রস্তুত করিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিলেন। তিনি তাহা পাইয়া বলিলেন, আপনারা কি দাসকে কেবলমাত্র ঔষধই দিবেন? পথ্য দিবেন না? যিনি কেবলমাত্র একটু দুগ্ধ ও বিল্বপত্র বাটা ব্যতীত আর কিছুই সেবন করেন না, তিনি পথ্য খাইতে চাওয়ায় ব্রাহ্মণেরা অতীব প্রীতচিত্তে তাঁহার জন্য পেড়া ও বরফী ক্রয় করিয়া আনিয়া দিলেন। সন্ধ্যাকালে পাওহারী বাবা ঐ ঔষধি এবং পথ্য সঙ্গে করিয়া লইয়া আশ্রমের বাহির হইলেন এবং এক নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া সেইগুলি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত গতিতে অপর দিকে চলিয়া যাইলেন। ব্রাহ্মণগণ এ ঘটনা জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি কেন এ সমস্ত স্বীকার করিয়া অবশেষে নষ্ট করিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তরে কহিলেন যে, 'বাবা সকল! এ দাসের কোনও অপরাধ নাই, আপনারা ঔষধ ও পথ্য রোগের জন্য দিয়াছিলেন, তাহা আমি রোগকে অর্পণ করিয়াছি, দেখুন—এ দাসের আর কোনও রোগ নাই।' বাস্তবিকই পাওহারী বাবা নির্ব্যাধি হইয়াছিলেন, তাঁহার দেহে আর কোনও রোগ-লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইল না। ব্রাহ্মণেরা বিস্মিত হইয়া গেলেন।

স্নানান্তে তিনি স্বীয় জন্মভূমি প্রেমাপুরে গমন করেন। তথায় পিতৃগৃহে প্রবেশ না করিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে একটী উদ্যানে অবস্থিতি করেন। জননীকে সংবাদ দিয়া স্বীয় আশ্রমে যাইয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, বাবা একদিনেই গাজীপুরে চলিয়া আসেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাওহারী বাবার জ্যেষ্ঠতাত যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই আশ্রমে অতি কৈশোরকালেই পাওহারী বাবা আসিয়া প্রবেশ করেন। সেই

কাল হইতেই তিনি সাধু সন্ন্যাসী অতিথি অভ্যাগতের সেবাপরায়ণ হইয়াছিলেন। লছমীনারায়ণের সময়ে ভাগিরথীর পূর্ব্ব পারবর্ত্তী লোকেরা প্রত্যেক লাঙ্গলে পাঁচসের করিয়া শস্য অগ্রহায়ণের প্রথমে এবং চৈত্র মাসের শেষে আশ্রমে ব্যয় নির্ব্বাহ হেতু দিয়া যাইত এবং গ্রাম্য জমিদারেরা অর্থ সাহায্যও করিতেন। কিন্তু সেই সময়ে সদাব্রত ছিল না। লছমীনারায়ণ বৎসরান্তে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, সেই সময়ে ৫।৭ শত লোককে ভোজন করান হইত।

লছমীনারায়ণের পরলোক গমনের পর আশ্রমের সম্মুখস্থ গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায় আশ্রমের সম্মুখে অনেক জমি বাহির হইয়া পড়ে, পাওহারী বাবা সেই জমিতে চাষ করিবার ব্যবস্থা করায় বহু শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। রাজকর প্রদানের পর যে শস্য অবশিষ্ট থাকিত তাহাতে সাধু ও অতিথিগণের সেবা হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। পাওহারী বাবার আজ্ঞা ছিল যে, যে কেহ আশ্রমে আসিবে যেন অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া না যায়। এই সদাব্রতের ভার নন্দকুমার নামে একটী লোক নির্ব্বাহ করিতেন। তৎপরে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পাওহারী বাবার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গঙ্গা তেওয়ারী এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, ইনি এখনও উক্ত আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন।

আশ্রমে নানাবিধ প্রকৃতির লোক আগমন করিয়া থাকে। একবার একজন উন্মাদ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া অতিথি হয়, সেই সময়ে পাওহারী বাবা কয়েকজন লোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, উন্মাদ আসিয়া বাবাকে গালি দিতে লাগিল এবং একটী কাষ্ঠখণ্ড লইয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য ধাবিত হইল। উপস্থিত সকলে উন্মাদকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইলে পাওহারী বাবা তাহা নিষেধ করিয়া তাহাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলিলেন। তিনি অনেকক্ষণ তাহার চক্ষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন, তখন সেই ব্যক্তি শান্তভাব ধারণ করিল। পাওহারী বাবা কহিলেন, ইনি উন্মাদ নহেন, সাধু ব্যক্তি। সেই দিন হইতে উক্ত ব্যক্তির উন্মত্ততা দূর হইয়াছে। অদ্যাপি এই লোক জীবিত আছে এবং মধ্যে মধ্যে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া থাকে।

পাওহারী বাবার দীক্ষা-গুরু অযোধ্যায় থাকিতেন। তাঁহার আশ্রমের একটী সামান্য লোক সন্ন্যাসীর ভেকধারণ করিয়া বাবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুদিন এই আশ্রমে অবস্থিতি করেন। আসিয়া অবধি ইনি অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন অহিফেন এবং প্রচুর

মিষ্টান্ন তাঁহার জন্য সংগৃহীত করিতে হইত, নতুবা তিনি রাগিয়াই অস্থির হইতেন। একদিন সন্ন্যাসী, পাওহারী বাবাকে জানাইলেন যে, তিনি চারিধাম ভ্রমণ করিতে যাইবেন, তজ্জন্য তাঁহার অর্থের আবশ্যক। পাওহারী বাবার আদেশানুসারে গ্রামে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল কিন্তু সে সময়ে কিছু সংগ্রহ হইল না, কেবল একখানি কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসী অর্থ লাভ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং এক দিন নির্জ্জন পাইয়া পাওহারী বাবাকে কহিলেন যে, যখন তোমাকে এত লোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে এবং এই আশ্রমের ব্যয়ভার যখন নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তোমার নিকট বহু অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা হইতে আমাকে কিছু টাকা দাও। পাওহারী বাবা কহিলেন, দাসের কোনও সম্বল সম্পত্তি সঞ্চিত নাই, থাকিলে এখনি আপনাকে অর্থ প্রদান করিতাম। সন্ন্যাসীর উক্ত কথায় প্রত্যয় জন্মিল না। তিনি কহিলেন, যদি তোমার অর্থ নাই তবে তোমার ঠাকুরের অঙ্গে অলঙ্কার কোথা হইতে আসিল? বাবা কহিলেন, যদ্যপি আপনি ইচ্ছা করেন, উক্ত অলঙ্কার লইতে পারেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর সামান্য মূল্যের অলঙ্কার গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মিল না। তিনি বাবাকে কহিলেন, যদি তোমার অর্থ সম্পত্তি নাই তবে কেন বৃথা এ আশ্রমে বাস করিতেছ? তখন পাওহারী বাবা কহিলেন যে, তবে এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়? সন্ন্যাসী কহিলেন, অর্থ-সম্পত্তি হীনের এ সমস্ত প্রয়োজন কি? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।

পরদিন প্রত্যুষে সকলে আশ্রমে আসিয়া দেখিল যে, কুটীরের দ্বারে তালা রুদ্ধ এবং তাহারই নিকটে চাবি পড়িয়া রহিয়াছে। সকলেই মনে করিল যে, আমাদেরই কোনও অপরাধে বাবা এ আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়া গেলেন। কয়েক জন উক্ত সন্ন্যাসীর প্রতি সন্দেহ করিলেন, হয়ত ইনিই বাবাকে কোনও প্রকারে বিরক্ত করিয়াছেন। লোকের মনে এইরূপ ভাব দেখিয়াই সন্ন্যাসী উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

যাঁহারা পাওহারী বাবার সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কেহই কোন প্রকার সন্ধান পাইলেন না। তিনি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া ৺জগন্নাথক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে পীড়িত হওয়ায় মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুর

গ্রামে তাঁহাকে, অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। এইখানে একটী সহৃদয় ভদ্র বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাবাজীর থাকার জন্য নদীকূলে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পাওহারী বাবা এখানে থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া "চৈতন্য চরিতামৃত" ও অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। প্রায় এক বৎসর কাল বহু অনুসন্ধানের পর আজিমগড়ের পণ্ডিত রামাচারীজী ব্রহ্মপুরে গিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আশ্রমে লইয়া আসেন।

(ক্রমশঃ)

অভিশাপ।

শীর্ণা স্রোতস্বতী তীরে ছিল
কুসুমিত যেই কুঞ্জবন,
না জানি কাহার শাপে, জ্বলিল ভীষণ তাপে,
ফুটিল না ফুল আর তরু সুশোভন!

না দুলিল সহকার বুকে,
বায়ু-ভরে মাধবী-বল্লরী,
তরুলতা সুশোভিত, বুকে বুকে বিজড়িত,
নাহি সে মালঞ্চে শোভা মনোমুগ্ধকরী!

দাবদগ্ধ যেন তরুলতা,
সে মালঞ্চে নাহি চারু শোভা,
ছিন্ন ভিন্ন চারিধার; ধূলি কুটি তৃণ সার,
রবি শশী ভয়ে বুঝি লুকায়েছে আভা!

প্রভাতে না গাহে পাখী গান,
ভয়ে রুদ্ধ সুস্বর-লহরী,
কে তোষিবে মধুকরে, আকুলি ব্যাকুলি ফিরে,
মালিনী মালঞ্চ হেরি' উঠিছে শিহরি!

গেলনাত যুগ-যুগান্তর,
হ'ল তবে শাপ অবসান,
বসন্ত পূর্ণিমা রাতি,　　উজ্জল সুধাংশু ভাতি,
মালঞ্চের অন্ধকার হ'ল তিরোধান।

চন্দ্রকর উদ্ভাসিত নদী,
চন্দ্রকরে তরঙ্গ উজ্জল,
অগাধ সলিল রাশি,　　সফেন তরঙ্গে ভাসি,
উপজিল রাজপুত্র, কি রূপ নির্ম্মল।

কি প্রশান্ত বদন তাহার,
চারুমুখে কি হাসি সুধার,
সুবর্ণ মরাল প্রায়,　　তরঙ্গে ভাসিয়া যায়,
মালঞ্চে লাগিল যবে—বিস্ময় অপার।—

মৃত প্রাণে সঞ্জীবনী সুধা,
জিয়াইল মৃত তরুলতা,
মালঞ্চে ধরেনা ফুল,　　গুঞ্জরিছে অলিকুল,
আনন্দে গাহিছে পাখী, ভুলি পূর্ব্ব কথা!

জীবন-মধ্যাহ্নে আজি হায়,
মনে আসে শৈশবের স্মৃতি,
সমাপ্ত হইলে খেলা,　　কতদিন সন্ধ্যাবেলা,
'মালঞ্চ'-কাহিনী শুনি লভিয়াছি প্রীতি।

স্বপনেতে কত নিশি হেরি
সে মালঞ্চ মরুভূমি প্রায়,
কাঁপিয়া উঠিত বুক,　　শুকাইয়া যেত মুখ,
'রাজপুত্র' আসি তবে জুড়াত তাহায়!

জাগ্রত-স্বপনে আজি হায়,
সে মালঞ্চ এ হৃদয়ে হেরি,
ছিন্নলতা শুষ্কফুল, জীবনে বিষম ভুল,
তৃষ্ণায় কাঁদিছে প্রাণ কোথা স্নিগ্ধবারি!

মন্দ-ভাগা হায নাথ! আমি,
এ হৃদয় আজি মরুপ্রায়!
নাহি পুণ্য ভালবাসা, ভক্তি প্রীতি সুখ-আশা,
নিরাশার বায়ু শুধু করে হায় হায়!

ভাল মন্দ নাহি বুঝি কিছু,
খরস্রোতে ভাসি ছিন্ন ফুল,
এ মালঞ্চে হের নাথ। হইয়াছে বজ্রপাত,
বল' দেব। এ জীবনে পাবনা কি কুল!

কত জন্ম চলে গেল নাথ!
আসিবেনা সে মুহূর্ত্ত হেথা?
নিতান্ত কি হে দেবতা, জন্ম শুধু নিস্ফলতা,
বাসনা জড়িত জীব, নাহি তৃপ্তি কোথা?

কত মাস, বর্ষ হ'ল শেষ,
মৃত্যুভয়ে কাঁপিছে জীবন,
নিদারুণ অভিশাপ, আজীবন মনস্তাপ,
যাচে দীন, কিসে হবে এ শাপ মোচন!

বরিষ' করুণা তব নাথ!
এ মালঞ্চে কর অধিষ্ঠান,
মুছে দাও অশ্রুধার, কর দূর হাহাকার;
অভিশপ্ত জীবনের হোক্ অবসান!

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

পাগলের খেয়াল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৫ পৃষ্ঠার পর)

ধন্য মন, ভগবান জিনিসটা কি তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে! তোমার একটা ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহাব নামে অপার ক্লেশ অপনোদন হয়। তুমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলে—তাঁহার নাম বিশেষে বল পাইয়াই তোমার বাল্যসংস্কারের ভগবানের আখ্যাসমূহের ন্যায় এই নূতন রামকৃষ্ণ আখ্যাটীও তোমাতে নূতন সংস্কারাবদ্ধ হইল। কিন্তু সংসারের তাড়নায় সদা সর্ব্বদা আহত হইয়া তুমি এত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিলে যে সাহস করিয়া তোমার পরমাত্মীয়েরও নিকটে এই নূতন রামকৃষ্ণ নাম যে, ভগবানেরই এক নাম বিশেষ, ইহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিলে, এখন কিন্তু তোমার ততটা লজ্জা নাই।

এদিকে তোমার পারিষদবর্গরা তোমায় কত উত্তেজিত করিল, তাহারা তোমায় বলিল, বাল্যাবধি পিতা পিতামহের আমল হইতে যে রাম, কৃষ্ণ, হরি, দুর্গা, কালী প্রভৃতি শুনিয়া আসিতেছ, তাহা সব গেল—এখন একটা নূতন হুজুক পাইয়া বসিয়াছ। তোমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা শুনিয়া কি বলিবে? তোমায় কেবলমাত্র গঞ্জনার ভাগী হইতে হইবে। লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে না, ও সব ঢং ছেড়ে দাও, তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই কর। ইহসমাজে প্রতিপত্তি পাইবে ও পরলোকের কার্য্য হইবে। একটী ইন্দ্রসদৃশ হইয়া উর্ব্বশী মেনকা প্রভৃতি লইয়া স্বর্গে অনন্তকাল বিহার করিতে পারিবে। কথায় বলে স্বর্গসুখ—তাহাই তোমার ভাগ্যে ঘটিবে।

মন, কিন্তু তোমায় এবার কেহই টলাইতে পারিল না। তুমি বলিলে পাগলামিটা ভাল করিয়া না যাচাইয়া আর ছাড়িব না—অনেক লাঞ্ছনা পাইয়াছি। যখন এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশ বিদেশে রামকৃষ্ণ নামে পৃথিবী ছাইয়া পড়িয়াছে, এমন কি সুদূরবর্ত্তী মহাসমুদ্র পার ইংলণ্ডের মহাপণ্ডিত ম্যাক্সমুলার সাহেবও যাঁহাকে ভারতবর্ষের এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, আমেরিকাবাসী যাঁহার নামে মাতিয়া গিয়াছে ও নূতন ধর্ম্মালোক প্রাপ্ত হইয়া তাহার উৎকর্ষতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন একটা যে কিছু ইহার মধ্যে আছে, তাহা পর্য্যালোচনা করার আবশ্যক। শুধু কথার কথায় ভাসিয়া গেলে চলিবে না। ধৈর্য্য ধরিয়া একাগ্রতা সহ-

কারে সাধন করাও আবশ্যক অর্থাৎ খুব নির্জ্জনে তোমার পারিষদগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে স্থিরচিত্তে বিচার করিতে হইবে। তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী সকল বিচার ও হৃদয়ঙ্গম করার এখন একান্ত আবশ্যক।

মন, তুমি অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে; তুমি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলে। যাঁহাকে ধার্ম্মিক ও সৎলোক বলিয়া শুনিতে পাইলে তাঁহারই নিকট গিয়া তোমার প্রাণের ব্যথা জুড়াইবার চেষ্টা করিলে। তুমি পাঁচজনার নিকট এইরূপে যাতায়াত করিয়া কিছুকাল কাটাইলে; কিন্তু তোমার প্রাণের মতন কথা কাহারও নিকট পাইলে না, অর্থাৎ তুমি শান্তি লাভ করিতে পারিলে না। এমন সময় কে যেন তোমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বলিল—ভয় কি, আমি আছি—আমাকে দেখিবার চেষ্টা কর,—আন্তরিক অনুরাগ সহকারে চেষ্টার দরকার। যে জগৎ তোমার স্থূলচক্ষে পরিদৃশ্যমান হইতেছে, উহাই আমার রূপ বিশেষ; আমাকে আমমোক্তারি বা বকলমা দাও, এখনিই তোমার আশা পরিপূর্ণ হইবে। যে অশান্তি তোমাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমার প্রভাবে দূরে পলাইবে ও আমার যে আনন্দরূপ মূর্ত্তি তাহা দেখিতে পাইবে। আর তোমায় কেহ স্পর্শও করিতে পারিবে না, আমার লীলা তোমার দিব্যচক্ষুতে দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বে যে সমস্ত রূপে জীবকে শিক্ষাবিধান ও জগতের কষ্ট আমি ভোগ করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছি, এখন সে দেশ নয়, সে কাল নয়, সে পাত্রও তোমরা নও। এখানকার উপযোগী তোমাদের হিতের নিমিত্ত, তোমাদের শুভ বিধান করিতে রামকৃষ্ণ আখ্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলাম। আমাকে আদর্শ কর ও আমার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য কর, এখনই চিরশান্তি পাইবে। মন, তুমি এই সব কথা দৈব-প্রেরিত বোধ করিয়া মাতিয়া উঠিলে—আরো বলীয়ান হইলে এবং ক্রমে কে যেন জগতের রহস্য যতটুকু তোমার জানার উপযোগী, তোমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

মন, তোমার বাল্যসংস্কারাবদ্ধ ভাব লইয়া শাস্ত্রাদি সকল অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলে—তুমি দেখিলে তোমার যতটুকু আধার ও যে ছাঁচে পড়িয়া যে অবস্থায় এখন উপনীত হইয়াছ, তাহাতে একটী শাস্ত্রও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারপূর্ব্বক ভগবানকে লাভ বা ধারণা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অর্থাৎ একটী শাস্ত্র অনুশীলনপূর্ব্বক আয়ত্ত করিতে গেলে সমুদায় জীবনেও তাহার ইয়ত্তা হয় না। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার আংশিক জ্ঞানলাভ হইতে পারে বটে।

যাহা হউক, মন, এটা তোমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভগবানের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বা ভাব গ্রহণ করিয়া তখনকার অভাব মোচন দ্বারা জীবের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যীশুখৃষ্টের জীবনী গ্রহণ করা হউক। তিনি যে সময়ে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে সে স্থানের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়াছিল যে, মনুষ্যেরা নিজের স্বার্থ ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ব্যতীত অপর কিছুই জানিত না, মোট কথা, মনুষ্য পশু ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যখন লীলা করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমশঃ দু একজন লোক তাঁহার শক্তিতে মুগ্ধ হইতে লাগিল, তখন এখনকার মতন বিজ্ঞানালোকে আলোকিত জীব ছিল না। তিনি দয়া প্রকাশ করিয়া যে যে সময়ে যে যে বিভূতি দেখানর দরকার, সেই সেই সময়ে সেইরূপ শক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রথমে মনুষ্যের মনকে পশুভাব হইতে মনুষ্যভাবে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। কখন জলকে মদ্য করিলেন, কখন অন্ধের চক্ষে হস্ত স্পর্শ দ্বারা তাহার দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিলেন, অবশেষে তাঁহার ভক্তগণের ও ভাবী শরণাগত জনের পাপ নিজে ভোগ করিয়া ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই পশুভাবের সময়ে সকলে এক অপূর্ব্ব দয়া ও ক্ষমা ভাব অবলোকন করিয়া মোহিত হইতে লাগিল। অগ্রে তাঁহার ১৪ জন প্রিয় ভক্ত ব্যতীত তাঁহাকে ভগবান বলিয়া কে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল? পরে তাঁহার উপদেশ যখন প্রচার হইতে আরম্ভ হইল, পশুভাবাপন্ন লোক সমুদায় তাঁহার আলোক ও শক্তি পাইয়া ক্রমে ক্রমে মনুষ্য ভাবে আসিতে আরম্ভ করিল। এইক্ষণ সেই প্রদেশের মনুষ্যেরা সেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করতঃ বিজ্ঞানালোকে জগৎকে পরিপূরিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছেন। সেইরূপ আমাদের রামাবতারে কৃষ্ণাবতারে বুদ্ধাবতারে গৌরাঙ্গাবতারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও ব্যবস্থায় ধর্ম্মের স্থাপন করিয়া কুপথাবলম্বী জীবগণকে সুপথে আনয়ন করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

মন, এখন বোধ হয় তোমার এই ধারণা হইতেছে যে, ভগবান যে যে রূপে যে যে সময়ে অধিষ্ঠান হইয়াছেন ও জীবের কল্যাণ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেই সেই রূপকে এক এক অবতার শব্দে শাস্ত্রে কথিত আছে মাত্র; এবং বাল্যকালাবধি আমাদের গুরুজনবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের নিকট শ্রবণ করিয়াই বাল্যসংস্কার বশতঃ ভগবান যে সকলের শ্রেষ্ঠ ইহাই বদ্ধমূল আছে মাত্র, ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন মন, তোমার বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। শাস্ত্রাদিতে তাঁহাকে জানিবার বা লাভ করিবার যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তৎ সমুদায় প্রতিপালনপূর্ব্বক ভগবান লাভ করা তোমার পক্ষে অসাধ্য বোধ হইতেছে; তুমি হতাশ হইতেছ। পুরাকালের সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী মুনি ঋষিগণ যে যোগাদি সাধনাঙ্গে চিন্ময়ী শক্তিরূপিণী আদ্যাশক্তির করুণায় ব্রহ্মে লীন হইতেন, তাহা এখন আমাদের ন্যায় সংসারী জীবের পক্ষে ঠাকুরমার রূপকথা ব্যতিরেকে আর কিছুই বোধ হয় না। মন। ভাবিয়া দেখ, এখন কি সেই কাল? শাস্ত্রে জানা যায়, তখন ২১ হাত, ১৪ হাত, ৭ হাত পরিমাণ মানবাকার ছিল, সেই অনুসারে জীবনের আয়ুসংখ্যাও বৃদ্ধি ছিল এবং সেই পরিমাণে তাঁহাদের মস্তিষ্ক শৌর্য্য বীর্য্য শিক্ষা নিয়ম সকল সেই সেই সময় অনুরূপ ছিল। এখন কি তাহাই আছে? আমাদের আয়তনই ১৪ পুয়া হইয়া গিয়াছে। তৎপরিমাণানুরূপ আমাদের বল, বার্য্য, মেধা, হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমরা সেই পূর্ব্ববংশীয়দের অপভ্রংশ এক যৌগিক পদার্থ—এক জাতিরূপে পরিণত হইয়া হিন্দুসন্তান নামে অভিহিত আছি মাত্র। মন, আমাদের জাতিটাই যদি বিচার করা যায় ত দেখিতে পাই, ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে যে হিন্দু জাতি বা সমাজ ছিল, আজ তাহাদেরও অপভ্রংশ মাত্র। মন! ভাবিয়া দেখ, আমরা কতকাল মুসলমানদিগের অধীনে থাকিয়া সংসর্গ দোষে তাহাদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তখন হইতেই আমাদের জাতিত্বের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। তৎপরে ইংরাজাধীনে ও তাহাদের সংসর্গে কি যে এক অপরূপ জাতিত্বে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহার ইয়ত্তাই হইবার নহে। সুতরাং সামান্য বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে, তখনকার নিয়ম এখন প্রতিপালন করা এক প্রকার অসম্ভব ও দুর্ঘট।

আমাদের শাস্ত্রে দেখা যায় যে, এইরূপ এক একটা নূতন অবস্থায় পড়িয়া জীব যখন উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়, তখনই ভগবানের আবির্ভাব হয় এবং তিনি জীব সকলের মধ্যে শান্তিবিধান করেন। অবতারদিগের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার দরকার; তাঁহারা তৎকালোপযোগী উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে দেখা যায় যে, শাস্ত্রের সার মর্ম্ম ও গূঢ় রহস্য সকল সরল বাংলা ভাষায় দুই এক কথায় বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনীতে জানা যায় যে, তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, লেখা পড়ার বোধ ছিল না। অঙ্ক শাস্ত্র পাঠশালায় যোগ মাত্র শিখিয়াছিলেন, বিয়োগ শিক্ষা করিতে পারিলেন না।

এইরূপই মূর্খ পূজারি ব্রাহ্মণের মুখকমল হইতে সহজ বাঙ্গলা কথায় যে দুর্ভেদ্য শাস্ত্র সকলের সারমর্ম্ম সকল নিঃসৃত হইয়াছে ইহা অপেক্ষা আজকালকার বিজ্ঞানান্ধ জীবের আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এরূপ মূর্খ ব্রাহ্মণের নিকট আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিরাও যে অবনত মস্তক হইলেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য দেখান বা বিভূতি প্রকাশ আর কি হইতে পারে?

মন, তুমি বলিছিল—যাহাতে তুমি শান্তি পাইবে, যাহাকে লাভ করিলে আনন্দ পাইবে, যাহার নাম শ্রবণ করিয়া তোমার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, নৃত্য করিবে, যাহার রূপেতে তোমার তুমিত্ব জ্ঞান লোপ পাইবে, তোমার আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি অনুভব হইবে না, সেই তোমার ভগবান। মন, তোমার মতন, জগতের লোকের যদি ঘটী বাটী স্ত্রী পুত্র টাকা কড়িতে তাহাদের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, তবে তাহাদের সেই সেই ভগবান হইতে পারে! হয় হউক, তাহাতে পাগলের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। জগৎ তাহাই লইয়া সুখী হউক। কিন্তু সাবধান! যে মন এই কথা বলে, সে যদি একবার নির্জ্জনে নিঃসঙ্গ হইয়া আপনাপনি স্বীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে, তাহা হইলে সে স্বীয় সুখের ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিয়া নিশ্চয়ই বলিবে যে, তাহার উহা ভ্রম সংস্কার; মন, তোমার মত পাগলের পাগলামীই সত্য।

মন, এখন ভগবান রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অনুসারে জানা যায় যে, ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে গেলে, ভগবানের স্বহস্ত লিখিত শাস্ত্র হইতে যুক্তি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেরূপ শাস্ত্র কোথায়? এই বিশ্বসংসারই ভগবানের স্বরচিত গ্রন্থ বিশেষ, যে কোন বিষয়ের মীমাংসা—কি সামাজিক—কি রাজ-নৈতিক—কি শারীরিক—কি আধ্যাত্মিক—যে কোন বিষয় প্রয়োজন হউক, তাহা ইহাতে চূড়ান্তরূপে লিখিত রহিয়াছে। মন, একটু অনুশীলন করিয়া দেখ, এখনই দেখিতে পাইবে যে, এই জগতে সকল পদার্থ এক অদ্বিতীয়রূপে রহিয়াছে। এক পদার্থের দ্বৈতভাব হয় না। এক পদার্থ সর্ব্ব স্থানেই এক। যথা—সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, লৌহ, স্বর্ণ, ইত্যাদি। যদ্যপি কাহার এই এক জ্ঞান বিশিষ্টরূপে ধারণা হয় তাহা হইলে ভগবান "একমেবাদ্বিতীয়ং বিষয়ে কোন কালে তাহার ভ্রম জন্মিবে না।"

এইরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা আমরা যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা প্রাপ্ত হইতে পারি। মন, আজকাল এরূপ সময় পড়িয়াছে যে, লোকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যতীত কোন জিনিসই হঠাৎ গ্রহণ করিতে চাহেন না। মন, তুমি যাঁহার

নামে মাতিয়াছ, তাহা যে বাস্তবিক ভগবানেরই 'নাম বিশেষ এবং স্বপ্রতি ভগবান যে অবতার স্বরূপ জন্মগ্রহণ করিয়া অতি সরল প্রশস্ত পথ বাহির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, ইহাই তোমার ন্যায় মনুষ্যকে জ্ঞাত করাইবার চেষ্টা পাইতেছ। তুমি নিজে যে মধুর আস্বাদ পাইয়াছ তাহা জগতের লোককে আস্বাদন করাইতে লালায়িত হইতেছ। এ তোমার বৃথা চেষ্টা! তোমার পাগলের খেয়াল! আজকালকার চূড়ান্ত বুদ্ধিজীবী স্ব স্ব প্রধান মনুষ্য তোমার বুদ্ধি লইবে কেন?

রামকৃষ্ণদেব কোন সময়ে এক বক্তাকে বলিয়াছিলেন—"চাপরাস পাইয়াছ কি, যে লোকে তোমার কথা শুনিবে?" মন, আমিও তাহার দৃষ্টান্তে জিজ্ঞাসা করি, তোমার লোককে শিক্ষা দেওয়ার কি অধিকার আছে?—ভগবানের প্রকৃত ভক্ত বা তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্মচারী ব্যতিরেকে জনসাধারণ কি কখন কাহারও কথা গ্রাহ্য করিয়া থাকে? মন, তুমি উত্তর দিলে যে—তোমার পাগলের খেয়াল, তোমার যেটা মিষ্ট লাগিল তাহা অপর পাঁচ জনার নিকট প্রকাশ করিলে। এখন তাঁহাদের ইচ্ছা! তোমার বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

মন, দেখা যাক—অবতারবাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কি সাহায্য পাওয়া যায়? তদ্বিষয়েও একবার আলোচনার দরকার।

এই বিশ্ব-উদ্যান যাহা আমরা সদাসর্ব্বদা স্থূল দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকি এবং যাহাদিগকে পদার্থ বলিয়া ধারণা আছে, এই সমুদায় পদার্থকে ভগবান এক সময়েই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, অথবা সময় মতে জন্মায়, তাহার একটা সিদ্ধান্ত করা অতি কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া ধারণা হয়। বাল্যকালাবধি শাস্ত্র শব্দটি শুনিয়া আসিতেছি ও একরূপ ধারণা আছে। এই শাস্ত্র কাহাকে বলে? অনেকের ধারণা বেদ, তন্ত্র, পুরাণ ইত্যাদিকে শাস্ত্র বলে অর্থাৎ আমাদের আদিম মুনিঋষিগণ যে সমস্ত পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই শাস্ত্র অর্থে সচরাচর ব্যবহার হয়। কেন যে ইহাদিগকে শাস্ত্র বলে অনেকেরই তাহা ধারণা নাই। অথচ আধুনিক যদি কেহ কিছু লেখেন বা প্রমাণ করেন তাহা আমরা হঠাৎ শাস্ত্র বলিয়া লইতে কাতর হই। মন, সংস্কারবশতঃ তোমার যেন একটা ভয় হয়। তোমার ধারণা ও বিশ্বাস যে, মুনি ঋষির লেখা ব্যতীত শাস্ত্র হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র অর্থে 'নিয়ম' ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখন নিয়ম শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিতে গেলে জানা যায় যে, যে পদার্থ যেরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, সেই কার্য্যপ্রণালীকে নিয়ম বলে। যেমন চক্ষের

নিয়ম দেখা, কর্ণের নিয়ম শ্রবণ করা, আম্র বৃক্ষে আম্র উৎপন্ন হওয়াই ইহার নিয়ম, ইহাতে জাম বা কাঁঠাল উৎপন্ন হইতে পারে না। মনুষ্যের গর্ভে মনুষ্যই উৎপন্ন হয় চতুষ্পদ কোন জন্তু জন্মায় না, বা চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে মনুষ্য উৎপন্ন হয় না। এক্ষন মন, তোমার ধারণা হইতেছে যে, এই বিশ্ব-উদ্যানে প্রত্যেক দ্রব্য বা বস্তু স্ব স্ব নিয়মে বা স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করিতেছে। মন তোমার আবাস স্থান যে দেহটা অর্থাৎ সচরাচর যাহা মনুষ্য শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে অথবা মনুষ্য বলিলে যাহা যাহা বুঝায় তৎসমুদায়ই পদার্থ বিশেষ। পূর্ব্বে মুনিঋষিরা যে দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া গিয়াছেন এখন আমরা রামকৃষ্ণের প্রমুখাৎও সেই দুই নিয়মে বিভক্ত জানিতে পারিতেছি এবং আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরাও তাহাই বলেন যথা – "জড় ও চেতন"।

দেহ অর্থাৎ অস্থি মাংস শোণিত নাড়ী প্রভৃতি জড় পদার্থ এবং দেহী অর্থাৎ যাহা দ্বারা জড়-পদার্থ সচেতন রহিয়াছে। মন, তুমিও যাহার শক্তিতে মধ্যে মধ্যে গর্ব্ব প্রকাশ কর ও একটা দুর্ঘট বাধাইয়া যন্ত্রণা ভোগ কর, এবং তোমার সংসর্গে যিনি কষ্ট অনুভব করেন তাঁহাকে আত্মা বা চৈতন্য কহা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য পদার্থের ন্যায় মনুষ্যরূপী আমরাও নিয়মাধীনে আছি। এই সকল নিয়মের যখন বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে তখন আমাদের অবস্থারও বিপর্য্যয় হয় সুতরাং আমাদের নিয়মাবলী আমাদিগের জ্ঞাত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। দেহ সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা এক শ্রেণীর শাস্ত্র এবং দেহী বা আত্মা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্র আছে। কিন্তু মন, দেহ ও দেহী যদিও পরস্পর বিভিন্ন আকার কথিত হইল কিন্তু একের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। এমনই সুন্দর ভগবানের সৃষ্টি কৌশল যে দেহ ও দেহীর একত্রীভূত অবস্থা থাকা চাই এবং তাঁহাদের বিশেষ সম্বন্ধও রহিয়াছে। সেই একত্রীভূত অবস্থার এক স্থূলভাব মনুষ্য শব্দে উপাধি ধারণ করিয়াছে এবং অন্যান্য প্রাণীজগৎ হইতে একটী স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, যেমন মানব বলিলে একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবের এক সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর চৈতন্যবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং তাহারা জড় ও চেতন পদার্থের সমষ্টি বিশেষ এবং একরূপ ধর্ম্মে চালিত, সেইরূপ মনুষ্য জাতির মধ্যে যদি একটী মনুষ্যকে ধরা যায় সেও সেই জড় ও চেতনের সমষ্টিমাত্র। এখন দেখা যাক, কোন বাল্য সংস্কারাবদ্ধ এক পৃথক নামধারী মনুষ্য যাহার নাম "রাখাল"। অন্যান্য লোকে যদি

তাহাকে দূর হইতে রাখাল বলিয়া ডাকে তাহা হইলে সে বোধ করিবে যে, তাহাকেই অপর পাঁচজনা নির্দ্দেশ করিয়া ডাকিতেছে কিন্তু তাহার অন্যান্য ধর্ম্ম সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন নামধারী অন্যান্য মানবের সহিত কোন অংশে বিভিন্ন নয়। যদি দশজন মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন নামধারী এক স্থানে থাকেন তন্মধ্যে রাখাল বলিয়া ডাকিলে, যাহার ঐ নাম জ্ঞানে ধারণা আছে, সেই ব্যক্তিই উত্তর প্রদান করিবে, অন্যে নীরব থাকিবে, সেইরূপ ভগবান বলিলে এই বিশ্ব-উদ্যানের জড়, ও যে শক্তিতে এই উদ্যান স্থিত এবং এক নিয়মে চলিত হইতেছে, সেই শক্তি বা চৈতন্য, এবং উহাদের সমষ্টিকেও বুঝাইয়া থাকে। যেমন কোন নির্দ্দিষ্ট নামধারী মনুষ্যকে ডাকিলে সেই মনুষ্যের চৈতন্য পদার্থটিই তাহা জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তেমনি ভগবানকে যে কোন নামেই ডাকা হউক এই বিশ্বোদ্যানের স্বামী যিনি এবং অনন্তশক্তি বা চৈতন্য বিশিষ্ট পদার্থই জ্ঞাত হন। মন, যেমন রাখাল বলিলে, সেই জীববিশেষের দেহ অস্থি নাড়ী প্রভৃতি ও সেই বিশিষ্ট দেহের অধীশ্বর চৈতন্য-স্বরূপ যে দেহী বা আত্মা আছেন, ইহাদের সমষ্টিকেই বুঝায়; কিন্তু উত্তর প্রদান করেন ও জ্ঞাত হন সেই দেহী বা চৈতন্য পদার্থটী মাত্র, কারণ চৈতন্যরূপী আত্মাই এই দেহরাজ্যের অধীশ্বর, তিনিই দেহ সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন। অথচ এই দেহটী না থাকিলে সেই চৈতন্যের কোন ক্রিয়াই হয় না, তখন তিনি নিষ্ক্রিয় কেবল বোধরূপ মাত্র। তেমনি ভগবান বলিলে এই বিশ্বোদ্যান, ইহার প্রত্যেক জড়পদার্থ ও চৈতন্য পদার্থের সমষ্টিকেই বুঝায়, এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলে এই বিশ্বোদ্যানের শক্তি বা চৈতন্যরূপ যে পরমাত্মা সর্ব্বত্রে বিরাজমান আছেন, তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং তিনিই ঠিক আমাদের আত্মার ন্যায় শ্রবণ করিতে পান। সুতরাং আমরা যে কালী, দুর্গা, হরি প্রভৃতি ভগবানের আখ্যাসমূহ শ্রবণ করিয়া আসিতেছি এবং যাহা অন্তরে বদ্ধমূল আছে, তৎসমুদায়ই সত্য। ঐ সমস্ত সেই অনন্তশক্তি বিশিষ্ট ভগবানের এক এক শক্তির ক্রিয়া বিশেষ বা লীলারূপী ভাবমাত্র। আমাদের শাস্ত্রেও পাওয়া যায় যে, যে কালে যে ভাবের আবশ্যক হইয়াছে, সেইকালে সেই ভাবে ভগবান আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের ও অন্যান্য জড় সম্বন্ধীয় ধর্ম্মেরও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

আরো দেখ মন, তোমার যে দেহ, তাহার পাদমূলের অগ্রভাগে যদি কণ্টক বিদ্ধ হয়, তুমি সেই মুহূর্ত্তেই জ্ঞাত হইতে পার ও তখনিই তাহা

উৎপাটিত করিয়া যন্ত্রণা অপনোদন করিতে প্রয়াস পাও। তোমার অত বড় দেহটার এক প্রান্তে যে কণ্টক বিদ্ধ হইল, সে কষ্ট কে অনুভব করিল? তোমার জড়দেহ না দেহী বা চৈতন্যরূপিণী আত্মা? তুমি উত্তর দিবে—তোমার আত্মা বা চৈতন্য। কারণ সেই আত্মা বা চৈতন্য যখন দেহরাজ্য পরিত্যাগ করে, তখন চিতায় দগ্ধ করিলেও কোন কষ্ট নাই, কারণ দেহটা জড়ধর্ম্মাবলম্বী পঞ্চভূতের সমষ্টি বিশেষ। সেইরূপ এই বিশ্বরাজ্যে জড় বা চৈতন্য সম্পর্কীয় যে কোন পদার্থ হউক, যখন বিকৃত ভাবাপন্ন হয় তখনিই ভগবান তাঁহার শক্তি বিশেষের দ্বারা তাহার সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন; ইহাকেই তাঁহার দয়া বলে। আমরা যখন কষ্ট পাইয়া ভগবান বলিয়া কাঁদি, তিনি কি তাহা শুনিতে বা জানিতে পারেন না? ইহা কি সম্ভব? আমরা কি তাঁহা ছাড়া? তবে অবোধ ছেলে পিতাকে যখন চাঁদামামা ধরিয়া দাও বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তাহার পিতা যেমন বল্ কি কোন পুতুল ইত্যাদির দ্বারা ভুলাইয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান আমাদেরও ভুলাইয়া শান্তিবিধান করেন। দরিদ্র কাঙ্গালি যদি বায়না ধরে যে, রাতারাতি রাজা হইবে, ইহা তাহার চাঁদামামা ধরার যো নয় কি? সেইরূপ অজ্ঞানান্ধ বদ্ধজীব আমরা যখন তাঁহার শক্তি বিশেষের একটীরও অতি পরমাণুরূপ আংশিক ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি, তখন তাঁহার পূর্ণাবস্থা জ্ঞাত হওয়া বা লাভ করিতে যাওয়া, চাঁদামামা ধরার ন্যায় নয় কি? পিতা যেমন কোন সুন্দর লাল বল্ বা খেলনা দিয়া অবোধ শিশুকে ভুলাইয়া দেন, ভগবান সেইরূপ মন, তোমাকে তাঁহার করুণার আংশিক জ্যোতি দানে তোমার কষ্ট অপনোদন করিতেছেন। মন, অদ্যাপি আমরা এই স্থূল পৃথিবীর রহস্য অবগত হইতে পারিলাম না। অদ্য যাহা স্থির করিতেছি, কল্য তাহার ভ্রম বাহির হইয়া যাইতেছে। সে স্থলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্য কলাপ, তাঁহার অবস্থা লইয়া আন্দোলন, মতামত প্রকাশ এবং সমালোচনা করা নিতান্ত অভিমানের কথা। আমরা অনেক সময়ে অভিমানে অন্ধ হইয়া এবং পরের কথা শুনিয়া পরিচালিত হইয়া থাকি। আপনাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি লইয়া যদ্যপি স্থিরভাবে ভাবের খেলা বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে কখন ভগবানের স্বরূপ লইয়া বাদানুবাদ করিতে সাহসী হই না। ভগবান বাদানুবাদের বস্তু নহেন, তিনি অভাবপূরণের হেতুস্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয়। রামকৃষ্ণদেবের মতে ভগবানের স্বরূপ স্থির হয় না। তাঁহার আকার আছে

বলিলেও বলা যায়, আবার নাই বলিলেও ভুল হয় না, এবং কিছু না বলিলেও তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের স্বরূপ বর্ণনাতীত এবং উপলব্ধির অধিকার বহির্ভূত, এই নিমিত্ত তিনি বাক্য মনের অতীত বস্তু বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

মন, এ স্থানে তুমি বলিতে পার, যদি ভগবান বাক্য মনের অতীত বস্তু হন, তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া তোমার ফল কি হইবে? যাঁহাকে বুঝিতে পারিব না, যাঁহার বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারিব না, তিনি থাকিলেও যেমন, না থাকিলেও তেমন। অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানকে অবলম্বন করা, শান্তিলাভের নিমিত্ত ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া, তিনি মন বুদ্ধির অধিকার বহির্ভূত হইলে, কিরূপে আমাদের অভিপ্রায় চরিতার্থ হইবে? এই নিমিত্তই রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, বাক্য মনের অতীত বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, বিষয়াত্মক অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন ভাবে রঞ্জিত মনের অতীত, এবং বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বুঝা যায় না বা বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। আরও ইহাতে অভাবের বা প্রয়োজনের ভাব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, একটু স্থির চিত্তে বুঝিলে দেখিতে পাইবে যে, যাহার মন কামিনীকাঞ্চনে ডুবিয়া আছে, যাহার মুখে কেবল ঐ কথা, যে ব্যক্তি বিষয় কার্য্য ও সংসারিক উন্নতি চিন্তায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, যে সেই কার্য্যের নিমিত্ত সদাসর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, ভগবানের নিমিত্ত তাহার অভাব কোথায়? এরূপ অবস্থায় ভগবান কখন তাহার নিকট স্বপ্রকাশ হইতে পারেন না।

মন, পূর্ব্বে দেখিয়াছ—অভাব না হইলে, কোন দ্রব্যের আবশ্যকতা বুঝা যায় না। যখন তাহা লাভ হয়, তখন তাহার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। কোন বিষয় বুঝিতে পারিলেই যে আমাদের বর্ণনা করিবার সামর্থ হয়, তাহা নহে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যেমন ক্ষুধা না পাইলে ভোজন করিবার প্রয়োজন হয় না, ক্ষুধা পাইলেই যে সমুদায় ভোজ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মায়, তাহা নহে। তখন বাস্তবিক আহার করিবার আবশ্যক। আহার সময়ে পদার্থ বিশেষের আস্বাদনের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। এই মাত্র বলা যায় যে, মিষ্ট, উত্তম, কটু, ঝাল ইত্যাদি। আরও দেখ, যদি জিহ্বার স্বভাব বিচ্যুত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ প্রকার আভাস দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সন্দেশ খাইবার পূর্ব্বে যদি অতিশয় তিক্ত, কি কটু, বা কষায় পদার্থ ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে সন্দেশের ভার একেবারে

উপলব্ধি হয় না। সেইরূপ কামিনীকাঞ্চনরূপ ভাবে মন প্রাণ রঞ্জিত থাকিলে, তথায় ঈশ্বরের ভাব প্রবেশ করিবে কিরূপে? যে ব্যক্তি সংসারে শান্তি বোধ করে, তাহার অভাব এই। সাংসারিক ভাবেই পরিপূর্ণ হয়। যাহার আকাঙ্ক্ষা এই পৃথিবীমণ্ডলে মিটিয়া যায়, তাহার পক্ষে ভগবান ত বাগানের মালী বা খানসামার সামিল। অন্ধের পক্ষে সুন্দরী প্রকৃতির সুন্দর প্রতিকৃতি থাকা বা না থাকা সমতুল্য। দুগ্ধপোষ্য শিশুর নিকট ভুবন-মোহিনী রমণী রত্নের সৌন্দর্য্য কি? বিষয়লিপ্সা বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ভগবান সেইরূপ জানিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

নিবেদন।

১

হে ধীমান্!

কভু কি জেগেছে প্রাণে দীনের বেদনা?
কথন কি জানিয়াছ অভাব যাতনা?
নিরাশ্রয় অনাহারে
পোষ্যকুল চারিধারে
চাহি মুখ পানে, চায় অভাব পূরণ।
পূরাতে অক্ষম দীন, ঝরে দুনয়ন॥

২

অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, নাহি ধন জন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ সদা নিপীড়ন॥
কঙ্কাল হয়েছে সার
অন্ধকার এ সংসার
কামনা সতত হৃদে, প্রাণ বিসর্জ্জন।
হে সুধি! বুঝ কি তুমি এ হৃদি-বেদন॥ *

---

* বিগত ২৮ শে আষাঢ় রবিবার, শিবপুর রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডারের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শিবপুরের যুবকবৃন্দ যে অধ্যবসায়ে দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনার্থে পরিশ্রম করিয়া কার্য্যাদি করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। আশা করি, অন্যান্য সকলে ইহাদিগের আদর্শে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই ভাণ্ডারের স্থায়িত্ব কামনা করি। 'নিবেদন' তৎ সভায় পঠিত দুঃস্থজনের অবস্থা জ্ঞাপক কবিতা।

৩

চাও কি সু-আশীর্ব্বাদ শত দেবতার ?
চাও কি গো প্রসন্নতা হৃদয় মাঝার ?
চাও কি গো স্বর্গসুখ,
চাও কি ভুলিতে দুখ,
সাকারে পূজিতে কি গো চাহ নারায়ণ ?
ফলিবে সকল, সাধে সেব দীনজন ॥

৪

হরি দীনরূপ ধরি তোমার কারণ।
উদরে প্রদানি হাত করেন ভ্রমণ ॥
কর সবে সেবা তাঁর,
হরি সেবা কর সার,
দিন পেয়ে কর দীন-হরির সেবন।
ঘটাওনা অপরাধ করিয়া হেলন ॥

৫

কলি-যুগ-ধর্ম্ম দেখ দানব্রত সার।
উদ্যাপন কর আজি সে ব্রত তোমার ॥
ভুলিওনা সার ধর্ম্ম,
ভুলোনা প্রধান কর্ম্ম,
বিফল জীবন, হ'লে হারা হরিধন।
সে হরি প্রত্যক্ষ সেব দীন-নারায়ণ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব-সংবাদ।

আগামী ২রা ভাদ্র, মঙ্গলবার, জন্মাষ্টমীর দিবস কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে মধুরায়ের গলি, সিমুলিয়া হইতে দলে দলে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়, যোগোদ্যানে যাইবে ও তথায় মহোৎসবাদি হইবে। তত্ত্ব-মঞ্জরীর গ্রাহকবর্গ তাঁহাদিগের বন্ধুবান্ধবগণসহ উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

ভাদ্র, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭৮ পৃষ্ঠার পর)

২৭২। হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হলে ফল হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বল্লে 'মা! আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা উত্তরে বল্লে, 'বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এজন্য তুমি কিছু ভেবনা।' সেইরূপ ভগবান জন্য ব্যাকুল হওয়া,—ঠিক সময় হলেই হয়।

২৭৩। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে, আমি আগে জিজ্ঞাসা করি 'তোর কে আছে?', মনে কর, বাপ নাই, হয়ত বাপের ঋণ আছে, তা হলে সে কেমন করে ঈশ্বরে মন দিবেক?

২৭৪। ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়। তাঁর উপর আমাদের জোর করা পর্য্যন্ত চলে।

২৭৫। সিদ্ধি কিনা বস্তু লাভ। 'অষ্টসিদ্ধির' সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, 'ভাই! যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটী সিদ্ধি কারও আছে, তা' হলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না।' কেননা, সিদ্ধাই থাকলেই অহঙ্কার থাকবে, অহঙ্কারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

২৭৬। সাধক চারি প্রকার। প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, এবং সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্ত্তকের থাক্; সে সব লোক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। সাধক, আরো এগিয়ে গেছে; লোক দেখান ভাব কমে গিয়েছে; সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে? যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়েছে যে—ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব করছেন; যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন। 'সিদ্ধের সিদ্ধ' কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। শুধু দর্শন নয়;—কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুর ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে—এই বিশ্বাস, আর কাঠ থেকে আগুন বার করে ভাত রেঁধে, খেয়ে, শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করা; দুটি ভিন্ন জিনিস।

২৭৭। ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না; তারে বাড়া, তারে বাড়া, আছে।

২৭৮। একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে, নয় নিরাকারে। দৃঢ় হলে তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ করবে। মিছরীর রুটি সিদে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবেই।

২৭৯। দৃঢ় হতে হবে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জানো? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁন্দল শুনে, ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্যি'। আর যেমন কোনও ফিট্ বাবু পান চিবুতে চিবুতে হাতে ষ্টিক (stick) করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটী ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, 'ঈশ্বর কি বিউটিফুল (beautiful) ফুল করেছেন।' কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

২৮০। সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক্। কিন্তু কৈ, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে দুই এক জনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়; যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা

ক'চ্চি। সত্যি বলছি দর্শন হয়। একথা কারেই বা বলছি, কে বা বিশ্বাস করবে।

২৮১। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র পড়ে ছন্দ অস্তি মাত্র বোধ হয়; কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পাবে না।

২৮২। শাস্ত্র, বই, শুধু এ সব তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা না হলে কিছু হবে না। যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো। কৃপা হলে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

২৮৩। বিভুরূপে ঈশ্বর সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরে যেমন, পিঁপড়েটার ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তি বিশেষ আছে। দেখনা, এমন লোক আছে যে, সে একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে, একজনার ভয়ে পালায়।

২৮৪। গীতায় আছে, যাঁকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচার দেওয়ার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

২৮৫। সংসারে থেকেই ঈশ্বর লাভ হতে পারে। তবে আগে দিনকতক নির্জ্জনে থাকতে হয়। নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়। বাড়ীর কাছে এমন একটা আড্ডা করতে হয়, যেখানে থেকে বাড়ী এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পারো।

২৮৬। যে কালে যুদ্ধ করতে হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, ক্ষুধা তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না, তখন ঈশ্বর টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার মাগকে বলেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ করে চল্লুম।' মাগটী একটু জ্ঞানী ছিল, সে তাকে বল্লে 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও; আর তা যদি হয়, তা হলে এই এক ঘরই ভাল।'

২৮৭। ত্যাগ কেন করবে? বাড়ীতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটা দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।

২৮৮। জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন—একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্ম্মের।

২৮৯। জ্ঞান হলে ঈশ্বরকে আর দূরে দেখায় না। তিনি আর 'তিনি' বোধ হয় না। তখন 'ইনি'। হৃদয় মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতরে আছেন, যে খুঁজে, সেই পায়।

২৯০। 'আমি পাপী' একথা বলতে নাই। আমি তাঁর নাম করেছি, ঈশ্বর, কি রাম, কি হরি বলেছি—আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই; নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

২৯১। তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ কর্ত্তে দিয়েছেন, তাই করো।

২৯২। গৃহস্থের কর্ত্তব্য আছে। ছেলেদের মানুষ করতে হবে, স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে হবে ও অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় করে রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দ্দয়। দয়া শুকদেবাদি রেখেছিলেন। দয়া যার নাই, সে মানুষ নয়।

২৯৩। সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত সন্তান প্রতিপালন করবে। পাখী বড় হলে, যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না।

২৯৪। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য—তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে ধর্ম্মোপদেশ দেবে, ভরণপোষণ করবে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্ত্তমানে খাবার যোগাড় করতে হবে।

২৯৫। তবে জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য না ভাবলে ঈশ্বর ভাববেন। জ্ঞানোন্মাদ হলে তিনি তোমার পরিবারদের জন্য ভাববেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন 'অছি' সেই নাবালকের ভার লয়।

২৯৬। সংসারে থেকেও জ্ঞানলাভ হয়,—তার লক্ষণ ঐই যে, হরিনামে

ধারা, আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে, আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে পড়বে।

২৯৭। যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যেতে পারা যায়, আর দেহবুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে, দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায় তা হলে নড় নড় ক'রে শাঁস আলাদা হয়ে যায়। একে বলে খোড়ো নারিকেল। ঈশ্বর লাভ হলে, লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হয়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখ দুঃখে তার সুখ দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। সে জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায়। 'কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।'

২৯৮। যখন দেখবে, ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে। দেশে-লাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ্‌ করে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না, কেবল কাটিগুলা ফেলা যায়। বিষয় রসে র'সে থাকলে, কামিনীকাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না; হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

২৯৯। বিষয়রস শুকাইবার উপায় মাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকা। তাঁর দর্শন হলে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে। কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষণি হয়। তিনি ত ধর্ম্ম মা নন। তিনি আপনারই মা। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আবদার কর।

৩০০। অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য, কিছুই থাকবেনা, তাই অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ করতে হয়। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

(ক্রমশঃ)

আশা।

জীবহৃদয়বাসিনী আশা অনন্ত অসীম, সংসার-ক্ষেত্রে সুবিস্তীর্ণা আশাই মানুষের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান ও মূলীভূত কারণ। সর্ব্বাগ্রে মানুষ যদি—আশাদেবীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে না পায়, তাহা হইলে কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারে না, কখনই মানুষ, মানুষ বলিয়া মনুষ্য-সমাজে পরিচিত হইতে পারে না। পুত্র জজ হইবে, ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে, উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সম্মানের সহিত সমাজে সমাদৃত হইবে—আশায়, পিতা বহুকষ্টোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া জ্ঞান বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য তাহাকে উপযুক্ত গুরুর নিকট অধ্যয়ন করাইতে বাধ্য হন। সৎপুত্র জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া বংশোজ্জ্বল করিবে আশায়, সংসারের বিবিধ নির্য্যাতনে নিপিড়ীত হইয়াও মানব, বীর্য্য এবং আয়ুক্ষয়কারিণী কামিনীকে প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হয়। মানুষ মূলে যদি আশার এরূপ জলন্ত ছবি পরিদর্শন করিতে না পারিত, তাহা হইলে কি সে জন্ম মৃত্যুর ভীষণ তরঙ্গের উপর পুত্রকে বিদ্যমান দেখিয়া, তাহার জন্য রুধিরোপম অর্থের অনর্থক ব্যয় করিত? তাহা হইলে কি সে, শরীরের অহিতকারী সাক্ষাৎ নরকের সেবা করিয়া ইহকাল পরকাল বিনষ্ট করিতে প্রস্তুত হইত? তাহা হইলে কি সে, পতঙ্গের মত ইচ্ছা করিয়া যোষিৎ-পাবকে ঝাঁপ দিয়া পড়িত? না, কখনই না, তাই বলি, উৎসাহ বল, সাহস বল, বীর্য্য বল, শক্তি বল, বুদ্ধি বল, সমস্তই আশার দ্বারা পরিচালিত, আশাই আগে হৃদয়ে জাগে, তাহার পরে সকলে জাগিয়া নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। অতএব আশাই উন্নতির মৌলিক কারণ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে বস্তুমাত্রেরই দোষ গুণ দেখা যায়। সূর্য্য যেমন মানুষের উপকার করিতেছে, তেমনই আবার বিবিধ ব্যাধির উৎপাদন করিয়া মনুষ্যকে যারপর নাই কষ্ট প্রদান করিতেছে। মেঘনিঃসৃত বারি যেমন ভূমিতে নিপতিত হইয়া শস্যোৎপাদন করতঃ মনুষ্যের অচিন্তনীয় উপকার করিতেছে, তেমনই আবার নানাবিধ ব্যাধির কীটাণু সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। সংগীত আলোচনা দ্বারা মানুষ যেমন দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে তেমনই আবার খিলাচন্দ্র লাভ করিয়া ঘৃণাস্পদ হইয়া সাধারণের নিকটে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেইরূপ আশারও

দোষ গুণ দুইই আছে; আশারও দেবত্ব পিশাচত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা আছে। ভাগ্যবশতঃ যাহার হৃদয়ে যে ভাবে আশা জাগিয়া থাকে, সে সেই ভাবেই সংসারে চালিত হয় এবং পরিণামে সেই ভাবেরই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দেখ দেখ, একবার সংসারের দিকে বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া দেখ যে, আজ কেহ সু-আশার বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্গদ্বারের অর্গল উদ্ঘাটনের জন্য নারায়ণ বা নারায়ণীর ধ্যাননিমগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিতেছে, কেহ বা তড়াগ, পুষ্করিণী, অন্নমেরু, স্বর্ণমেরু প্রভৃতি মহা মহা দান করিয়া জীবনযাপন করিতেছে; কেহ ভগবান বা ভগবতীর নাম গুণ গানে রত হইয়া জীবন সমাপন করিতেছে, কেহ বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতাকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে সেবা শুশ্রূষা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে—"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বং প্রযত্নতঃ॥" কত সতী রমণী ইহলোকে অকালে পতিহারা হইয়া পরকালে পতিসনে মিলিবার আশায় জীবন ব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, কেহ বা পতিকেই পরমগুরু মনে করিয়া পতিসেবার দ্বারাতেই প্রাণপাত করিতেছে,—"পতিরেক গুরু স্ত্রীণাং।"

আবার দেখ, কত দুরাত্মা কত নিষ্ঠুরাত্মা কুয়াসাময়ী কুআশা প্রণোদিত হইয়া, স্বর্গদ্বার রুদ্ধ করিবার আশায় পরস্ব ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিতেছে, কত আত্মম্ভরি ব্যক্তি অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া ঈশ্বরের কর্ম্ম করা দূরের কথা, তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিলেই ঘাড় বাঁকাইয়া চলিয়া যাইতেছে, কতজন পাপবুদ্ধির প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া পরনারীর সঙ্গে দুষ্কার্য্যে রত হইয়া, মহৎকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনকে কলুষিত করিতেছে, কত পাষণ্ড, কত অকাল কুষ্মাণ্ড স্ত্রীবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া শক্তিসামর্থহীন স্থবির জনক জননীর পীড়ন করিতেছে, কত কুলকলঙ্কিনী রমণী সতীত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্বীয় পতিলোচনের অন্তরালে পিশাচবৃত্তি নিবৃত্তি করিতেছে। মহাশক্তিশালিনী আশা—এইরূপে কাহাকে স্বর্গদ্বারে দাঁড় করাইয়া স্বর্গীয় সুষমা সন্দর্শন করাইয়া, হৃদয়ে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, আবার কাহাকেও নরকের বীভৎস ঘটনাবলী দেখাইয়া বিস্ময়ান্বিত করিতেছে।

এই যে অসীম শক্তিশালিনী কামরূপা আশা, ইহার কি অবসান নাই? ইহার কি বিরাম নাই? আছে। যদি প্রাণীসমূহ অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর আশা পরিত্যাগ করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ গোবিন্দের পদে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে, যদি সেই প্রাণারাম আত্মারাম শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে মনোভৃঙ্গকে

স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলেই ইহার অবসান আছে, তাহা হইলেই ইহার বিরাম আছে, নতুবা নহে। আর এই অনন্ত আশার অন্ত না হইলেও সেই অনন্তশায়ী অনন্তের চরণ-প্রান্ত প্রাপ্ত হইবার স্বতন্ত্র উপায় নাই। তাই বলি দুরাশা ছাড়, কু আশা পরিত্যাগ কর, করিয়া—সেই একমাত্র জগৎ-ভরসা শ্রীহরিকে লাভ করিব—এই আশা হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া সংসার সমুদ্রে সন্তরণ দিতে থাক, তাহা হইলে আর সংসার সমুদ্রে বিচরণশীল হিংস্রক বজ্রদন্ত ইন্দ্রিয় শত্রুগণ তোমাকে কিছুতেই আক্রমণ বা দংশন করিতে পারিবে না, অধিকন্তু তোমাকে দেখিয়া ভয়ে ভীত হইবা ব্যাঘ্রদৃষ্ট কুক্কুরের ন্যায় দূরে পলায়ন করিবে। আশা মানসিক বৃত্তির মধ্যে পরিগণিত, মনোবৃত্তি ব্যতীত আশা আর কিছুই নয়, মনই সকলের রাজা, মনই সকলের কর্ত্তা, সেই মনই যেকাল পর্য্যন্ত বিজিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত একমাত্র রিপুবিমর্দ্দনকারী শ্রীহরির তত্ত্ব বিষয়ের অভ্যাস দ্বারা চিত্ত ও অহঙ্কারকে প্রক্ষীণ করিয়া ইন্দ্রিয় শত্রুর নিগ্রহ করিবে, তাহা হইলেই হেমন্তকালের পদ্মিনীর ন্যায় ভোগ বাসনা-সমূহ স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যাইবে—

"একতত্ত্ব দৃঢ়াভ্যাসাদ্যাবন্ন বিজিতং মনঃ।
প্রক্ষীণ চিত্তদর্পস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয় দ্বিষঃ।
পদ্মিন্যইব হেমন্তে ক্ষীয়ন্তে ভোগ-বাসনাঃ॥"

ভাই সাধক! যখন তোমার এইরূপ অবস্থা ঘটিবে তখন তুমি দিব্য দৃষ্টিতে স্পষ্টরূপে দেখিতে পারিবে যে, এ বিশ্ব সংসার তোমার রাজত্ব, তুমিই এ বিশ্বসংসারের একমাত্র অধীশ্বর; তখন তুমি নিজেনিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, মানুষ ত অল্প কথা—বায়ু, অগ্নি, মেঘ প্রভৃতি জড়পদার্থ পর্য্যন্তও তোমার অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

হরি হে! কত দিনে আমার সে শুভদিন উপস্থিত হইবে, যে দিন ঐহিক পারত্রিকের সুখ শান্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারই ভজনানন্দে মনঃ প্রাণ মাতিয়া যাইবে; তোমারই নামকীর্ত্তন করিতে করিতে নয়ন-প্রবাহে বক্ষ ভাসিয়া যাইবে; তোমারই সুধামাখা হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে সবশ অঙ্গ অবশ হইয়া যাইবে; তোমারই নবনীরদ শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গভঙ্গিম মধুর মূরতি হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে মূলকর্ত্তিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় এ দেহ ধরায় পতিত হইবে। হে সুখময়! তোমাকে লাভ করিলে যে, সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সুখই বাস্তবিক সুখ; তাহা ব্যতীত

লোকে যাহাকে সুখ বলিয়া জানে, সে সুখ, সুখ নহে; সে অনিত্য, সে অসত্য পদার্থ; কারণ—আমি যাহাকে সুখ বলিয়া অনুভব করিতেছি, অন্যে তাহাকে দুঃখ বলিয়া বোধ করিতেছে। আমি যাহাকে দুঃখ বলিয়া বুঝিতেছি, অন্যে তাহাকে সুখ বলিয়া জানিতেছে। অতএব এমন মিথ্যা বস্তুর আশায়, সকল আশার আশ্রয় যে তুমি, তোমাকে আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। হে সেবাপ্রসন্ন! তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া, যদি আমি জনসমাজে নিন্দিত, বর্জ্জিত, উপেক্ষিত বা দণ্ডিত হই, সেও ভাল, তথাপি তোমার সেবাকর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না, হে পরদেবতে! তোমার সেবা আমি করিব, করিব, অবশ্য করিব; ইহাই আমার মনের একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসা।

> "নিন্দন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে ত্যজন্তু স্ত্রীসুতাদয়ঃ।
> জনা হসন্তু মাং দৃষ্টা বাতুলো দণ্ডযদ্ধবা॥
> সেবে সেবে পুনঃ সেবে ত্বামেব পরদেবতে।
> তৎকর্ম্মণৈব মুক্তামি মনো বা কায় বক্মাংশঃ॥

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

অহঙ্কার।

যে দিকে ফিরাই আঁখি, 'আমি'ময় সব দেখি,
'আমি' জ্ঞান ব্যাপ্ত চরাচর।
'আমি' হীন কেহ নাই, 'আমি' দেখ সব ঠাই,
জীব জন্তু আদি নারী নর॥
রাজা যিনি সিংহাসনে, 'আমি' এই অভিমানে,
যথা ইচ্ছা করিবারে যান।
মন্ত্রীর সুবুদ্ধি বলে, কলে বলে নানা ছলে,
সব সাধ সাধিতে না পান॥
যদি না মানেন কথা, লঙ্কার রাবণ যথা,
কিম্বা রাজা দুর্য্যোধন প্রায়।
সাধেন বংশের নাশ, দীর্ঘশ্বাসে হা হুতাশ,
অবশেষে স্বীয় প্রাণ যায়॥
মধ্যবিৎ পান চাহ, 'আমি' হীন নাহি কেহ,
অহঙ্কারে সবে দিশেহারা।

নাকাল অবধি নাই, মুখে-সদা 'দূর ছাই,'
ভেবে ভেবে ঘুরে ফিরে সাবা॥
দরিদ্র ভিখারী যেই, 'আমি' জ্ঞানে মত্ত সেই,
ভাবে সদা কবে বড় হ'ব।
দুখ জ্বালা পাশরিয়ে, ধন পুত্র দারা লয়ে,
'কর্ত্তা-আমি' বাড়ীতে বসিব॥
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে কত পরমাদ,
'আমি' 'আমি' তবু নাহি ছাড়ে।
সুখ লেশ মাত্র নাই, চাহিয়ে দেখনা ভাই,
দুখ শুধু দিনে দিনে বাড়ে॥
হৃদয়কন্দর হতে, যত দিন বিধিমতে,
নাহি কার(ও) যাবে অভিমান।
ততদিন এই ভবে, কভু নাহি শান্তি পাবে,
দুখ হ'তে নাহি পাবে ত্রাণ॥
বাছুর ভূমিষ্ঠ হলে, 'হাম্ হা' 'হাম্ হা' বলে,
'আমি' 'আমি' অর্থ দেখি তার।
শুধু এই 'আমি' হতে, কত যে দুর্গতি তাতে,
দেখ সবে করিয়া বিচার॥
মন সাধে দুগ্ধ পানে, বৎস কভু কোনখানে,
বাল্যে হায় প্রাণ ভ'রে পায়!
খোঁয়াড়ে দিবস কাটে, পিয়াসে পরাণ ফাটে,
বল কেবা তার পানে চায়!
বৃষভ হইলে পরে, লয়ে তারে চাষে ফেরে,
কভু তারে ছাড়া দাগা দিয়া।
কোন বৃষ গাড়ী টানে, আঁখি ঢাকা কোনখানে,
মরে হায় ঘানিতে ঘুরিয়া॥
গাভীর বন্ধন দশা, নিরাশা সকল আশা
ইচ্ছা সুখে খাইতে না পায়।
গৃহস্থের সাধ্যমত, আহারেতে মুগ্ধা রত,
খড় জলে নিবারে ক্ষুধায়॥

কসা'য়ে কাটিয়ে খায়, বিষ্ঠা পরিণাম তায়,
তবু নাহি অভিমানে ভোলে।
চামড়ায় ঢোল ক'রে, যবে নরে কাটি মারে,
কত মত নানা বুলি বলে॥
অন্ত্রে তাঁত বিরচিয়ে, ধুনরী তাহাকে লয়ে,
রত যবে তুলা ধুনিবারে।
দণ্ডাঘাতে সে সময়, 'আমি' রব দূরে যায়,
'তুঁহু' 'তুঁহু' বলে বারে বারে॥
সেইরূপ যেন সবে, কেহ নাহি এই ভবে,
সহজেতে ছাড়ে অভিমান।
কামিনী-কাঞ্চন লয়ে, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে,
একেবারে ভোলে ভগবান॥
ধন পুত্র নাশ হলে, প্রাণেতে আঘাত পেলে,
'হা ঈশ্বর তুমি' তবে বলে।
এখন হইতে তাই, সাবধান হও ভাই,
ভুলোনা'ক অভিমান ছলে॥

প্রেম ও শান্তি* ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"তুমি আমায় চাও, না—তোমার ভগবান্‌কে চাও ?"

"কি বলিব ?"

"সত্য যা, তাই বল।"

"আমি দুই-ই চাই।"

"তা হয় না, প্রিয়তম !"

"কেন হয় না প্রিয়তমে ? তুমি করিলে সকলই মানাইয়া লইতে পার। আমার মাথা খাও মোহিনি—আর আমাকে লইয়া খেলাইও না।"

---

* রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় প্রণীত ধর্ম্মভাবপূর্ণ নূতন উপন্যাস। পুস্তক অতি সত্বরই প্রকাশিত হইবে। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র। মজিলপুর, ২৪ পরগণা, গ্রন্থকারের নিকট অথবা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস বাবুর লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

"আমি খেলাইলাম ? —আমায় এ অন্যায় অপবাদ দিতেছ।"

"অন্যায় নয়, ভাই,—তুমি মনে করিলে সকলই করিতে পার।"

এবার মোহিনী একটু হাসিল। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, "কেবল ধর্ম্ম পারি না।"

"সে আবার কি ?"

"দেখ, এ বৈষয়িক কাজ নয় যে ছুট ফাঁক বাদ দেওয়া চলিবে। এ ধর্ম্মের দোব্,—চুল চিরিয়া এর বিচার হয়।"

এবার কথাটা গিয়া, যুবার মনাণের মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল,—"এ ধর্ম্মের দোব্,—চুল চিরিয়া এর বিচার হয়।" সুতরাং তিনি নিরুত্তর,—অধোবদনে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন মাত্র।

মোহিনী আবার বলিল, "যদি আমায় না চাও, আর আমার কাছে আসিও না,—আমার গায়ের বাতাস লইও না,—রমণীর রূপের চিন্তা অবধি করিও না,—তোমার ভগবান্‌কে লইয়া থাক।"

"কিন্তু—"

"না ভাই, এর আর 'কিন্তু টিন্তু' নাই। যে দিক্ হোক, এক দিক্ ধরো,—দু নৌকয় পা দিয়ে কোন কাজ হয় না।"

সাক্ষাৎ মায়া-রঙ্গিণী,—ভোগ ও লালসার মূর্ত্তিমতী ছবি,—নীটোল যৌবনের রূপের তরঙ্গ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তর তর বেগে বহিতেছে,—ঈষৎ কম্পিত অধরে হাস্য মাধুরী থাকিয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে,—চকিতচঞ্চল দুটি চক্ষে কাম-কটাক্ষ যেন অবিচ্ছিন্নরূপে মিশিয়াই রহিয়াছে,—সেই প্রবৃত্তি-ক্ষুধার অতি উপাদেয় খাদ্য—যেরূপ উপযাচিকা হইয়া হাসি হাসি মুখে কথা পাড়িল, যে ভাবে মধুরতম 'ভাই' সম্বোধন করিল, তাহাতে ক্ষুধাতুর রূপের কাঙ্গাল—পরন্তু প্রবল ঈশ্বরবিশ্বাসী কর্ম্মফলবাদী যুবক—কি উত্তর দিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাই 'কিন্তু' বলিয়া, কি উত্তর দিতে যাইয়া বাধা পাইল। যে বাধা পাইল, ভাবিয়া দেখিল, তাহাও ঠিক। পরন্তু মন তাহাতে প্রবোধ মানিল না। তাই আবার কিছুক্ষণ তর্ক বা কথা-কাটাকাটি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

যুবক বলিল, "যদি পরকাল না থাকিত,—এইখানেই এ জীবন শেষ হইত, তাহা হইলে মোহিনী, তোমায় বুকে লইয়া, সংসারে নন্দন-কানন রচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু—"

এবার মোহিনী বা সেই মায়াবিনী—পরিধেয় সূক্ষ্ম বসনাঞ্চল—অকারণে

শূন্যে একটু দোলাইল, তারপর যেন অসাবধানে বুকের বসন একটু সরিয়া পড়িল—এইরূপ ভাণ করিয়া—তখনি আবার তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া কহিল, 'যদি', 'যেমন', 'কিন্তু'—এ সব লইয়া কি প্রেম হয় প্রাণাধিক?"

আবার সেই প্রাণ-মাতানো মধুর হাসি, এবং সেই হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার যেন অসাবধানে বক্ষের বসন ঈষৎ স্খলিত হওন।—এবার আবার কবরীভ্রষ্ট সুচিক্কণ সুদীর্ঘ কেশদাম—সহসা পৃষ্ঠদেশে এলাইয়া পড়িল।—অপরূপ শোভা হইল।

মন্ত্রমুগ্ধ যুবক ভাবিল, "আ মরি মরি! কোন্ চিত্রকর এ চিত্র আঁকিল রে!—এই-ই স্বর্গের ছবি, আবার এই-ই নরক-দ্বার! এই-ই সঞ্জীবন-সুধা, আবার এই-ই বিষবল্লরী!—ভগবান্, তোমার এ সৃষ্টি কি? হায়, রমণীর রূপ! এত রূপেও তুমি মানুষকে মজাও!"

ব্যক্ত প্রেমের অভিনয়। এবার আর সে গুপ্তপ্রেমের নায়ক নায়িকা 'অতুল' বা 'সুন্দরী' নয়,—এবার সব খোলাখুলি, সবই স্পষ্টাস্পষ্টি।—মোহিনী হাসিয়া বলিল, "কি ভাবিতেছ? যা হোক্ একটা উত্তর দাও?—আমিও সরিয়া পড়ি,—তুমিও তোমার পথ দেখ।"

মন্মথ একটা গভীর মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি বলিব?"

অম্লানবদনে পাপিষ্ঠা মোহিনী বলিল, "যদি আমায় চাও,—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ইহকাল, পরকাল, সমাজ, সংসার—সকলই বিস্মৃত হও। তোমার ভগবান্‌কেও কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর।"

যুবক কি ভাবিল। একটু দৃঢ়তার সহিত কহিল,—"না, তা পারিব না। জীবনে যখন একবার সে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছি,—তখন কিছুতেই তাহা পারিব না।"

মোহিনী। পারিবে না? তবে, আমি যাই? আমার আশা চিরদিনের মত ত্যাগ কর?

মন্মথ। না, তাও ত্যাগ করিতে পারিব না—তুমিই আমার অমৃত, তুমিই আমার বিষ! তুমিই আমার সাধনা, তুমিই আমার সিদ্ধি!—তোমার ঐ জ্যোতির্ম্ময় রূপের ভিতর দিয়া আমি সেই অনন্ত রূপসাগরে মিশিব।

মোহিনী। যদি এতই জানো, তবে আবার মাঝে মাঝে ঢং কর কেন? আধ্যাত্মিকতা আনিয়া, ভক্তির প্রসঙ্গ তুলিয়া, হাবুডুবু খাও কেন?

মন্মথ। কেন,—তোমায় কি বলিব মোহিনী? তুমি ত কখন রূপের

মন্দিরে আপনার আরাধ্য দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত কর নাই? তুমি ত আজীবন রূপের তপস্যা করিয়া, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে, সেই সর্ব্বরূপের আকর—সেই পরমপুরুষের সত্তা—চকিতের মত একবার—একবার মাত্র হৃদয়ে উপলব্ধি কর নাই? যদি তা করিতে, ত বুঝিতে, কি বিষম জ্বলন্ত আগুনে আমি দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছি!—হায়। সেই রূপ—কখন জননীরূপে, কখন জায়ারূপে, কখন কন্যারূপে,—আমার মানস-চক্ষে ভাসমান। কিন্তু তাহা ঐ কল্পনা পর্য্যন্ত। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ভূত—আমার জীবনসর্ব্বস্ব তুমি,—হে চিরবাঞ্ছিতে পরকীয়া প্রেমরূপা কামিনি,—তোমার এই অপরূপ রূপ আমার অন্তরের অন্তরে চিত্রিত!—জাননা প্রাণাধিকে, আমার প্রাণে তাহা কি তুমুল সংগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছে! মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছি. পিপাসায় বুকের কলিজা ফাটিয়া যাইতেছে,—বাঞ্ছিত সুধা তুমি সম্মুখে,—হায়। তোমায় গ্রহণেও সাহসী হইতেছি না। এক হাত অগ্রসর হই, ত কে পাঁচ হাত অন্তরে লইয়া যায়!—হায়। কে আমায় এ সমস্যা বুঝাইবে? কে আমায় প্রকৃতিস্থ করিবে? কে আমার জীবনে শান্তি দিবে?

কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া এবার মোহিনী উত্তর দিল,—"সচ্চরিত্র ধনীর সন্তান,—সাধু যুবক! মনে মনে আপন চরিত্রের বড়ায়েই গেলে!—তোমার ভগবান্ আছেন, ধর্ম্ম আছেন, পরকাল আছে,—এ দুঃখিনী বাল-বিধবার এ সব কিছুই নাই—কেমন? সংগ্রাম তুমি একাই করিতেছ,—মনে মনে ক্ষতবিক্ষত তুমি একাই হইতেছ—কি বলো? কতকগুলা কথা শিখিয়া রাখিয়াছ বৈত না?—তাই মনের আবেগ আসিলে যা খুসী বলিয়া ফেল।—আমাকেই বা তুমি কি মনে কর? সত্যই কি আমি কলঙ্কিনী? আমিও কি সৎপথে চলিতে, এ দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে চেষ্টা পাই না—ভাবো? খুবই চেষ্টা পাই,—খুবই কাঁদি। হায়! কি জানিবে তুমি—সৌভাগ্যক্রোড়ে প্রতিপালিত নবীন যুবক?—বয়সেও আমি তোমার তিন বৎসরের বড়,—কত উপদেশ শুনিয়াছি, কত ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াছি, কত সাধ্বীর চরিত্র আলোচনা করিয়াছি;—কিন্তু কৈ, সংস্কার দূর হইল কোথায়? জানো কি তুমি মন্মথ,—তোমার হাত এড়াইবার জন্য—কতবার আমি জলে ঝাঁপ দিতে গিয়াছি,—আগুনে পড়িতে গিয়াছি,—বিষ খাইতে উদ্যত হইয়াছি! কিন্তু হায়! কেন জানি না, তোমার মুখ মনে পড়িলে,—আমার আর মরা হয় না;—এ দুর্ব্বহ দেহ-ভার বহিতে আবার সাধ যায়! তাই আবার এ

দেঁতো। হাসি হাসিয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াই!—কিন্তু আর না,—আর আমি তোমার সম্মুখে আসিয়া তোমার পথের কণ্টক হইব না। এই শেষ বিদায়।' তুমি সুখে থাকো,—আমারও নারী-ধর্ম্ম রক্ষা হোক।"

মন্মথ। "আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, তাই হোক।—কিন্তু এ কি! তুমি কাঁদিতেছ? কাঁদিয়া আমার বুকে, কেন শেলনিক্ষেপ কর প্রাণাধিকে? কৈ, আমি ত তোমায় এমন রূঢ় বাক্য কিছু বলি নাই? যাই হোক, মনের অধীরতায় যদিই কোন দুর্ব্বাক্য মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে,—আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার চিরস্নেহপ্রার্থী অভাগা বাল্যসখা জানিও।

মনে মনে বলিল, "ইহারই নাম মায়ার খেলা;—এই-ই দৈবী মায়া!—হায় মায়ারূপিণী রমণী!"

আবার পরস্পরের সজলনয়নে পরস্পরকে দর্শন। আবার ক্ষুধিত, তৃষিত, চিরপ্রার্থিত, অপূর্ণ প্রেমের নীরব আকিঞ্চন। স্থান—সহরের সন্নিকট একটি ক্ষুদ্র পল্লী,—সেই পল্লীস্থ একটি নির্জ্জন পুষ্পোদ্যান। সময়—মধুর অপরাহ্ন। ঝির্ ঝির্ করিয়া মধুর বাতাস বহিতেছে। মনের সুখে পিক কুহুরব করিতেছে। পুষ্পগন্ধে দিক আমোদিত হইয়াছে।

নায়ক-নায়িকার বুক দুরু-দুরু কাঁপিতে লাগিল। মনের মধ্যে হিয়ায় হিয়ায় স্পর্শ হইল। উভয়ের অধর সুধাপানে উভয়েই লোলুপ হইল।—আর কেহ কোথাও নাই।

কিন্তু তখনই আবার সেই অনন্ত রূপময়ের রূপ, সেই প্রেমময়ের মুখ,—সেই ধর্ম্মের কঠোর অনুশাসন—মনে পড়িল। মন্মথ ভাবিল, "যদি একবার ডুবি,—আর উঠিতে পারিব না। কে জানে, এই পতন—শেষপতন হইবে কিনা?"

মোহিনী পোড়ারমুখী ভাবিল, "যেদিন ইচ্ছা, ত বিষপান করিতে পারিব—দেখি মন্মথ কতদূর অগ্রসর হয়!"

এমন সময় দূরে কে গান গাহিল। বড় মধুর, বড় পবিত্র কণ্ঠে, বড় পবিত্র গান গাহিল,—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

গান শুনিয়া, গানের এই একটি মাত্র চরণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যুবকের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সেই রোমাঞ্চিত দেহে, আর্দ্রহৃদয়ে তিনি আপনা আপনি বলিলেন, "হায়! কোথায় সেই অনন্তের বিশ্ববিমোহন রূপ,

আর কোথায় এই ক্ষুদ্র নারীর পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর সৌন্দর্য্য! আবার দুদিন পরে ইহার পরিণাম—চিতাভস্মরাশি! তবে এ মোহ কেন?"

গায়ক গাহিতে লাগিল,—

"সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।"

যুবক ভাবিলেন, "সত্য, কোথায় সেই অমিয়স্বর, আর কোথায় এই বায়সীর কণ্ঠ। না, আর আমি এ মোহে মজিব না;—আজ হইতে সেই অনন্ত রূপময়ের রূপ হৃদয়ে ধারণা করিতে চেষ্টা পাইব।"

গায়ক অলক্ষ্যে থাকিয়া পুনরায় আপন সুধাবর্ষী কণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

"কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব—কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥"

অশ্রুসিক্ত মুখে, করুণকণ্ঠে, যুবক বলিলেন, "সত্য, লাখের মধ্যে এমন একজনও ভাগ্যবান্ দেখি না, যে—ভগবানের সহিত বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়;—আর মূর্খ আমি,—এই নারীর পঙ্কিল প্রেম রসে পরিতৃপ্ত হইবার কামনা করিতেছি!—হায় আশা-মরীচিকা!"

সেই নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে নবীন যুবক মন্মথ, মন্মথ-শরে বিদ্ধ হইলেও সে বাণ উন্মোচনে সচেষ্ট;—এই ভক্তিরসাশ্রিত গান শুনিয়া বুকে যেন কিছু বল পাইল। ধীরভাবে নায়িকাকে কহিল, "কেমন মোহিনি, এই কি না?"

বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিণী—লালসাবিহ্বলা কুহকিনী—সে কথার স্পষ্ট কোন উত্তর দিল না,—একটি তপ্তশ্বাস ফেলিয়া, ভূমিপানে মুখ নত করিয়া কহিল, "এখন তবে তুমি কি বলিতে চাও?"

মন্মথ মনে মনে বলিল, "বটে, এতদূর? উঃ! কি কঠিনহৃদয়া রাক্ষসী! কি কুহকজালেই আমি পড়িয়াছি! এমন পবিত্র প্রেমপূর্ণ পারমার্থিক গানেও একটু দ্রব হইল না?"

নায়ককে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া পাপিষ্ঠা শ্লেষবাক্যে কহিল,—"একি! কোন বৈষ্ণবভিখারীর মুখে একটা গান শুনিয়া, 'ভাব' আসিল নাকি? কৈ, আমার কথার ত কোন উত্তর দিলে না?"

মন্মথ প্রকৃতই অন্তরে একটা আঘাত পাইল। ভাবিল, "একি প্রেম, না—প্রেমের বীভৎস অভিনয়?—ওঃ! অবিদ্যারূপিণী পরমেশ্বরি!"

যুবক গভীর এক নিশ্বাস ফেলিল। হৃদয়ের কাতরতায়,—রোমাঞ্চিত দেহে, সজলনয়নে আপনা আপনি কহিল, "মায়াময়ী প্রকৃতি! মা আমার! তোমার অবিদ্যা বা মায়ার অনন্ত দ্বার,—দোহাই মহামায়ে! আমাকে আর কোন দ্বার দিয়া পরীক্ষা কর;—এ দ্বার চিররুদ্ধ করিয়া দাও!—এ কাল ভুজঙ্গীর করাল দংশন হোতে সন্তানকে রক্ষা কর। আমি তোমার শরণাগত,—আমায় ত্রাণ কর জননি!"

নায়ককে তখনো নিরুত্তর অথচ কিছু উন্মনা থাকিতে দেখিয়া—নায়িকা পুনরায় বলিল, "এখন তবে তুমি কি চাও?—কোন্ পথ ধরিবে?"

এবার যুবক দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল,—"আমি ভগবানকে চাই,—তাঁর ভক্তি-পথ ধরিব;—তুমি দূর হও।"

মন্মথ অতি উপেক্ষা ও ঘৃণাভরে—বেগে সে স্থান ত্যাগ করিল।

পাপিষ্ঠা তাহা গায়ে না মাখিয়া, হাসিতে হাসিতে আপন মনে কহিল, "ও রাগ বেশীক্ষণ নয়। আবার আসিয়া আমায় সাধিতে হইবে,—আবার আমার জন্য পাগল হইতে হইবে।—পরাণ-বঁধু, অমন আমি তোমার ঢের দেখ্‌লাম!"

মন্মথ দ্রুত পাদবিক্ষেপে সে পাপস্থান—স্বকর্ম্মার্জ্জিত আপন স্থান ত্যাগ করিয়া—একেবারে সেই অনির্দ্দিষ্ট ভক্তিপ্রাণ গায়কের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, গায়ক তাঁহার পরিচিত একটি পাগল। লোকে তাহাকে রামা পাগ্‌লা বলিয়া জানে।

(ক্রমশঃ)

ভক্তবর মনোমোহন

উজলি পবিত্র বংশ কায়স্থ-কেশরী,
রামকৃষ্ণ-যুগে জন্ম রামকৃষ্ণ-সাথী।

---

* সন ১৩০৯ সালে, ১৩ই মাঘ, শুক্রবার বেলা ১১টার সময় ৫২ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ-ভক্ত মনোমোহন মিত্র মহাশয় দেহত্যাগ করেন; তাঁহারই উদ্দেশে এই কবিতাটী লিখিত হইল।

'ভুবনমোহন'—পিতা, মা—'শ্যামা-সুন্দরী'—
অনুপমা নারীমাঝে মহাভাগ্যবতী ॥
প্লাবিতা ধরণীজলে নেহারি স্বপনে,
রামকৃষ্ণপদে আসি লইল শরণ।
অচলা ভকতি প্রীতি ও রাঙ্গা-চরণে
উপজিল অকপট বিশ্বাস-রতন ॥
নির্লিপ্ত সংসারী সাজে গুরু-কাযে মন,
পুত্র কন্যা মৃত্যুমুখে তুচ্ছ সে সকল।
মায়া অধিকার তা'য় ছিলনা কখন,
কীর্ত্তনে আবেশ ভোরা অঙ্গ চল চল ॥
কলির কলুষ মাখা এ মর ভুবন—
ত্যজি কি প্রেমিছ ভক্ত। শ্রীগুরু চরণ ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

কাঞ্চন।

অহো মহা কাল-ফণী বিত্ত এ সংসারে।
যার মুখে অহর্নিশি গরল উগরে ॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করে পরস্পর।
ছলনা চাতুরী যার নিত্য সহচর ॥
পুত্র বধে পিতায়, পিতায় পুত্র ছাড়ে।
দম্পতীর প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করে ॥
নররক্তে কলঙ্কিত করে চরাচর।
ভীষণ সমর-রোলে স্তব্ধ দিগন্তর ॥
যাহার সম্মোহ বাণে পতিপরায়ণা।
হয়ে কুলকলঙ্কিনী সাজে বারাঙ্গণা ॥
নিয়ত চঞ্চল চিত্ত যাহার সেবক।
যার চিন্তা-দেহ আয়ু নিধন-কারক ॥
বহ্বায়াস-সাধ্য যার অর্জ্জন রক্ষণ।
চঞ্চলার প্রায় যার উত্থান পতন ॥

যে অর্থ-বন্ধন এত অনর্থ কারণ।
জনমে জনমে যাহা জীবের বন্ধন॥
হেন অর্থ প্রতি জীব কেন ধাবমান!
নশ্বর ছাড়িয়ে কর ঈশ্বরে প্রয়াণ॥

দেহ নারী বিত্ত-বাঞ্ছা এ তিন বন্ধন!
বিচারের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে করিয়া ছেদন॥
বিবেক আনন্দ নীরে হও ভাসমান।
ইন্দু দায়ি ইথে না মিলিলে ভগবান॥

শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

বিগত ২রা ভাদ, ১৮ই আগষ্ট, মঙ্গলবার জন্মাষ্টমীর দিন, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়া গিয়াছে। অনেক ভক্ত তৎ-পূর্ব্বদিবস যোগোদ্যানে সমাগত হইয়া শ্রীমন্দিরাদি সজ্জিত করিয়াছিলেন। মন্দিরটী অপূর্ব্ব ও বিচিত্র ভাবে সুশোভিত হইয়াছিল। শ্বেত ও লোহিত পদ্ম-পুষ্পে মন্দিরটী মণ্ডিত হইয়া দর্শকগণের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিতেছিল। মন্দির মধ্যে শ্রীপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি ও বেদি অতি মনোমুগ্ধকর ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল, উহার দর্শনে অতি পাষাণ-হৃদয়ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেছিল। এবারে উৎসব দিবসে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় সর্ব্ব সাধারণের যাতায়াত পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। বেলা ১০টা হইতে শ্রীযুক্ত বারাণসী রায় মহাশয় সসম্প্রদায়ে নাটমন্দিরে কালীকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বেলা ১২টা হইতে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিতে আরম্ভ করেন, রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিয়াছিলেন। অনুমান ৫০।৬০টী দল উপস্থিত হইয়াছিলেন। অসংখ্য দর্শকমণ্ডলী সমবেত হইয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে দিকসমূহ কম্পিত করিতেছিলেন। সেই বিস্তৃত জনসঙ্ঘ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল যে, ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রভাব চিরদিনই জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রায় দশ সহস্র লোক এই উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। সেবকমণ্ডলী সকলেরই সেবা করিতে যত্নবান ছিলেন, তত্রাচ যদ্যপি তাঁহাদের কোনওরূপ ত্রুটি

ঘটিয়া থাকে, তাহা সাধারণের মার্জ্জনীয়। নিম্নে উৎসবের কয়েকটী গীত প্রকাশিত হইল।

গীত।

(১)

মহা মহোৎসবে, মাতি আজি সবে, (প্রেমে) বদনে বল রামকৃষ্ণ জয়।
সাধন ভজন, বিহীন যে জন, অভয় শ্রীপদে লও আশ্রয়॥
(ভব ভয় রবে না)
মোহন বেদি'পরে, প্রভু বিরাজ করে,
(ফুল্ল ফুলহারে কিবা শোভা ধরে)
(ভবে এ রূপের তুলনা নাইরে)
ও রূপ দরশনে প্রেম ভকতি উদয়॥
(চিত্ত বিমোহন) (পূর্ণ জ্যোতিঘন) (চিদানন্দময়)
পূর্ণানন্দ স্থান, ধরায় যোগোদ্যান, গোলোক সম প্রভু নিত্য অধিষ্ঠান,
(কলির জীবের তরে হেন তীর্থ নাহি আর)
(হেথা প্রেমদাতা প্রেম বিলায় অনিবার)
বিচিত্র এ লীলা, শুধু প্রেম খেলা, চৈতন্য বিকাশে আনন্দময়॥
(তরুলতা আদি)
বাজ্‌লো নামের ডঙ্কা, ঘুচলো শমন শঙ্কা,
(তোরা আয়রে সবে ত্বরায় ছুটে)
(তোদের ভববন্ধন যাবে টুটে)
(শুন গগনভেদী জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনি)
(সেবক রামচন্দ্রের অভয়-বাণী)
নামে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুনিশ্চয়॥
(দয়াল নামের গুণে) (মধুর নামের গুণে) (রামকৃষ্ণ নামে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত—সেবকমণ্ডলী॥

---

(২)

বাউলের সুর।

রামকৃষ্ণ নাম গাওরে মনের হরিষে।
(ও মন) ঘুচবে জ্বালা, হবি ভোলা, থাকবি না আর বিরসে॥

ভাবনা যে রে সমুদ্র বিশেষ,
কূল কিনারা না যায় জানা কোথায় বা তার শেষ,
কাজ কি সে ছাই, এমন বালাই, বিদায় দে না তায় হেসে ॥
তোর ভাবনা ভাব্ছেরে সেই জন,
দিনান্তে যাঁরে রে ডাকিস্ "পতিত-পাবন—
(বোলে) কোথা হে কাঙ্গালের ঠাকুর, দেখা দাও একবার এসে ॥"
অমন প্রেমের ঠাকুর হবেনারে আর,
তোর মন বুঝে রে, ধন যোগায় সে, কিবা চমৎকার—
(তাঁরে) বল্‌তে হয় কি কোন কথা (ভেবে) দেখ দেখি সর্ব্বনেশে ॥
ভাবের ঘরে করিস্ না চুরি,
এইটে তিনি বিশেষ করে করেছেন জারি,
তাতে পদে পদে কি ঝকমারি, জ্বোলতে হয় রিষের বিষে ॥
বকল্‌মা রে দিয়ে তাঁর পায়,
সকল বাঁধন ছিঁড়ে ছুঁড়ে উধাও হয়ে আয়,
তাতে শান্তি পাবি, বেঁচে যাবি, বেড়াবি দেশ বিদেশে ॥
রামকৃষ্ণ আমার গুপ্ত অবতার,
গুপ্ত কথা ব্যক্ত হোলো ইচ্ছাতে তাঁহার,
(আবার) শুন্‌ছি এবার আস্‌বেন তিনি, আরও কাঙ্গালের বেশে ॥
(কাঙ্গাল জীবের উদ্ধার তরে) (পতিত জীবের পারের তরে)
(পাপী তাপীর মুক্তি তরে)

---

(৩)

ভাব জনার্দ্দন, নিত্য নিরঞ্জন, ভবভয়বারণ, কলিকলুষহারী।
পড়িয়ে মায়াজালে, বৈভব জঞ্জালে, উপায় না ভাবিলে, কি হবে তোমারি ॥
সম্পদে বিপদে, রাখ মন তাঁরি পদে, কুচিন্তা রবেনা, দিন যাবে নিরাপদে ॥
তুমি কার, কে তোমার, ভেবে দেখ একবার,
সারাৎসার কর সার, ভবের কাণ্ডারী ॥
সাধন ভজন, নাহি তার প্রয়োজন, রামকৃষ্ণ নাম সার করে যেই জন,
ব্রত যাগ যজ্ঞ, নহে ঐ নামের যোগ্য, লভে চতুর্ব্বর্গ, নামের মহিমা ভারি ॥

নামে পাতকী তরে, পাষাণে জল ঝরে,
শিলা ভাসে সিন্ধু নীরে, মৃত তরু মুঞ্জরে—
নামে কারো নাই মানা, সরলে ডাকো না,
যে বলে রামকৃষ্ণ, বাসনা পূরে তারি ॥

---

(৪)

মঙ্গলময়, করুণানিলয়, রামকৃষ্ণ জয়।
মন মজে নামে রে ভাই, শ্রবণে সুধাধারা বয় ॥
(অধম তারণ নামের গুণে হয়, ঐ নামে সুধা রয়)
(পতিতপাবন রামকৃষ্ণ পতিত তারয়)
ঐ নামের এম্‌নি গুণ (ওরে) ভাই,
ত্রিতাপ শান্তি হয়ে শরীর জুড়াই,
নামের সনে আপনি প্রভু মিলাইয়ে রয় ॥
আয়নারে ভাই পাপী তাপী,
প্রভু ডাকেন উভরায়—
বকল্‌মা দিলে, নেবেন তুলে দয়াময়,
(ও ভাই) কোলে নেবেন, দীক্ষা দেবেন, বকল্‌মায় সবই হয় ॥

---

(৫)

সংসার মায়ায় হয়ে হতজ্ঞান।
আর কত দিন রবে অচেতন ॥
(গেল) বাল্যে ক্রীড়া করি,
যৌবনে লইয়া নারী,
বার্দ্ধক্যে হইলে চিন্তায় মগন ॥
একে একে যায় বয়ে দিন,
কোথা রবে তোর এ সুদিন,
(তোর) আসিবে কুদিন; দিনান্তরে দিন,
কালান্তরে যে দিন কালে করিবে আহ্বান ॥
(শমন ভবন করিতে গমন)

(তুই) কি লইয়া কি বলিয়া পাবি পরিত্রাণ ?
পরিত্রাণের উপায় "রামকৃষ্ণ" নাম বারেক কররে শ্রবণ ॥
এখন আছেরে দিন (কহে সতীশচন্দ্র দীন)
তাঁরে ডাকিতে, ওরে মন ॥

---

(৬)

বিফল জনম, বিফল জীবন,
মম ভবে আশা অকারণ।
(যদিবে না হ'লো রামকৃষ্ণ আরাধন)
(সাধনার ধনে যদি না হ'লো সাধন ॥)
এ ভবে আসিয়ে, মায়ায় মোহিয়ে,
সকলই যে অসার হ'লো,—
বিপাক বিষাদ, সাধে নাহি সাধ
অবসাদে দিন গেল—
তথাপি হ'লোনা, তাঁহারি সাধনা,
থাকি পড়ে মোহে অচেতন ॥
(ঢেকে রাখি শুধু আঁধারে বদন)
(নাহি গতি বিনা পতিতপাবন ॥)

শ্রীকৃষ্ণ-গীতম্।

(১)

নমামি শ্যাম-সুন্দরং।
গোবিন্দং গোকুলচন্দ্রং, নমাম্যহং গিরিধরং ॥
কদম্বতল বিহারং, ভক্তানুকম্পা তৎপরং,
সংসার-ধ্বান্ত সংহারং হরিমীড়ে তং শ্রীধরং।
মুকুন্দং নন্দনন্দনং, মল্লচানুরমর্দ্দনং
সচ্চিদানন্দবিগ্রহং তং ভজে ভুবনেশ্বরং।
ব্রজেশং ব্রজ-বালকং, যশোদানন্দদায়কং,
যজ্ঞেশং যজ্ঞ-নায়কং তং বন্দে জগদীশ্বরং।

জলধরং পীতাম্বরং, মোহনমুরলীকরং
বনমালা-শোভিতং তং ভজে শিখিপুচ্ছচূড়ং।
নব রসিক নাগরং, অপার রস-সাগরং,
নমাম্যহং নটবরং শ্রীরাসমণ্ডলেশ্বরং।
রাধয়া সহ শ্রীনাথঃ, গোপীশ্বরঃ বিশ্বনাথঃ,
বিরাজিতো ভোলানাথ-হৃদম্ভোজে অহর্নিশং।

---

(২)

হে জীব! চিন্তয় শ্রীকৃষ্ণ-পাদং।
যদিত্বং বাঞ্ছস্যচিরাৎ পরাৎপরং ব্রহ্মপদং॥
য হরি-পদানুরক্তঃ, তং দ্রষ্টুং ন কালঃ শক্তঃ,
যেন হরিঃ স্বভক্তস্য করতলে চতুর্ব্বর্গং।
শ্রীকৃষ্ণং যশ্চিন্তয়তি, বিপৎসু স ন পততি,
ন জাতঃ সঃ পুনরপি, সত্যং স জয়তি সত্যং।
শৃণু ভোলানাথস্যেদং, জীবশিবদং বচনং,
জপ সদা হরের্নাম, লপসে হরেশ্চরণং॥

---

(৩)

ভো ভববন্ধো বিষ্ণো তে পদারবিন্দে বন্দেঽহম্।
ত্রিলোকেশ ক্লেশহারিন্ শময় ক্লেশমশেষম্॥
ঘোরাজ্ঞানমপনয়, চঞ্চলচিত্তম্ দময়,
শ্রীপতে নাথ নাশয় তপন-তনয়-ত্রাসম্।
হর মে দুষ্কৃত-ভারম্, দূরীকুরু ভব-রোগম্,
ক্ষমস্ব ভোঃ কৃপাসিন্ধো ভোলানাথস্যাপরাধম্।
হরে ভব-সাগরতঃ, তারয় মাং জগৎ-পিতঃ,
দেহি মে প্রভো ত্বদীয় চরণ-সরোজাশ্রয়ম্॥

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০১ পৃষ্ঠার পর)

৩০১। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্ন স্বভাব। তমোগুণীর লক্ষণ—অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ, এই সব। রজোগুণীরা বেশী কাজ জড়ায়; কাপড় পোষাক ফিট্‌ফাট্, বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় কুইনের ছবি, যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তখন চেলী, গরদ পরে; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটী একটী সোণার দানা, যদি কেউ ঠাকুর বাড়ী দেখতে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায়, আর বলে, এদিকে আসুন, আরো আছে, শ্বেত পাথরের, মার্ব্বেল পাথরের মেজে আছে, ষোল ফোকর নাটমন্দির আছে। আবার দান করে লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট শান্ত, কাপড় যা তা; রোজগার পেটচলা পর্য্যন্ত; কখনও লোকের তোষামোদ করে ধন লয় না, বাড়ী মেরামত নাই, ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না, মান সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না; ঈশ্বর চিন্তা, দান, ধ্যান, সমস্ত গোপনে—লোকে টের্ পায় না; মশারির ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্চেন। সত্ত্বগুণ সিড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই, ঈশ্বর লাভের আর দেরী হয়না—আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে।

৩০২। নিত্যজীবেরা নায়েবের স্বরূপ; একটা তালুক শাসন ক'রে আর একটা তালুক শাসন করতে যায়।

৩০৩। বদ্ধ জীব—সংসারী জীব—হরিকথা সম্মুখে হ'লে সেখান থেকে চলে যায়, বলে—হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন? যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা করবার অবসর পায় না, কেবল পরিবারদের পুঁটলি বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব, নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে, আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল ব'লে উড়িয়ে দেয়।

৩০৪। সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে কি হবে! সংসার আসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা দেয়। কত আবল তাবল বকে, হয়ত বিকারের খেয়ালে, হলুদ পাঁচফোড়ন তেজপাত বলে চেঁচিয়ে উঠলো। শুকপাখী সহজ বেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধরলে নিজের বুলি বেরোয়, ক্যাঁ ক্যাঁ করে।

৩০৫। গীতায় আছে, মৃত্যুকালে যা মনে করবে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ হরিণ করে দেহত্যাগ করেছিল, তাই হরিণ জন্ম হোলো। ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।

৩০৬। হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে আবার সে ধুলা কাদা মাখে, তবে তাকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, তা হ'লে আর ধুলা কাদা মাখতে পারে না। জীবের মন মত্তকরী—এই ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়, কিন্তু যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা হলে শুদ্ধ মন হয়, আর সে মন কামিনী কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

৩০৭। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, আগে থাকতেই তার উপায় করতে হয়। উপায় অভ্যাস যোগ। ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে।

৩০৮। যে নিরহঙ্কার—তারই জ্ঞান হয়, নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়। অহঙ্কারীর জ্ঞানও হয় না, মুক্তিও হয় না।

৩০৯। এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র এই ভবসাগরের কাণ্ডারী।

৩১০। মা মা ব'লে প্রার্থনা করা খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী, মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর জোর চলে না।

৩১১। অধর্ম্ম কিনা অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কিনা বৈধী কর্ম্ম—এতো দান করতে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম।

৩১২। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে—শুদ্ধাভক্তি, অমলা নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি বাকী থাকে।

৩১৩। যতক্ষণ আমি আছে, যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে।

৩১৪। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো, আর কাঁদো। এইরূপে চিত্ত শুদ্ধি হয়ে যাবে। তখন নির্ম্মল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। ভক্তের 'আমি'রূপ আর্সিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন করবে। কিন্তু আর্সি খুব পোঁছা চাই, ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না।

৩১৫। তিনি অন্তর্য্যামী, তাঁকে সরল মনে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে, তাঁর শরণাগত হও, সব পাবে।

৩১৬। যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে; মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখবে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান'—এই বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা করোনা। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে, যতদূর পার। আর ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ করবে। রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন সব গরু মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়—এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক হয়ে যায়—নিজের ঘরে আপনাতে আপনি থাকে।

৩১৭। অর্থ যার দাস সেই মানুষ। যাঁরা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। মানুষের আকৃতি কিন্তু পশুর ব্যবহার।

৩১৮। সংসার করতে গেলেই সুখ দুঃখ আছে, তবে ঈশ্বরীয় কথা শুনলে ও আলাপ করলে, মনে শান্তি হয়।

৩১৯। ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল

থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে, তেমন মাছ হলে দল তোলপাড় করে। তাই ভাবে—হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।

৩২০। কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়। পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না—কর্ম্ম না করলে ভক্তিলাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান জপ এই সব কর্ম্ম, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তনও কর্ম্ম, দান যজ্ঞ এই সবও কর্ম্ম।

৩২১। "ঈশ্বর আছেন" বলে বসে থাকলে কি হবে? পুকুরের পাড়ে বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চারা করো, চার ফেলো, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে—তখন আনন্দ হবে। যখন দেখা যাবে, তখন আরো আনন্দ।

৩২২। মন থেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না।

৩২৩। ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে এই বলে কাঁদে—"কাঁহা এ," "কাহা এ,"—কোথায় এলুম। ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করছিলুম, এ আবার কোথায় এলুম।

৩২৪। সংসারে থাকো, ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। ঝড়ের এঁটো পাতাকে কখন ঘরের ভিতর নিয়ে যায়, কখনও আস্তাকুঁড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখন মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, ভাল, এখন সেইখানেই থাকো, আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে। সংসারে রেখেছেন, তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর, তাঁকে আত্ম-সমর্পণ করো—তা হলে আর কোনও গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন। সবই "রামের ইচ্ছা।"

৩২৫। তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয় বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাকো, জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হয়ে সংসারে ছিল।

৩২৬। যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার করো, আর "স্বপ্নবৎ" বল, তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে ঘুরে একটুখানি থাকবেই। একটু মুষল ব্যানা বনে পড়েছিল, তাতেই "মুষলং কুলনাশনং।

৩২৭। শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্ব্বদা যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেমভক্তি হয়, সে প্রেমভক্তি যাবার নয়। জ্ঞান বিচারের পর এই প্রেমভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হু হু করে বেড়ে যায়। যদুবংশ ধ্বংশ করেছিল—মুষল, তারই মত।

৩২৮। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আনতে পারেন ও আনেন।

৩২৯। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই, প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। দেখ, গরুর শিংটা যদি ছোঁও, গরুকেই ছোঁয়া হোলো, পাটা বা ল্যাজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হোলো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্চে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

৩৩০। ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর, সব ধারণা করবার কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হলো। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হোলো। গঙ্গাজল যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। তোমার পাটা যদি ছুঁই, তা হলে তোমায় ছোঁয়াই হ'লো। যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, তা হলে সাগর স্পর্শ করাই হোলো।

৩৩১। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে, মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে ঊর্জ্জিতা ভক্তি—প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

৩৩২। তিনি ত আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ, কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।

৩৩৩। মুখ-হলসা, ভেতর বুঁদে, কানতুলসে, দীঘল্ ঘোমটা নারী।
পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী॥

এই কটী লোকের কাছে সাবধান হবে,—প্রথম মুখ হল্‌সা, যে খুব বেশী কথা কয়; তারপর ভেতর বুঁদে, মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না; তারপর কান তুলসে, কানে তুলসী দেয়—ভক্তি জানাবার জন্য; দীঘল্ ঘোমটা নারী—লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারী সতী, কিন্তু তা নয়; আর পানা পুকুরের জল—নাইলেই সান্নিপাতিক হয়।

৩৩৪। অন্নচিন্তা চমৎকারা; কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা॥

৩৩৫। বই, শাস্ত্র, এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ জেনে লওয়ার পর আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়। একজন একখান চিঠি পেয়েছিল, কুটুমবাড়ী তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ খুঁজে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন কর্ত্তা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই—পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, আর একখান কাপড় পাঠাইবে, আর কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের এবং অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তারপরই পাবার চেষ্টা।

৩৩৬। চৈতন্য লাভ করলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।

৩৩৭। যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু'মণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে। মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না।

৩৩৮। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই! পানকৌটী জলে সর্ব্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকেনা।

৩৩৯। সংসার আশ্রমের জ্ঞানী, আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুইই এক জিনিস। এটীও জ্ঞান, উটীও জ্ঞান—এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হওনা কেন, কালদাগ একটু না একটু গায়ে লাগবে। মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়ীতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি, ঘোলের হাঁড়ীতে রাখ, তা হ'লে সন্দেহ হয়।

৩৪০। খই যখন ভাজা হয়, দু'চারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ করে লাফিয়ে পড়ে। সে গুলি যেন মল্লিকাফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞান লাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকে ফুলের মত দাগ শূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লালচে দাগ হোতে পারে।

৩৪১। যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

৩৪২। পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়, তখন স্ত্রী পুরুষ বলে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

৩৪৩। ভক্তি মেয়ে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়। ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান—সূর্য্য।

৩৪৪। চার পাঁচজনের জ্ঞান হয়না। যার বিদ্যের অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটী সাধু আছে, দেখতে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর ক'রে বলে, "যাব না।" আর মনে মনে বলে, 'আমি এত বড় লোক, আমি যাব?'

৩৪৫। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হলে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না।

৩৪৬। জ্ঞানীরা বলে আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার; আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে। আবার যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম গুণ গান করতে ভাল লাগে, তা হলে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না; রিপুবশ আপনাপনি হয়ে যায়।

৩৪৭। সত্ত্ব না হ'লে, ঈশ্বরে চট্ করে বিশ্বাস হয় না। বিষয় বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয় বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব।

৩৪৮। বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন "ও তোর দাদা" বালকের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা

দাদা। মা বলেছেন "জুজু আছে" ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

৩৪৯। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ কত্তে হয়। শুধু শুনলে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কটকেনা কত্তে হবে, পথ্যের দরকার।

৩৫০। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত দেখবে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান, যেমন আচার তেঁতুল। মনে কল্লে, মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আন্‌তে হয় না।

৩৫১। একটী আছে—অহৈতুকী ভক্তি। এটী যদি হয়, তা হলে খুব ভাল। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে—"হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহ সুখ, এ সব কিছুই চাই না। এই কর, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।"

(ক্রমশঃ)

প্রেম ও শান্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১৩ পৃষ্ঠার পর)

সেই রামা পাগ্‌লা, অথবা রামব্রহ্ম ঠাকুর—তাঁহাকে দেখিয়াই—উচ্চ মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কি গো বাবু মশাই, পালাইয়া আসিলে কেন?—দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদটা একটু নিলে হতো না?"

যুবকের বুকটা যেন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—"এ পাগল আমার গুপ্ত প্রণয়ালাপের বিষয় জানিতে পারিল নাকি? তাই বা বলি কিরূপে? বাগানের ফটক-দ্বার ত বন্ধই আছে?"

---

* শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত সুকবি রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের ধর্ম্মভাবপরিপূর্ণ নূতন উপন্যাস। পুস্তকের আয়তন বৃহৎ হইলেও লেখক তাঁহার প্রাণের দেবতার প্রচার উদ্দেশ্যে নাম মাত্র মূল্য ৸৹ বার আনা ধার্য্য করিয়াছেন। পুস্তকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে। মজিলপুর, ২৪ পরগণা, গ্রন্থকারের নিকট, অথবা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস বাবুর লাইব্রেরীতে পুস্তক পাওয়া যায়।

পাগল হেঁয়ালি ছন্দে বল্লিল,—

"ডুবে ডুবে জল খাওয়ার মন্তোর জানি আমি।
সব্বাইকে ভাবো বোকা—বড় শিয়ানা তুমি॥

—কেমন, না?"

যুবক চমকিত, ভীত, একটু সন্ত্রস্ত,—"হায়! এ পাগল বলে কি? না, বোধ হয় খেয়াল—আর কিছু উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে।"

পাগল আবার বলিল,

"যা ভাবচ তা নয় গো বাবু,
যা ভাবচ তা নয়।
মৃগনাভির গন্ধ এ যে—
আপনা হোতে বয়॥"

যুবক নির্ব্বাক্‌ বিস্মিত হইয়া পাগলের পানে চাহিয়া রহিল।

পাগল এবার একটু নাচিতে নাচিতে, হাতে তালি দিতে দিতে কহিল,

"বলিহারি পিরীতি তুই চোকে মুখে আঁকা।
নায়ক নায়িকা তোরে সদা রাখে ঢাকা॥
ঢাকিলে কি হবে রে ভাই, তুই যে পরশ-মণি।
যে ছুঁয়েছে সে মজেছে, (যেমন) মন্মথ-মোহিনী॥

—মনের কথা বোলে ফেল্লুম—দ্দুয়ো!"

যুবক। (স্বগত) আর আত্মগোপন বৃথা—একে ধরা দেই। পাগল বটে, কিন্তু বড় সহৃদয়। আহা, কি করুণ দৃষ্টি!

পাগল।—"এখন কি দেবে—তা দাও,
নইলে, হাটের মাঝে ভাঙ্‌বো হাঁড়ী,
(একবার) মুখ তুলে চাও।

—ওকি! অমন কোরে রইলে যে? একবার আমার পানে ভাল কোরে চেয়ে দেখ?"

যুবক। রাম, "তোমার গলাটি বড় মিষ্ট,—পাষাণ দ্রবীভূত হয়।"

"বাঃ, বাঃ, বাঃ!—কি কথার কেরামতি রে! ধাঁ কোরে আসল বিষয়টা চাপা দিচ্ছ? আমার গলা মিষ্টি হোক আর তিত হোক্‌, সে জন্যে তো তোমার বড় বোয়ে গেল!"

"না, সত্যি বোল্‌চি, বড় মিষ্ট।"

"সত্যের জ্ঞান তোমার কতদূর টন্‌টোনে, তাতো তুমি নিজেই জানো? কেন আর মনকে চোখ ঠেরে 'ভাবের ঘরে চুরি' করো?"

"তুমি আমায় চোর বোল্লে?"

"চোর—বিষম চোর! বিষয়ী লোক মাত্রেই চোর!—কেন তুমি ঐ অবলার ধর্ম্মনষ্ট কোত্তে জাল পেতেছ? পেটের দায়ে ঘটীবাটী-চোর কি তোমার চেয়ে বেশী দোষী?"

যুবকের বুক কাঁপিয়া উঠিল,—"ওঃ! কি ক্ষুরধারতুল্য তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ! কি জ্বালাময় কঠোর সত্য!"

অপরাধীর ন্যায় যুবক ভূমিপানে দৃষ্টি অবনত করিয়া রহিলেন। দুনিয়ার ফকির—একজন পথ-ভিখারী—কাঙ্গাল পাগল,—তাহার নিকট অতুলবিভবশালী যুবক কম্পিতকলেবর!—নিষ্পাপ আত্মার প্রভাব এমনই হয়।

পাগলও তাহা বুঝিল। তাই তখনি আবার সহানুভূতির অমৃতশীতল কণ্ঠে বলিল, "এখন বাবুজী, তোমার মনের কথা কি?"

যুবক এবার অতি ধীর বিনীতভাবে, সলজ্জ দৃষ্টিতে কহিল, "কি আর বলিব? অন্তর্য্যামী দেবতার ন্যায় তুমি আমার অন্তরের সকল কথা জানিতে পারিয়াছ,—তোমার নিকট লুকাইব কি?"

"ভয় নি,—আমি গোয়েন্দা নই,—কিংবা ঠগ্ ধড়িবাজ্ পাটোয়ার নই যে, লোকের কাছে তোমার মানহানি কোরে পসার বাড়াবো;—তা ডুব্‌তে গেছেলে যদি, তো ডুবে পাতাল অবধি একবার দেখ্‌লে না কেন?"

"না, আর দেখ্‌বার সাধ নাই।"

"সে কি? সাধ কি কখন পোরে? হাতে পেয়েছ যদি——

"তুমি কি বোল্‌চো?"

"পাগলের খেয়াল।—বোল্‌চি, এই মন এখন কিসে দিতে চাও?"

যুবক নির্ব্বাক্ হইয়া পাগলকে দেখিতে লাগিলেন, পাগল যেন কি গভীর গূঢ় রহস্য তাঁহাকে বুঝাইতে যাইতেছে। মুখখানি হাসিমাখা, দৃষ্টি করুণাপূর্ণ। পুনরায় বলিল, "এখন কি নিয়ে থাক্‌বে?"

যুবক কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। বস্তুতঃ, কি লইয়া থাকিবেন?—মন ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার নয়?

পাগল বলিল, "এই এত বড় পৃথিবী,—ভগবানের এই বিশাল কার্য্যক্ষেত্র,—আর কোন দিকে মন দিলে হয় না?"

"কিসে দিব, তুমি বলিয়া দাও।"

ব্যথিতভাবে সমবেদনা পাইবার আশায়, যুবক—পাগলের পানে চাহিলেন। পাগল কহিল,"জাল গুটাইবে, না, আবো ছড়াইয়া ফেলিবে ?"

যুবক একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হায় রাম! তোমার এ দ্ব্যর্থবটিত শব্দের অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

"হাঁ, আমার এ কতকটা হেঁয়ালি বটে।—তা 'রাম' আবার কি,—রামা পাগ্‌লা বলো ?"

"যা বোলেচি তা বোলেচি,—আর বোল্‌বো না,—তুমি রামব্রহ্ম ঠাকুর।"

হো হো হাসিতে হাসিতে পাগ্‌লা উত্তর দিল,—ঠাকুরের পৈতে কৈ ?—" 'পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী' ;—রামা পাগ্‌লা—কুকুর।"

পাগল এমন ভাবে হাসিল, এমন ভাবে কথা কয়টি বলিল যে, তাহাতে বিন্দুমাত্র বিকার বা আত্মাভিমান নাই,—পরন্ত ঐরূপ ভাবে মনোভাব প্রকাশ করিয়া দিব্য আত্মানন্দ উপভোগ করিল।

মন্মথ—সভ্য ভব্য নব্য যুবক—শিক্ষাসংস্কারমার্জ্জিত—আধুনিক সুরুচিসম্পন্ন নবনায়ক—পাগলের এই নির্ব্বিকার নিরহঙ্কারের ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন,—তৎসঙ্গে আত্মজীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া মরমে মরিয়া গেলেন।

পাগল আবার বলিতে লাগিল,—"আথের হারালেই পাগল হয়। আমি আথের হারিয়েছি, তাই পাগল।"

"তুমি অভিমান জয় করিয়াছ, তাই ঠাকুর।"

"তা না হোক্, মান অপমান দুই থুইয়েছি,—তাই—কুকুর।"

পাগ্‌লা আবার হো হো হাসিল। অপরূপ মধুর সে হাস্য!—সে অনির্ব্বচনীয় উদার সরল হাস্যে—শ্রোতার মনের সঞ্চিত ক্লেশরাশি যেন ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল।

পাগ্‌লা বলিতে লাগিল, "তা—ও ঠাকুর কুকুর দুই-ই এক—কি বলো ?"

"ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে বটে।"

"কেন পাগলের কাছে নয় ?"

"তোমার মত পাগল হোতে পাল্লে বটে।"

"আমি তো পেটের দায়ে পাগল !—বালকের কাছেও কি নয় ?"

"বালক অজ্ঞান—তার কাছে সবই সমান।"

"আর তুমি বা তোমরা—যারা হয়কে নয় করে, সত্যমিথ্যায় লুকোচুরি

করে, পাটোয়ারী বুদ্ধি চালায়, লোকের গলায় ছুরি দেয়, তারা জ্ঞানী;—কেমন?"

যুবক দেখিলেন, এ পাগল সহজ লোক নয়;—যাহা বলিতেছে, বর্ণে বর্ণে সত্য। পাগলের সে কথার ধার ও ঝাঁজ তিনি সহিতে পারিলেন না;—অবনত মস্তকে মনে মনে সকলই মানিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই পাগল এত নিকটে ছিল, এর সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না?"

পাগলও অমনি বলিয়া উঠিল,—"ওগো, সময় হোলেই সব হয়! কীলিয়ে কাঁটাল কি পাকে? ফল পাকবার সময় হোলে আপনিই পাকে।—এই মাত্র না তুমি তোমার গুপ্ত প্রণয়িনীকে বোল্‌ছিলে,—'তুমি ভগবান্‌কে চাও,—তাঁর ভক্তিপথ ধোর্‌বে?'—কথাটা কি সত্যি?"

এবার যুবক অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া, মনের সকল ময়লা—সকল জঞ্জাল ছুড়িয়া ফেলিয়া, একেবারে পাগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন, "যদি তুমি দয়া করো!—যদি তুমিই আমায় মায়াবিনীর হাত থেকে রক্ষা করো!"

"মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, ঐ মায়া-রঙ্গিণীর জাল থেকে তোমায় ছিনিয়ে নেয়। বিশেষ, আমি তো পাগল।"

"হায়, তবে? আমার গতি কি হইবে না?"—বড় আক্ষেপের সহিত—অতি হতাশভাবে—যুবক এই কথা বলিলেন।

উত্তরে পাগল কহিল, "দুরতিক্রমণীয় ঐ মায়া; স্বয়ং মহামায়ারই ঐ খেলা,—মার চরণে শরণ লও।"

"হায়, কোথায় সেই মা?—কিরূপে তাঁহাকে আমি পাইব?"

"কুলকুণ্ডলিনী মা—তোমার হৃদয়ে।—হৃণ্ময়ী চিন্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মা—তোমার অন্তরে! ডাকো, কাঁদো, ব্যাকুল হও,—মা ছুটিয়া আসিবেন।

সহসা উচ্চ মধুর সুধাবর্ষীকণ্ঠে পাগল গান ধরিল,—

"তারা আছে রে অন্তরে।
ডাক্ ডাক্ দেখা পাবি, কেঁদে বেড়া কাতরে।
সে রূপের জ্যোতি, দেখ্‌লে একবার,
আর কিছু দেখ্‌বার সাধ—হবে না তোমার,
আঁধারে দীপ জ্বোল্‌বে সদা, কিবা চমৎকার!—
মায়ার খেলা, মোহের ছলা, উধাও হবে কোথায় রে!
মায়ের চরণে শরণ নিলে—সকল জ্বালা যাবে রে॥"

যুবক দেখিলেন, পাগল গান গাহিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে এক একবার তারা, মা, ব্রহ্মময়ী, কালী বলিতে বলিতে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতেছে। মুখখানি হাসিমাখা, চক্ষু দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত; যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া করুণা, প্রেম ও পুলক প্রবাহিত হইতেছে।—রোমাঞ্চিত দেহে ভাব ও ভক্তির পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়া উঠিতেছে।

পাগলের এই অলৌকিক ভঙ্গি ও দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া,—এই দেবদুর্ল্লভ কণ্ঠস্বর শুনিয়া, যুবক একেবারে মোহিত ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, "হায়! কে এ পাগল?—আমার জীবনে এ নবভাব আনিয়া দিল?—আমার মনের ভিতর সব উলট-পালট করিয়া ফেলিল? আহা, তাই যেন হয়—এই ভাব যেন চিরস্থায়ীই হয়।"

অন্তর্য্যামীর ন্যায় পাগল কহিল, "সে অনেক পুণ্যের কথা গো! কত ভাঙ্‌বে-গোড়্‌বে, জ্বোল্‌বে পুড়্‌বে, তবে খাঁটী সোণা হবে। বলে—'পঞ্চভূতের ফাঁদ'—ব্যাপার সোজা কিগো?"

"তবে উপায়? হায়, আমার গতি কি হবে না?"

"অগতির গতি—অনাথের শরণ—পতিতপাবনী মাকে ডাকো,—মা-ই পার কোরবেন।"

"কেমন কোরে ডাক্‌তে হয়, আমি তো তা জানি না?"

"জানো না? হাঁ, জানো বৈকি? একটু অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত কোরে আপনার জন্মবৃত্তান্ত ভাবো দেখি? জন্মের আগে কি ছিলে, তারপর কি হোলে,—এর পরেই বা কি হবে,—কোথায় যাবে, একটু নিরিবিলি হোয়ে চিন্তা কোরো দেখি? নিজের বিষয় কারো কাছে জান্‌তে হয় না,—আপনার ভিতরেই সব আছে।"

সহসা পাগল উন্মনা হইয়া ভক্তি-বিগলিত-হৃদয়ে গাহিল,—

"আপনাতে মন আপনি থেকো, যেয়োনাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তাই বোসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥"

গাহিতে গাহিতে প্রশান্ত হাসিমুখে, পাগল—যুবকের পানে চাহিল। দেখিল,—অশ্রুসিক্ত মুখে, অনিমেষ করুণনয়নে, যুবক তাহার পানে চাহিয়া আছে।

পাগল পুনরায় গাহিল,—

"পরম ধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারি।
কত মণি-মুক্তা পোড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥"

মা-মা-মা বলিতে বলিতে, পাগল এবার ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইল। যুবক ও জন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে, সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া, সেই মহাভাবে আকৃষ্ট হইয়া, গম্ভীরস্বরে মাতৃনাম ধ্বনিত করিল। অমৃতময় মা-নামে, সে স্থান পবিত্র ও পুলকিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে পাগলেরও সমাধি ভঙ্গ হইল। অতি হৃষ্টচিত্তে, সুমধুর স্বরে পাগল বলিল, "তবে নাকি তুমি মাকে ডাক্‌তে জানো না? এমন অমৃতের অধিকারী তুমি,—হায়! কামিনীর মায়ায় আত্মশক্তি ভুলে আছ? তুমি তো সামান্য নও বাপ?"

বড় আদরের সহিত পাগল—যুবকের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। সেইরূপ হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "সামান্য কেউ-ই নয়,—যখন জীবের জননী—জগদম্বা! সেই জগদম্বাকে যে মা বোলে ডাক্‌তে পেরেছে, তার আবার কিসের ভয়?"

"কিন্তু হায়! এ তত্ত্ব আমায় শিখাইবে কে? তুমিই —"

"কাউকেই শেখাতে হয় না, কোথাও যেতে হয় না;—আপনার ভেতোরেই সব আছে।—ঐ তো শুন্‌লে বাপু,—

'আপনাতে মন আপনি থেকো,
যেয়োনাকো কারো ঘরে।
যা চাবি, তাই বোসে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥'

—"এই অন্তঃপুররূপ আপনার ঠাকুর-ঘর ছেড়ে, অবিশ্বাসীর আঁস্তাকুঁড়ে, লোকে মোত্তে যায় কেন? হাঁ তবে ভক্তদের কথা স্বতন্ত্র বটে। তাদের সঙ্গ নেওয়ায় লাভ আছে। তা, ভক্তেরা যে সব একজাত।"

যুবক কি ভাবিতে লাগিল। পাগল জিজ্ঞাসিল—"আবার কি সন্দেহ হোলো,—না?"

যুবক বিনীতভাবে বলিল, "আচ্ছা, এই মায়াও কি সেই মার?"

"মার—সকলই সেই মূলাপ্রকৃতির। সেই মা-ই একরূপে তোর জননী, আর-একরূপে তোর মনোমোহিনী;—বিদ্যা অবিদ্যা সবই তিনি।"

"তবে তিনি খেলাইতেছেন?"

"নিশ্চয়—তোর মনের গুণে।"

"কিন্তু মনের মালিক ও তো তিনি?"

পাগল একটু হাসিয়া কহিল, "ন্যায়ের ফাঁকি একটা ধোরেছিস বটে।—

'মন-গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেমন নাচাও—তেমনি নাচে॥'

অথবা,—

'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'—কেমন?"

যুবক দেখিলেন, পাগলরূপী এই পরমপুরুষের কি গভীর তত্ত্বজ্ঞান,—কি প্রখর অন্তর্দৃষ্টি। মনের সকল কথাই তাঁর পরিজ্ঞাত। এ হেন পাগলের নিকট তাঁহার দাঁড়ানো দায়,—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন কি? অতি জড়সড় ভাবে—সঙ্কুচিত হইয়া—হেঁটমুখে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পাগল বলিতে লাগিল,—"দেখ, ভক্তি আর পাটোয়ারী-বুদ্ধি—দুটো পৃথক জিনিস। খোদার সঙ্গে যারা কাব্‌সাজি কোত্তে যায়, তারা কতকগুলা কথা শিখে রাখে,—সেই কথার মার-পেঁচে লোকের কাছে আপনাদের পসার জমায়।—'মন-গরীবের কি দোষ আছে'—আর 'ত্বয়া—হৃষিকেশ'—ও কোন্ অবস্থার কথা রে? মুক্ত, সিদ্ধ, বুদ্ধ না হোতে পাল্লে—ও-কথা বলে কে?—তেম্‌নি, 'মনের মালিক তিনি'—একথা বলবার আগে, একবার ভাব্‌তে পাত্তিস তো, অহংজ্ঞান তোর কতখানি গিয়েছে। হায় রে! এই মন নিয়ে,—এই জুয়াচুরি-ফিরিকি-কারচুবি নিয়ে, সংসারী লোক ভগবান্ লাভ কোত্তে চায়!"

"বাবা, ঘাট হোয়েছে,—আমায় মাপ কর।"

"না, ও একটা কথার কথা বোল্লুম—কিন্তু সংসারী লোকগুলো ঠিক ঐ রকম কিনা, বল্ দেখি?"

"ঠিক, একশতবার,—আর আমি ভাবের ঘরে চুরি কোরবো না।"

"ও তোর 'শ্মশান-বৈরাগ্য',—থাক্‌বে না।"

"যদি মার দয়া হয়,—তোমার ইচ্ছা হয়।"

"আমি তো একটা পাগল,—আমার আবার ইচ্ছা!"

"তুমি সাক্ষাৎ শিব!"

'হো-হো-হো' করিয়া পাগল এবার একটা উৎকট হাস্যধ্বনি করিল। সে ধ্বনিতে যুবকের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গের ভিতর দিয়া সেই তীব্রহাস্যের স্বর-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। যুবকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

হাসিতে হাসিতে পাগল কহিল,—"আমি শিবের বাহন—বলদ। বলদের উপর তোমার বিশ্বাস হয় ?"

যুবকও এবার যেন কোন অলক্ষ্য শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "মানুষের নিকট আমি চিরদিন প্রতারিত হইয়া আসিতেছি,—এইবার হে পরমপ্রেমিক, হে পাগলরূপী পুরুষোত্তম! তুমিই আমায় পার করো,—আমার প্রার্থিত বস্তু মিলাইয়া দাও।"

"কিন্তু মোহিনীর মায়া তো তুমি সহজে ছাড়িতে পারিবে না ?"

"দয়া করিয়া তুমিই ছাড়াইয়া দাও।

"আমি দিব ?—আমায় ধরিয়া তুমি উঠিবে ?"

এবার যুবক কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তাই যেন মনে হয়।"

"তবে কাঁদো, ডাকো,—আর্ত্তের হৃদয় লইয়া মার শরণাপন্ন হও। আমিও তোমার সঙ্গে কাঁদি, ডাকি, মার অভয় পাদপদ্ম আঁকড়িয়া ধরি ;—

"ত্রাহি মাং সর্ব্বতো দুর্গে ত্বং হি দুর্গার্ত্তি নাশিনী,
যন্নাম স্মরণা জীব সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥

"এই যে, মা এসেছেন,—মা কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন!—ডাক্, কাঁদ্, মাথা খোঁড়, মার পা দুটো জড়িয়ে ধর্!—আহা-হা! কি মুরতি রে!—মা, যাস্‌নে, পালাসনে, আমার মাথা খাস—দাঁড়া!—পালালি, গেলি, ফাঁকি দিলি ? আচ্ছা যা বেটি, আমিও তোর পেছু নিলুম।—না, ঐ যে, ঐ যে, বিদ্যুদ্বরণা, সস্মিতবদনা, ত্রিনয়না মা আমার—দিক্ আলো কোরে দাঁড়িয়েছেন ? দ্যাখ্‌রে ভাগ্যবান,—জন্ম সার্থক কোরে দ্যাখ্,—মার ঐ জগৎ-জোড়া—দিক্-আলো-করা অপরূপ রূপ! ঐ শোন্, মা অমিয়স্বরে কি বোল্‌বেন,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

—"শুনলি ? মার আমার আপ্তবাক্য বুঝ্‌লি ? আবার শোন্, আবার বোঝ,—ঐটি মনের মধ্যে তোলাপাড়া কর্,—মার চরণে শরণ নে,—তোর গতি হবে। মার মায়া, দৈবী মায়া,—দুর্লঙ্ঘ্যা গুণময়ী মায়া,—মনুষ্যের সাধ্য কি, এ মায়ার হাত থেকে নিস্তার পায়! মার চরণে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত শরণ নে,—মাই তোকে নিস্তার কোর্‌বেন।—হা! হা! হা! আমি এখন চল্লুম,—মার পেছনে ছুটলুম,—ঐ তোর মোহিনী আসচে। ওও মার

আর এক মূর্ত্তি। খুব ছেনালী মূর্ত্তি। তুই এই মূর্ত্তি চেয়ে এয়েচিস্, এখনো কিছু দিন এই মূর্ত্তি নিয়ে থাক্—সময় হোলেই ছাড়্‌বি। ভয় নি, মার কথাটা মনে রাখিস্,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

পাগল হো হো অট্টহাস করিতে করিতে ও এক একবার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে বেগে চলিয়া গেল।

যুবক মন্মথনাথ, তখন ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিতভাবে সেই রেলিং-ফটক ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গম্ভীরস্বরে এই ভগবদ্বাক্য ঘন ঘন ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

পূজা।

এই ত শরৎ কাল, শরদেন্দু সমুজ্জ্বল,
মেঘহীন সুনির্ম্মল, নীলিম গগন।
শ্যামল বৃক্ষের পত্র, দৃষ্টিমাত্র সুখী নেত্র,
ধরা এবে সুপবিত্র, হ'য়ে বরিষণ॥
আবার আশ্বিন মাস, মানব মনের আশ,
আসিছে পিতার বাস, আপনার জায়া।
যে বৎসর হ'ল গত, "বৎসরেক পরে মাত
পুনরাগমনায়ত," দিয়াছে বলিয়া॥
কি দেখ্‌তে মা এসেছিস্, কি সুখে মা রেখেছিস্
আর বার যা দেখেছিস, তাও কি মা আছে?
হাহাকার ঘরে ঘরে, পেটে অন্ন দিতে নারে
মাতৃ কোলে ছেলে মরে, সব আশা গেছে॥
কোন স্থানে বন্যা এসে, ভরা শস্য গেছে ভেসে
দুর্ভিক্ষ কোন দেশে দিয়াছে দহিয়া।

যে দেশে কমলাবাস, অন্নাভাবে বহে শ্বাস
আর কি মা আছে আশ, দেখিবি আসিয়া ?
আর কি মা আছে শক্তি, পূজিব মা শিবশক্তি
হৃদে আর নাহি ভক্তি, তামস পূজন।,
রজ তম গুণে মত্ত, নাহি হৃদে গুণ সত্ত্ব
ভক্তিতত্ত্ব ছেড়ে মত্ত, যশ আকিঞ্চন ॥
তোরে কি মা ভক্তি ভবে, আনে যত বঙ্গ-ঘরে
অহঙ্কার বৃদ্ধি তরে, আমোদ সৃজন।
যার বাড়ী পূজা হয়, সে কি তোরে দেখা দেয়
করে অর্থ বিনিময়, নামের কারণ ॥
সে কারণ এ দুর্দ্দশা, ছেড়েছ (মা) বঙ্গের আশা
তাইতে মা এ বিদশা বঙ্গের এখন।
জননী জনম ভূমি, সে কি মাগো ভিন্ন তুমি
ভক্তি বিনে অন্তর্যামি, অশক্ত জীবন ॥
দেখ বঙ্গ অন্তঃস্তল, আর্য্যজ্ঞান আর্য্য বল
গেছে মাগো রসাতল, আছে আস্ফালন।
নাহি কার্য্যে একাগ্রতা, সমাজ সম্ভ্রম প্রথা
দর্শন বিজ্ঞান যথা, ছিল প্রচলন ॥
কি বলে পূজিব তোরে, শুধু ভক্তি উপচারে
সম্বল বিহীন ক'রে রেখেছ যেমন।
যেমন ষষ্ঠ্যাদি কল্প, ক'রেছি যা সংকল্প
নাহি মা মনে বিকল্প, করিব বোধন ॥
অকালে মা কুণ্ডলিনী, জাগাব গো বিশ্বরাণী
অচৈতন্য সদা যিনি, চির নিদ্রাগত।
ষড়চক্রে ছয় পূজা* করিব মা দশভুজা
সংকল্প ক'রেছি এ যা, নিবেদিগো মাতঃ ॥
ভকতি চন্দন গুলি, মনঃ-পুষ্পে পুষ্পাঞ্জলি,
নেত্রবারি জলাঞ্জলি, দিব মা চরণে।

* ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধি, নবমী ও দশমী এই ছয় পূজা।

কাম অজা বদ্ধ ক'রে, ক্রোধ মহিষেরে ধ'রে
লোভ মেষ দিব তোরে, বলি উপাদানে ॥
মদ মগু দিব ঢালি, পূজিতে মা মহাকালী
দেহ প্রাণ রচনাবলী, দিব মা পূজনে।
কি দিয়ে মা দিব ভোগ, পেয়েছি যে কর্ম্মভোগ
দেখাব সে ভোগাভোগ, তব বিদ্যমানে ॥
সেই ভোগ কৃপা ক'রে, গ্রহণ করিলে পরে
আশাবারি দিব পরে, পানার্গ তারিণি!
পান ক'রে আশাবারি, মুক্ত কর মহেশ্বরি,
সম্বল নাহি শঙ্করি, পূজিতে জননি!
নাহি মাগো ঢাক ঢোল, কাড়ার কঠোর রোল
গাল বাদ্যে "ব্যোম" বোল আছে মাত্র সার।
কত স্থানে বিশ্বরমে, ডাকিতেছে ধূম ধামে
কেমনে দরিদ্র ধামে, আসিবে আমার ॥
আয়া হি বরদে দেবী ওহে দশভুজা।
গৃহানঃ হরবল্লভে এ দীনের পূজা ॥

শ্রীবাণীকান্ত রায়।

বাজার।

(১)

বিষম প্যাঁচের বাজারখানা
চারি ধারে ঘেরা জাল,
বুঝ্‌তে গেলে গুলিয়ে যাবে,
তবুও না তত্ত্ব পাবে,
ঠোকরেতে আঘাৎ খাবে,
দেখ্‌ছি এ দিন বিষম কাল।

(২)

এ বাজারে মানব যাত্রী
যারা নিতি যাচ্ছে আস্‌ছে,

প্রায় দেখা যায় কলাই করা,
মিষ্টভাষী চিত্তহরা,
কাছে এসে সেইত ত্বরা,
জড়িয়ে দেবে বিষম ফাঁসে।

(৩)

ঐ যে দেখ বিষে গড়া
গোলমেলে ঢং গোলাকারা,
মিষ্টতা হীন নামটা টাকা,
কোমল নয় ত শক্ত চাকা,
ওতেই আছে সব গো ঢাকা,
গুণ বুঝেছে নাড়ে যারা।

(৪)

প্রভু দেছেন পাঠিয়ে মোরে
তাই এসেছি এ বাজারে,
কুক্ষণেতে যাত্রা আমার,
লাভে শূন্য হোলোগো হার,
শূন্য হাতে এ হা হা কার,
বলব কি হায় গিয়ে তাঁরে।

(৫)

মহাজনের খাতায় জমা
লাভ লোক্সান স্পষ্টাক্ষরে,
এমনি বৃথা বোসে রোয়ে,
অমূল্য দিন যাবে বোয়ে,
জ্ঞান দিবে কে মধুর কোয়ে—
আত্ম-কান্তি সকল নরে?

(৬)

মায়ামোহের দৃঢ় বাঁধন—
অলস হৃদয় ভালবাসে,
মায়ার পুতুল "কলটি" আমার,
মাগায় থনি, বাদনটা আর,

ক্ষণেক ছেড়ে চিত্ত বিকার,
দৃঢ় বাঁধা এ নাগপাশে।

(৭)

জগৎ গুরু! প্রেমের আধার!
পড়্‌লে তোমার এমনি ফাঁসে—
চরণে প্রাণ থাক্‌ত বিঁধে,
পথটা পেতাম মধুর সিধে,
জ্ঞানের আলো জল্‌ত হৃদে,
বাজার করে যেতাম পাশে।

(৮)

মিল্‌লনাত সরল স্বজন,
মর্ম্মে দেখি আঁটা খিল,
সাত নকলে আসল খাস্তা,
পাইনা সঠিক সোজা রাস্তা,
গুলিয়ে মরি নাই ব্যবস্থা,
মনের শান্তি নাহিক তিল।

(৯)

ভবের বাজার সকল অসার
বুঝেছি সার দয়াল হরি—
এখন ওহে কৃপানিধি!
সোজা কর বিকল হৃদি,
ডাক্‌লে আস এইত বিধি—
এস হে নাথ কৃপা করি।

(১০)

আসা যাওয়া সার হ'ল হায়,
এ অভিযোগ কর্‌ব তোমায়—
তেমন করে সাজিয়ে দিলে,
এমন করে ভেঙ্গে নিলে,
জীবন-বাঁধন হচ্চে ঢিলে
(ওগো) এগিয়ে আসে যাবার সময়।

(১১)

ভবের হাটে ভাঙ্গা প্রাণে
আশা শুধু রাতুল চরণ,
সার বুঝেছি অনিত্য সব,
বাজারেতে ঘোর কলরব,
চাইনা বিশ্বের বিষয় বিভব,
তোমাতে ধায় পাগল এ মন।

(১২)

কোথা হে নাথ! আনন্দময়!
প্রাণ মেতে যায় নাম রসেতে।
গুপ্ত কত অমৃত রয়,
ভাণ্ডার সে চরণদ্বয়,
চিত্ত চকোর আকুল যে হয়,
(আমি) পাগল হে নাথ তোমায় পেতে।

(১৩)

বাজার দেখে ডরিয়ে মলেম
অজ্ঞ আমি অন্ধকারে,
মহৎ জ্ঞানী দক্ষ যাঁরা,
মোক্ষ ফলটি লভেন তাঁরা,
অজ্ঞ আমি হোলেম সারা
তোমা বিনা জানাই কারে?

(১৪)

(আমি) এ বাজারে আসল ফাঁকি
বুঝ্‌বনাক অতশত,
দীনা হীনা অন্ধকণা,
চক্ষু দুটো বড্ড লোনা,
ঠেক্‌লে পদে হব সোণা
প্রাণে আশা জাগছে কত।

(১৫)

যাত্রার পথে তুমিই সহায়
দীনভরসা অধমতারণ !
..রথে হে নাথ পদে তোমার,
যাত্রার ব্যাঘাৎ ঘুচাও আমার,
মাথ সার দিলাম এ ভার,
তুমিই আমার হৃদয় রতন।

শ্রীসুশীলমালতী সরকার।

রামকৃষ্ণ সংগীত।

(সেবক নিবারণচন্দ্র দত্ত রচিত)

(২৯)

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয়।
জয় আদিদেব পূর্ণব্রহ্ম অনাথ-আশ্রয় ॥
তুমি অগতির গতি, তুমি জগতের পতি,
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মৃত্যুঞ্জয় ॥
যোগেশ্বর যোগীবর, যোগদীপ্ত কলেবর,
চিন্তামণি জীবেশ্বর তুমি হে চিন্ময় ॥
তুমি শক্তি তুমি মুক্তি, তুমি গতি তুমি ভক্তি,
তুমি পুরুষ প্রধান তুমি সর্ব্বময় ॥
তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি বন্ধু তুমি ভ্রাতা,
তুমি গুরু জ্ঞানদাতা, শান্তির আলয় ॥
তুমি পতিতপাবন, তুমি সত্য সনাতন,
তোমারি মহিমা দেব ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥
প্রণমি তব চরণে, আশীষ এ দীন হীনে,
তব পদে চিরদিন মতি যেন রয় ॥

(৩০)

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলরে।
মন রামকৃষ্ণ নাম সুধায় মগ্ন হ'য়ে রওরে ॥

মায়া মোহ দিয়ে বিসর্জ্জন, রামকৃষ্ণ বল অনুক্ষণ,
রামকৃষ্ণ নামে হবে তোর জীবন সফলরে॥
বল রামকৃষ্ণ নাম, নামে হবে পূর্ণ কাম,
রামকৃষ্ণ নামে জ্ঞান ভক্তি প্রেম মোক্ষ ফলেরে॥
কলিযুগে নামই সার, নাম বিনা নাহি কিছু আর,
রামকৃষ্ণ নামই ধ্যান জ্ঞান যোগ তপ জপরে॥
রামকৃষ্ণ পদে লইলে আশ্রয়, জীবনে মরণে অভয় হৃদয়,
রামকৃষ্ণ নামে সংসারের জ্বালা দূরে যাবে রে॥

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

Sympathy for the poor, the down-trodden,
even unto death '—This is our motto.

Swami Vivekananda.

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কার্য্য-বিবরণী আজ আমাদের হস্তগত। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম ৬॥০ বৎসর হইল জাতি-ধর্ম্ম-দেশ-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র পীড়াগ্রস্ত জরাজীর্ণ 'নারায়ণে'র সেবায় ব্রতী। অহোরাত্র ভগবান-সর্ব্বস্ব সহায়াস্তরবিহীন সাধুসন্ন্যাসী সেবিত হরিদ্বার—তাহার মধ্যে কনখল সেবাশ্রম—এই সেবাশ্রমের সহায় সহৃদয় মানব। তাই আমরা আজ সেই সহৃদয়তা ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সকলের দ্বারস্থ। কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "যদি ভগবানের সেবা করিতে চান, তবে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎ সন্তানের সেবা করুন, সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীর সেবা করুন।" সেই জন্য আমরা বলি যে, সংসারকে সেবা করিবার জন্য যাঁহাদের প্রাণ উৎকণ্ঠিত, তাঁহারা, সংসারের দীন দুঃখীদিগের জন্য মুক্তহস্ত এই আশ্রমে স্বীয় স্বীয় যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাঠাইয়া নিজ জীবন চরিতার্থ করুন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল পোঃ, জেলা সাহারাণপুর অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

কার্ত্তিক, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২৮ পৃষ্ঠার পর)

৩৫২। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস—চাঁদামামা সকলেরই মামা।

৩৫৩। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপনিই খুঁজে লয়।

৩৫৪। জীবকে খাওয়ান সাধুর কাজ, সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

৩৫৫। ঈশ্বর সব করছেন, এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে তো জীবন্মুক্ত। কি রকম জানো? বেদান্তের একটা উপমা আছে—একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু, বেগুণ, সব ভাতে দিয়েছ; খানিক পরে আলু, বেগুণ, চাল, লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে, আমি নড়ছি—আমি লাফাচ্চি। ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে আলু, পটল, বেগুণ বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্চে। যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুণ, পটল, এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্চে না, হাড়ীর নীচে আগুণ জ্বলচে, তাই ওরা লাফাচ্চে। যদি কাট টেনে লওয়া যায়, তা হলে আর নড়ে না। জীবের আমি কর্ত্তা, এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান্—অমনি কাট টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল নাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে; হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়েনা চড়েনা।

৩৫৬। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকৃতে নয়।

৩৫৭। ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার।

৩৫৮। যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম শক্তি চায়, তারাও হাল্‌কা থাক;—যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি। আর এক দেশে একজন কি কথা বলচে, তাই বলতে পারা, এই এক শক্তি। এই সব লোকের ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হওয়া ভারি কঠিন।

৩৫৯। কামিনী কাঞ্চনই মায়া, সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে 'ব্রহ্মা বিষ্ণু প'ড়ে খাচ্চে খাবি'।

৩৬০। অবতার যখন আসেন, সাধারণ লোকে জানতে পারে না—গোপনে আসেন। দুই চারজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে।

৩৬১। যাদের চৈতন্য হয়েছে, তাদের বেতালে পা পড়ে না, তাদের হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর তাদের এত ভালবাসা যে, যে কর্ম্ম তারা করে, সেই কর্ম্মই সৎকর্ম্ম।

৩৬২। প্রেমের দুইটী লক্ষণ। প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে, এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য; ২য় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবেনা; দেহাত্ম-বোধ একেবারে চলে যাবে। ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।

৩৬৩। যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হচ্চে, তার ঈশ্বর লাভের আর দেরী নাই। অনুরাগের ঐশ্বর্য্য—বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন, সত্য কথা, এই সব। বাবু কোনও খানসামার বাড়ী যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে পারা যায়। প্রথমে বন জঙ্গল কাটা হয়, ঝুল ঝাড়া হয়, ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ, গুড়গুড়ি, এই সব পাঁচরকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এসে পড়লেন বলে।

৩৬৪। তাঁর নাম করলে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

৩৬৫। যেমন ভাব, তেমন লাভ। ভগবান মন দেখেন, কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন'।

৩৬৬। ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পায়। তার পরই কান্না বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আনন্দ,—আনন্দে মার দুধ খায়। তবে একটী কথা আছে, খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে, আবার হাসে।

৩৬৭। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে।

৩৬৮। ভক্তি দুই প্রকার। প্রেমাভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠাভক্তি, এক জিনিস; আর ব্যভিচারিণী ভক্তি বা জ্ঞানমিশ্র ভক্তি আর এক জিনিস। প্রেমাভক্তির সঙ্গে জ্ঞান একেবারে মিশ্রিত নাই। প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে—অহংতা আর মমতা। যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তা হলে গোপালের অসুখ কর্ব্বে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না। আর মমতা—আমার জ্ঞান—আমার গোপাল। উদ্ধব বল্লেন 'মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি।' যশোদা তা শুনে বল্লেন, 'ওরে তোমাদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করেছি—চিন্তামণি না—আমার গোপাল।'

৩৬৯। ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না; তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্চে. একটা বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বল্লে ভাই—আমরা সব মারা গেলুম। আর একজন বল্লে কেন? মারা যাব কেন? এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি। আর একজন বল্লে, না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি। যে বল্লে আমরা মারা গেলুম—সে জানেনা যে ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা আছেন। যে বল্লে, এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। তার বোধ আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সব করছেন। আর যে ব্যক্তি বল্লে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস আমরা গাছে উঠি, তার ভিতর প্রেম বা ভালবাসা জন্মেছে। প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে ভালবাসে, তার পায়ে কাঁটাটী পর্য্যন্ত না ফোটে।

৩৭০। তিনিই মানুষ হয়েছেন, শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন।

৩৭১। ঈশ্বর কোটী (যেমন অবতারাদি) না হলে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয় কিন্তু আর ফেরে না। তিনি

যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন, যখন অবতার হন, যখন জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন, লোকের মঙ্গলের জন্য।

৩৭২। জ্ঞান ও ভক্তি দুইই পথ। ভক্তি পথে একটু আচার বেশী করতে হয়। জ্ঞান পথে যদি অনাচার কেউ করে, সে অনাচার নষ্ট হয়ে যায়। বেশী আগুন জ্বাললে কলাগাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে পুড়ে যায়।

৩৭৩। সংসারে নানা গোল। "এ দিকে যাবি, কোস্তা ফেলে মারবো; ওদিকে যাবি ঝাঁটা ফেলে মারবো, এদিকে যাবি, জুতো ফেলে মারবো।" সোনা গালিয়ে গয়না গড়বো, তা যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তা হলে সোনা গলান কেমন করে হয়? চাল কাঁড়ছো, একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক এক বার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হোলো। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয়?

৩৭৪। একজন আগুন করলে, দশজন পোয়ায়। সাধুর কৃপায় অনেকে উদ্ধার হয়।

৩৭৫। সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে যায়। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন, তারপর দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়, আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।

৩৭৬। কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটি বিঘ্ন। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয় পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝতে পারি নাই যে গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ী পৌঁছিলে দেখতে পেলুম, কত নীচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝতে দেয় না। ভূতে যাকে পায় সে জানেনা যে, ভূতে পেয়েছে। সে বলে, বেশ আছি।

৩৭৭। সংসারে শুধু যে কামের ভয় তা নয়; আবার ক্রোধ আছে, কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ।

৩৭৮। সংসারী ফোঁস করবে, বিষঢালা উচিত নয়। কাজে কারুর অনিষ্ট যেন না করে। কিন্তু শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। না হলে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।

৩৭৯। ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তা হলে আর বেশী খাটতে হয় না। "গুরুবাক্যে বিশ্বাস।"

৩৮০। "আমিই সেই, আমিই শুদ্ধ আত্মা" এটী জ্ঞানীদের মত। ভক্তেরা বলে, এ সব ভগবানের ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য না থাকলে ধনীকে কে জানতে পারতো? তবে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন বলবেন 'আমিও যা, তুইও তা' তখন এক কথা। রাজা বসে আছেন, আর খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, 'রাজা, তুমিও যা, আমিও তা' লোকে তাকে পাগল বলবে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা যদি একদিন বলেন, 'ওরে, তুই আমার কাছে বোস্, ওতে দোষ নাই; তুইও যা, আমিও তা' আর তখন যদি গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। সামান্য জীবেরা যদি বলে 'আমি সেই' সেটা ভাল না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কি জল হয়?

৩৮১। মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ, যোগী মনের বশ নয়।

৩৮২। ভক্তিই সার। তাঁকে ভালবাসলে বিবেক বৈরাগ্য আপনিই আসে।

৩৮৩। স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন—ও সব ভাল পথ নয়। বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই হয়। বীরভাবে সাধন, দাসীভাবে সাধন, আর মাতৃভাবে সাধন। বীরভাবে সাধন বড় কঠিন, দাসীভাবও ভাল, সন্তানভাব বড় শুদ্ধভাব।

৩৮৪। ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হ'তে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়।

৩৮৫। যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয় সে অবিদ্যা স্ত্রী; অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে।

৩৮৬। যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে— রাজা, দুষ্ট-লোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে।

৩৮৭। দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে, আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি; পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে; কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহ বুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।

৩৮৮। জমিদার সব যায়গায় থাকেন, কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই বসেন। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়।

৩৮৯। ভগবান ভক্তির বশ। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, এই সব তিনি চান।

৩৯০। যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত দেখে, মা পাঁটা খায়, তাই বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই। তার পূজা লোকে জানতে পারে না। ফুল নাই তো বিল্বপত্র আর গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দুটী মুড়কী দিয়ে, কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়। আর এক আছে, ত্রিগুণাতীত ভক্ত, তার বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তার পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।

৩৯১। আগুন লাগলে কতকগুলি জিনিস পুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে, তারপর অহংবুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে।

৩৯২। ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে আর দড়ি মেপে বলে "এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার।" ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ,—তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে—'এদিকটা আমার, ও দিকটা তোমার।' ঈশ্বর আর একবার হাসেন। যখন ছেলের অসুখ শঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে 'ভয় কি মা! আমি ভাল করবো। বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।

৩৯৩। স্বপ্নে ভয় দেখেছো, ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে, তবু বুক দুদ্দুড় করে; অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। অমনি মুখ ভার করে বলে, "আমায় খাতির কল্লে না।"

৩৯৪। যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয়, আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হ'লে পাপের বৃদ্ধি হোতো। পাপকে ভয় হ'ত না। পাপের শাস্তি হ'ত না।

৩৯৫। যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁর ভাব কি জানো?—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও, তেমনি বলি।

৩৯৬। ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করেনা। যদি

কোনও মহাপুরুষ বলেন 'আমি ঈশ্বরকে দেখেছি,' তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিক্। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেক দিন ঘুরতে হয়। তখন কোনটা কফের নাড়ী, কোনটা বায়ুর নাড়ী, কোনটা পিত্তের নাড়ী, বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রভাতী ;—ভক্ত সম্মিলন।

উজ্জ্বল সে রবি ছবি প্রভাত সময়।
(আছেন) আপন মন্দিরে বসি রামকৃষ্ণ রায়॥
(তখন) সেবক শ্রীরামলাল প্রণমি শ্রীপদে।
প্রভুরে সুধায় নিতে প্রভাতী প্রসাদে॥
(প্রভু মাতৃপ্রসাদ এনেছি হে)
মিছরী মিলায়ে প্রভু নবনীত সনে।
হাতেতে কিঞ্চিৎ লয়ে দিলেন বদনে॥
(জয় মা, জয় মা ব'লে)
ব্রহ্মবারি লয়ে কিছু করিলেন পান।
মৃদু মধু মাতৃনাম শ্রীমুখেতে গান॥
(কিবা মধুর লাগেরে)
এ দিকে ভকত, চিত চাতক সমান।
গৃহ পরিহরি প্রভু দরশনে যান॥
(প্রাণে ব্যাকুল হয়েরে—প্রভু দরশন আশে)
একে একে ভক্তগণ আসি উপনীত।
প্রভু দরশনে সবে হরষিত চিত॥
(সবার আনন্দ হোলোরে—প্রভু মুখ নিরখিয়ে)
প্রণমিয়া পাদমূলে পদরজঃ লয়ে।
আনন্দে মাখিল অঙ্গে কুতূহলী হয়ে॥

(কত আনন্দ ভেলরে—প্রভুর চরণধূলি মাথায় দিয়ে)
(তখন) যোড় হস্তে প্রভু করি মায়েরে স্মরণ।
শ্রীমুখে বলেন সবে আশীষ বচন॥
(কিবা মধুর শুনিরে)
"ভকতি লভহ সবে, মা চেনো আপন।
মহামায়া টুটে দিন মায়ার বাঁধন॥
সকল অন্তরে হোক্ ঈশ ভালবাসা।
মঙ্গলময়ের পদ কর চির আশা॥
(যেন আর কিছু চেওনাগো)"
পরেতে পুছেন প্রভু কুশল বারতা।
ভকত শীতল শুনি স্নেহমাখা কথা॥
(কত ভালবাসাবে)
মুখেতে বলেন সবে 'কুশল' 'মঙ্গল'।
অন্তরে উঠিল বাণী—ভকত সম্বল॥
(ভক্তের কি ধন আর আছেগো; তারা প্রভু বিনা জানেনারে)
"যাহাদের প্রভু তুমি ওহে দয়াময়!
তাদের বালাই নাই, মঙ্গল নিশ্চয়॥
চরণ পরম ধন হৃদে যদি পাই।
সুখ দুখ নাহি গণি আনন্দে মিশাই॥
(মোরা ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি)"
বসিয়ে বসিয়ে তবে প্রেম-আলাপন।
ভকত-বৎসল সনে ভকত মগন॥
(কিবা উভয়ে উভয়ে সুখী; ভাবের তুলনা নাইরে)
নেহারি এ সম্মিলন প্রাণ বড় সুখী।
(আমি) জনমে জনমে যেন হেন রূপ দেখি॥
(যেন হিয়ায় জাগেগো) (আমার আর কোনও সাধ নাহি মনে)
(প্রভু তোমায় পেলে সকল পাবো)

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য।

"Ramkrishna Mission is not a mushroom.

Swami Abhedananda.

(অবতরণিকা।)

আজ পঞ্চদশ বৎসর সময়ের গর্ভস্থ,—এর মধ্যে এক সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংবাদ কি তোমার কাণে অব্যক্ত মধুর-ধ্বনির মত স্বতঃই সঞ্চারিত হয় নাই? প্রায় ১৫ বৎসর গত হইল, সেই আকাশ-পাতাল-ভেদী সাম্রাজ্য স্থাপন-ব্যঞ্জক-বাণী যখন পাশ্চাত্যপ্রদেশে সর্ব্বপ্রথম উদ্দীরিত হইয়া এই সংসারখানাকে ব্যাপিয়া ফেলিল, সে সময়ের শুভবার্ত্তা তোমার কর্ণকুহরে পড়িয়াছিল কি? না—কাম ক্রোধাদির তাড়নায় তাড়নাভিভূত তুমি বিষয় মদিরা পানে উন্মত্ত থাকিয়া, সেই শুভঝঙ্কার শ্রবণ সুখে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছিলে? যখন রামচন্দ্র নরেন্দ্ররূপ স্রোতস্বতীদ্বয় সংসারী ও সন্ন্যাসীগণের চির-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য রামকৃষ্ণ গিরিবর হইতে সুদূর দেশ-দেশান্তরে অযাচিতভাবে বহিয়া যাইতেছিল, পিপাসু মানব! তুমি কি তখন 'পিপাসা' 'পিপাসা' করিয়া মর্ম্মভেদী হা হুতাশ করিতেছিলে, না স্রোতস্বতীর জলপানে আপন জীবনকে অমর করিয়াছিলে? যাই হোক্, এখনও কি কিছু খবর অন্তরে রাখো, না সেই চির অরণ্য-রোদনে অভ্যস্ত তুমি একবার হাসিয়া একবার কাঁদিয়া জীবন-মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছ? কি দেখিতেছ?—এসিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষের মত দেশ খানা যাঁহার নামে মুগ্ধ, জাপান যাঁহার কথা শুনিবার জন্য চির লালায়িত; ইউরোপ মহাদেশে বিবুধমণ্ডলী-সেবিত জার্ম্মণি, বিজ্ঞানপ্রিয় ইংলণ্ড, এবং স্বাধীনতা-সর্ব্বস্ব ফ্রান্সে যাঁহার বিজয় নিশান পৎ পৎ শব্দে উড্ডীয়মান, মিষ্টার মদনজিৎ (Mr. Madanjit) নামক জনৈক আফ্রিকা মহাদেশবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যাঁহার বার্ত্তা লইয়া আপন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ যাঁহার সংক্রান্ত পুস্তকাবলীতে, মধুকর মধুময় পুষ্পে বাস করিবার মত আজ বাস করিতেছেন; উন্নতির চরম সোপানারূঢ় আমেরিকা মহাদেশবাসী সরলান্তঃকরণ-বিশিষ্ট বিশুদ্ধ মার্কিনজাতি যাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে নিজ নিজ হৃদয়ে চিরদিনের মত উচ্চতম স্থান প্রদান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে; ভ্রাতৃমহাদেশের ধর্ম্মপ্রাণতায় সংকর্ষিত দক্ষিণ আমেরিকা নামক মহাদেশ যাঁহার উপদেশ

পীযুষ পান করিবার জন্য শশব্যস্ত, পাঠক! তুমি কি একটু নির্জ্জনে সেই সম্রাট্-শিরোমণি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়মূর্ত্তি, সাধুদিগকে পরিত্রাণ ও অসাধুদিগের অসাধুতা বিনাশ নিবন্ধন পৃথিবীর এক নিভৃত-কোণে দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহে অবতীর্ণ রামকৃষ্ণদেবের কথা ভাবিয়াছ কি? না—আপন গণ্ডিমধ্যে থাকিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিবাদী হইয়া মাকড়সার মত আপনি জাল নির্ম্মাণকরতঃ আপনাকে দৃঢ় রজ্জুবদ্ধ করিবার জন্য ব্যাপৃত রহিয়াছ? তবে এখন থেকে সাবধান হইলে তোমার জীবনতরীকে এই সংসার-মহাসমুদ্রের ঘোর কুহেলিকার মধ্যেও নির্ব্বাণরহিত প্রদীপের সাহায্যে ধীরে ধীরে চালাইতে চালাইতে গম্যস্থানে পৌছাইতে পারিবে। এ সাম্রাজ্যে একবার প্রজা নামে অভিহিত হইতে পারিলে কোনও ভয় বাঁধার কারণ নাই। একেবারে নির্দ্বন্দ্ব। চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত।

(সাম্রাজ্যে প্রবেশ লাভ।)

যখন জল বিভিন্নস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর অধোভাগ হইতে পুনর্ব্বার উর্দ্ধোম্মুখী হয়, তখন আর বার বার খুঁড়িয়া জল আনিবার আবশ্যকতা হয় না। তোমার মনরূপ পৃথিবীর মধ্যে উপরোক্ত কথাগুলি যদি স্তরে স্তরে ভেদ করিয়া থাকে, তবে এখন তোমার প্রশ্ন-প্রস্রবণ আপনিই উঠিবে, তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রশ্ন বাহির করিতে হইবে না। তুমি রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে প্রবেশাধিকার কি করিয়া পাইবে, এইটী তোমার সর্ব্বাদৌ জিজ্ঞাস্য। উত্তর—যেমন রাজরাজেশ্বর দর্শনাভিলাষীকে বহুদিন রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তৎপরে উত্তমরূপে আলাপ পরিচয় হইয়া যায়, তখন সেই অধ্যবসায় গুণে দর্শনেচ্ছু একদিন না একদিন রাজরাজেশ্বরের দর্শন পাইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ভাগ্যবান পরে দেখেন যে, মহারাজের অন্দরমহলেও তাঁহার অবারিত দ্বার, সেইরূপ রামচন্দ্র প্রণীত 'রামকৃষ্ণ জীবনী' 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' বা রামকৃষ্ণ-উপদেশাবলী, রামকৃষ্ণ সংক্রান্ত 'রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী', বিবেকানন্দ প্রদত্ত 'My Master' বা আমার প্রভু, অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত "শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি" শ্রীম-কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" এবং রামকৃষ্ণদেব সংক্রান্ত "তত্ত্বমঞ্জরী" ও 'উদ্বোধন' নামক মাসিক-পত্রিকাদ্বয় ইত্যাদি সর্ব্বজন মনোহারী, নবপ্রাণ সঞ্চারকারী, নিরন্তর আশ্বাস উৎসর্জ্জনকারী পুস্তকাবলীর সহিত কিছুদিন মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হও, তাহাদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয়

কর—তাহারাই তোমার প্রকৃত মিত্ররূপে এই সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বার নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। নিভৃতে, একপ্রাণে, অনন্যমনে সেইগুলি অধ্যয়ন ও অনুধ্যান কর, জানিতে পারিবে এ সাম্রাজ্যে জীবন-সংগঠন সত্তায়, ইহপরকাল শান্তি সোপান প্রদর্শক। ত্রিতাপ-তাপে অনবরত ক্লিষ্টপ্রাণ মানবের মহৌষধ কি আছে। তদনন্তর তুমি নিজেই এ সাম্রাজ্যের প্রজা বলিয়া নিজেকে ধারণা করিতে পারিবে। কালক্রমে অন্যান্য উন্নত অভিজ্ঞ ও চতুর প্রজাবৃন্দের সহিত তোমার মিলন অবশ্যম্ভাবী; সর্ব্বশেষে সেই প্রবল প্রতাপশালী অথচ অনুপম সর্ব্বজন সমদর্শী সম্রাটের সহিত তোমার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাঁহার নামামৃত পান করিয়া অশিতীলক্ষ-যোনি ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া অমর হইয়া বসিবে। চিরশান্তি, নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও নিরন্তর প্রেমোল্লাসই তোমার অনুধাবন করিবে। তোমার প্রাণখানা অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয়ানন্দে বিস্ফারিত হইয়া পড়িবে।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

শ্রীরামচন্দ্র।

রামকৃষ্ণ-বহ্নি যবে জ্বলিল জগতে—
রামচন্দ্র-বায়ু তথা মিলিল আপনি,
দূর করি অন্ধকার জনমন হতে,
প্রাণপ্রিয়তম নামে কাঁপা'ল অবনী।
চক্ষুষ্মান্ চক্ষুহীন কতই পতঙ্গ,
আভাস পাইয়া সেই আলোকের রেখা—
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি সবে ঢালি দিল অঙ্গ,
হৃদিপটে 'রামকৃষ্ণ' নাম হ'ল লেখা।
হেন সমীরণ কথা শুনিনি কোথায়,
যার মুখে 'রামকৃষ্ণ', যায় তার কাছে
মনে হলে, মরি খেদে করি হায় হায়,
রামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ কার আছে?

খেদ কেন? খুঁজিলেত পাইব সে ধন,
তবে উঠে পড়ে লাগি দৃঢ় করি মন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

ভক্তপ্রাণ হেমচন্দ্র।

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, গত ১৩১৩ সালের আষাঢ় মাসের তত্ত্ব মঞ্জরীতে আমরা ইটালী রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সভ্য ৺ হেমচন্দ্র বসুর জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইল।

হেমবাবু পটলডাঙ্গার সম্ভ্রান্ত বসু বংশজ, ৺ রাজনারায়ণ বসুর পঞ্চম পুত্র। ইনি ইটালীতে স্বনামধন্য দেবনারায়ণ দেবের বাটীতে বিবাহ করেন। তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ যতদূর জানা গিয়াছে, সাধারণ ভাবেই অতিবাহিত হইয়াছিল, তবে তিনি সাংসারিক লোকের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া নিজের ভালতেই মনোনিবেশ করিতেন না। পাঁচজন লোককে লইয়া আমোদ আহ্লাদেই কাটানো তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ভগবান বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না, বা ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানেরও ধার ধারিতেন না। অবস্থা গতিকে ইনি ইটালীতে আসিয়া বসবাস করেন, ও ভগবান রামকৃষ্ণের প্রেমিক শিষ্য শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সম্পর্কে আসেন। উক্ত দেবেন্দ্র বাবু যখন ইটালীতে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগের পর একটু একটু করিয়া পরমহংসদেবের আশ্রিত জনৈক ভক্ত বলিয়া পরিচিত হন, তখন হেমবাবু ও তাঁহার সমবয়স্কেরা দেবেন্দ্র বাবুকে পরমহংসদেবের শিষ্য জানিয়া পথে ঘাটে দেখিলেই হাঁসের ডাক "প্যাক্ প্যাক্" শব্দ করিয়া ঠাট্টা করিতেন। জানিতেন না যে, যাঁহাকে এইরূপ বিদ্রূপ করিতেছেন, তাঁহারই আশ্রয়ে শেষে লুটাইতে হইবে।

যাহাই হউক, দিন আসে দিন যায়—মানুষের সময় আসে সময় যায়। কর্ম্মক্ষয় ও প্রারব্ধ কাটিয়া গেলে তবে সৌভাগ্য উদয় হয়। সময় না হইলে কিছুই হয় না। তখন হেমবাবুর সময় আসে নাই, তাই তিনি দেবেন্দ্র বাবুকে বিদ্রূপ করিতেন। কিছু দিন পরে বেলুড়মঠে ভগবান রামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উপস্থিত। কোন সমবয়স্কের সহিত জুটিয়া হেমবাবুর এই

জন্মোৎসব দেখিবার সাধ হয়। হেমবাবু নিজে গল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে তখন রামকৃষ্ণকে লোকে কেন দয়ালঠাকুর ভগবান বলিয়া পূজা করে তাহাই জানিবার ও দেখিবার প্রবল বাসনা হয়। বেলুড়ে গিয়া ঠাকুরের উৎসবে সংকীর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার মন কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। এখানে বলিয়া রাখি যে, হেমবাবু লোকজনকে খাওয়াইতে ও নিজেও সেই সঙ্গে খাইতে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। সখ করিয়াই হউক বা লোভে পড়িয়াই হউক, ঠাকুরের খিচুড়ী প্রসাদ পাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। প্রসাদ পাওয়ার পর বেলুড়মঠের উৎসব-ক্ষেত্রে ঠাকুরের তাঁবুতে একটি খুঁটি ঠেস্ দিয়া সেই উৎসব-দৃশ্য দেখিতেছিলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এত লোক, আনন্দ করিতেছে ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম গান করিয়া তাঁহাকে ভগবান ভাবে উপাসনা করিতেছে, আর আমি কি এতই বুদ্ধিমান যে, এতগুলি লোক যাহারা আনন্দ করিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা আমার বুদ্ধি সরেশ! এতগুলি লোক ভগবান বলিয়া যাঁহাকে পূজা করে, আমি তাঁহাকে মানুষ ভাবি! এইরূপে ভগবান রামকৃষ্ণ, ভক্ত হেমচন্দ্রকে নিজের খিচুড়ী প্রসাদ খাওয়াইয়া তাঁহার অন্তরে আসিলেন, এবং যেন অবোধ ছেলের মন স্নেহে বুঝাইয়া বুঝাইয়া নিজের কোলে টানিয়া লইলেন, ও আপনাকে ধরা দিলেন। হেমবাবু বলিয়াছিলেন যে, "সেই অবধি আমার মন যেন কি ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল, ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিষয় জানিতে আমি অত্যন্ত উৎসুক হইলাম।" তৎপরে তিনি ইটালী রামকৃষ্ণমিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন ও সেই মিশনের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন।

বীরভক্ত রামচন্দ্রের আদর্শে ইনি ঠাকুরের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ ধ্যান জ্ঞান ও জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল। নিজে ইটালী রামকৃষ্ণমিশনে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের নিত্য-সেবা করিয়া মনে অপার আনন্দ লাভ করিতেন। হেমবাবু সকল সময়েই উৎফুল্ল প্রাণে কাটাইতেন। যদি কখন অর্থাভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কোনওরূপ বারো মাসের তেরো পার্ব্বণের বাধা হইত, তাহা হইলে তাঁহার মাথায় যেন বাজ পড়িত ও অতি বিষণ্ণ মনে অবস্থান করিতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কল্পতরুর দিন, সরস্বতীপূজা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি অথবা অন্য যে কোন পর্ব্বোপলক্ষেই হউক, তিনি বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা করিয়া রামভক্তগণের সেবা করিতেন ও তাহাই যেন তাঁহার জীবনের

মহাব্রত করিয়াছিলেন। কোনওরূপে তাহার অন্যথা হইলে তাঁহার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিত ও দুঃখ পাইতেন। সকল সময়েই তিনি ছেলে মানুষের মত সদানন্দে কাল কাটাইতেন। মাসে ৬০্টী টাকা কোনও সওদাগরী অফিসে কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিতেন এবং প্রায় দেড়শত টাকা কমিশন হিসাবে পাইতেন। তন্মধ্যে ৬০্ টাকা সংসার খরচের জন্য রাখিয়া বাদ বাকী সমস্ত টাকা ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেবা ও ভক্ত-সেবাতেই উৎসর্গ করিতেন। এমন কি তাঁহার দেহত্যাগের সময়ে এমন পয়সারও সংস্থান ছিল না, যাহাতে তাঁহার সৎকারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। সাংসারিক লোকের মত মন হইলে, তিনি তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের জন্য বেশ সংস্থান করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু সঞ্চয় করা তাঁহার পক্ষে স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, সংসার ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। কেননা স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদি আছে। তবে নিতান্তই যদি সংসার করিতে হয় তো ভগবানকে লইয়া সংসার করাই শ্রেয়ঃ। মিশনের ঠাকুরবাড়ী ও ঠাকুর সেবা তাঁহার আর একটী সংসার ছিল। হেমবাবু প্রায়ই বলিতেন যে "স্ত্রীপুত্রাদির জন্য যেমন খাটিয়া সংসার করি, ভগবানের নাম লইয়া তাঁহার সেবা করা ও তাঁহার কার্য্যাদি লইয়া থাকাও আর একটী সংসার।" সকালে উঠিয়া স্নান করিয়াই হেমবাবুর ঠাকুর ঘরে যাওয়া, ঠাকুর তোলা, মুখ ধোয়ান, ঠাকুরকে স্নান করান, পরে সিংহাসন ও ঠাকুরের বিছানাদি ঝাড়িয়া ঠাকুর বসান, ঠাকুরঘর পোছা, গঙ্গাজল ধূপ ধূনা চন্দন ফুল ইত্যাদির সহিত পূজার বাসন গোছান ইত্যাদি নিত্য কর্ম্ম ছিল। সে সেবা ও ঠাকুর ঘরের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া অনেকেই শান্তি পাইতেন। আত্মবৎ সেবা করিয়া প্রাণে যে কি আনন্দ হয় তাহা যাঁহারা কখন ঠাকুরের সেবা সেইভাবে করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। আমাদের হেমবাবু প্রাণে প্রাণে তাহা উপভোগ করিতেন। এ ধারে চন্দন, ও ধারে ফুল গোছানো ও ধূপ ধূনার গন্ধ, তাহার উপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মনে ভগবদ্-ভক্তির পবিত্রভাব আনিয়া দিয়া মস্তককে আপনিই অবনত করাইত।

ঠাকুর সেবা সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপভাব হইয়াছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। একসময়ে তিনি তাঁহার অফিসের কোনও কার্য্য উপলক্ষে ৺কাশীধাম গমন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া তাঁহার মন সর্ব্বদাই ঠাকুর সেবার ত্রুটির জন্য হু হু করিত। [illegible] শীঘ্রই

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার মনে হইল যে, ঠাকুর যেন তাঁহার সেবা বিহনে রোগা হইয়া গিয়াছেন। ভগবান-ভক্তের এ ভাব বড়ই মধুর। আপনার লোক হইলে, প্রেমাস্পদকে যেমন নিজে হাতে খাওয়াইতে বা সেবা করিতে না পারিলে প্রাণে কষ্ট হয়, হেমবাবুরও সেই সময়ে সেইরূপ কষ্টই হইয়াছিল। ভক্ত ভগবানের এ খেলা চিরকাল আছে ও থাকিবে; তবে, যাহারা এ খেলার পাত্র হয়, তাহারাই ধন্য ও সৌভাগ্যবান। জ্ঞান পন্থীদিগের পথ একরকম। তাহাদিগকে এত ভাব ভক্তির ভিতর দিয়া যাইতে হয় না। কিন্তু ভক্তিমার্গের পথ একরকম দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ একখানি প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে জীবিতাবস্থার ভাব আনিয়া ভোগ করা বড়ই কঠিন ও হৃদয়স্পর্শী। জীবিত মনুষ্য বা অন্য কোন প্রাণীকে ভালবাসা যাইতে পারে, পরন্তু কোন প্রস্তর বা মৃণ্ময়মূর্ত্তিতে সেই জীবিতাবস্থার ভাব আরোপ করা সহজ লভ্য বলিয়া বোধ হয় না। আর যতক্ষণ মনে ঐরূপ ভাব থাকে ততক্ষণই সুখে যায়।

হেমবাবু ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ও সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমভাবে প্রস্তুত ছিলেন। হাতে পয়সা নাই অথচ ঠাকুরের কোনওরূপ পর্ব্বোপলক্ষে পূজা ভোগরাদি করিয়া পাঁচজনকে লইয়া আমোদ করিবার বাসনা। হেমচন্দ্র কাতর হইলেন। ভগবান ভক্তের হৃদয় বুঝিলেন ও অফিসের এমন কোনও কাজ আনিলেন যাহাতে তাঁহার তৎসাময়িক বাসনাপূর্ণ হইবার অর্থ সংকুলান হইয়া গেল। রামকৃষ্ণভক্ত হেমচন্দ্র আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সকল পর্ব্বদিবস মহানন্দে কাটাইয়া দিতেন ও পাঁচজন ভক্তকেও তৎসঙ্গে আনন্দ দিতেন। ইটালী রামকৃষ্ণ-মিশনের ঠাকুরবাড়ী তাঁহার সময়ে আনন্দাশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। আজ ঠাকুরের দোল-উৎসব, ঠাকুরকে নানা রকম পুষ্প পত্রে সাজাইয়া আবির দিয়া নিজেরা আবির মাখিয়া গান করা, পরে প্রসাদ পাওয়া; কাল ঠাকুরের রথযাত্রা, ঠাকুরকে ফুলের রথে সাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া সকল ভক্ত মিলিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ; পরশু ভক্তসম্মিলন ইত্যাদি। পয়সা হাতে থাকিলে হেমবাবু ঠাকুরের কাজে ব্যয় করিবার জন্য ও ভক্তজনকে লইয়া আনন্দ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। কাল কি খাইব কি করিয়া সংসার চলিবে, এ ভাবনা কখনও তাঁহার মাথায় আসিত না। কেহ হাজার বুঝাইলেও মাথায় স্থান পাইত না।

মুক্ত স্বভাবের নিদর্শন এই। বাইবেলে লিখিত আছে "Think not for the morrow" হেমবাবু সেইটী দেখাইয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের কোন কাজকর্ম্ম উপলক্ষে অর্থাবশ্যক হইলে তিনি অপরাপর ভক্তদিগকে বলিতেন, যাহার যাহা খুসী তিনি তাহাই দিউন, বেশীর ভাগ বা বাকী যতই লাগুক্ আমি তাহা সংকুলানের ভার লইলাম। কয়জন লোকের প্রাণে এরূপ ভাব জন্মায়!—পাঠকগণ বোধ হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এরূপ মহান্ অন্তঃকরণ ও উদারতার ভাব অল্পই দৃষ্ট হয়। ভগবান বা ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে খরচ করা আজ কাল কথার কথা—তাহা পাঁচভূতকে খাওয়ান ও হৈ হৈ করার মধ্যে ধরা আছে, কিম্বা বাজে খরচের খাতায় ফেলা হয়।

শুধু ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ খরচ করিয়াই তিনি বিরত থাকিতেন না। যাহার যাহা অভাব, তাহা তাঁহার ক্ষমতাধীন থাকিলে অবিলম্বে পূরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কাহারও কর্ম্ম নাই, অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে তাঁহার পরিচিত সাহেবদের ধরিয়া চাকরী করিয়া দিতেন। কাহারও কিছু অর্থাভাব হইয়াছে জানাইলে, তখনি তাহার প্রতিবিধান করিতেন। কোনও সময়ে কাহারও বাড়াতে ঋণের জন্য শীল করিয়া পেয়াদা ঢুকিয়া জিনিস পত্র বাহির করিতেছে, এমন সময়ে হেমবাবু তাহা শুনিতে পাইলেন। হেমবাবুর হাতেও টাকা নাই। তিনি পাঁচ জনের কাছে ধার করিয়া সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজে ঋণগ্রস্ত হইয়াও মুক্ত করিলেন ও বলিতে লাগিলেন যে, যদি আমার বাড়ীতে এই রকম জিনিসপত্র টানাটানি করিত, তাহা হইলে আমি কি করিতাম? ধার করিতাম। সেইরূপ এই ব্যক্তিরও বিপদে আমার যথাসাধ্য সাহায্য সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরকে আপনার করিয়া লওয়া তাঁহার একটী বিশেষ গুণ ছিল। সেই গুণ তাঁহার পুত্রকন্যাদিতেও অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

হেমচন্দ্র প্রাতে ঠাকুর ঘরের কাজ সারিয়া ইটালী রামকৃষ্ণ-মিশনের তত্ত্বাবধান করিতেন, পরে বৈকালে অফিস হইতে আসিয়া আবার ঠাকুর সেবায় মন নিযুক্ত করিতেন। তাহার পরে আহারাদি করিয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখাৎ উপদেশাদি শুনিতেন অথবা রামকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে যোগ দিতেন। সংকীর্ত্তন সময়ে তাঁহার সরলতাপূর্ণ প্রার্থনাগীত ও প্রেমাশ্রু তাঁহার ভক্তির পরিচয় দিত। মোটের উপর দিবসের সমস্ত ভাবনা, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কিসে উন্নতি হইবে, ঠাকুর সেবার কি রকম ব্যবস্থা করিলে নিজের

মন্ত্রের মত আত্মবৎ সেবা হইবে, কি করিয়া আরও পাঁচজনকে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে আনিয়া সুখ হইবে, এই চেষ্টাতেই থাকিতেন। রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে লইয়া উৎসব করা তাঁহার স্বভাবের আর একটী বিশেষ গুণ ছিল। প্রতিবাসী—যাহার পয়সা নাই—তাহার বাড়ীতে নিজে খরচ দিয়া ঠাকুরের উৎসব করিয়া নাম গুণ গান, প্রসাদ বিতরণ—ইত্যাদি করিয়া আনন্দ করিতেন।

হেমবাবু শুধু যে ঠাকুরের নাম গান করিয়া আনন্দ করিতেন, তাহা নয়। কর্ম্মেতেও তাঁহার প্রগাঢ় প্রবৃত্তি ছিল। কিছুকাল তিনি মুর্শিদাবাদ রামকৃষ্ণ অনাথ-আশ্রমের জন্য টাকা আদায় করিয়াছিলেন। ইটালী রামকৃষ্ণ-মিশনের সাপ্তাহিক সাপ্তাহিক রবিবারে চাল আদায় করিতেন ও সেই সম্বন্ধে হিসাব নিকাশ—উপযুক্ত পাত্রে সেই চাউল বিতরণ ইত্যাদি তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। দরিদ্রসেবা করিতে তাঁহার অপার আনন্দ হইত। ইটালী রামকৃষ্ণ-মিশনের বাৎসরিক উৎসবে তিনি ভক্ত ও দরিদ্রসেবা স্বহস্তে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। অনেকের সৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি, যশলাভ করিবার জন্য উৎপন্ন হয়, অথবা লোকে আমাকে খুব ভক্ত, পরোপকারী বা কর্ম্মী বলিবে—এই আশায়ও অনেকে অনেক রকম সাজে। কিন্তু হেমবাবু যাহা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রাণ হইতে না উঠিলে করিতেন না। লোকে ভক্ত পরোপকারী সজ্জন বা কর্ম্মী বলুক বা না বলুক, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। অথবা লোক দেখাইয়া কোন কাজ করিয়া, তাহার বড়াই করা বা সুখ্যাতির কাঙালী হওয়াও তাঁহার অভ্যস্ত ছিল না। যাহা তিনি প্রাণে প্রাণে ভাল বুঝিতেন, তাহা শত বাধা ও কষ্ট সত্ত্বেও সম্পন্ন করিতেন। তিনি যেমন রাসভারী লোক ছিলেন, আবার তেমনি বালকের ন্যায় সরলতাও তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। হেমবাবু বসিয়া আছেন, কাছে যে কেহই থাকুক না কেন, তাহার সঙ্গে ফষ্টি-নাষ্টি করিয়া নিজেও হাসিতেছেন, তাহাকেও হাসাইতেছেন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে অত হাসি কেন? তাহার উত্তর দিতেন—"যে কটা দিন বাচি, ফুর্ত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে কাটাই"। রামকৃষ্ণ-ভক্ত হইবার কিছুকাল পরে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। একবার ঠাকুরের বাৎসরিক উৎসবের দিন কয়েক পূর্ব্বে তাঁহার একটী কনিষ্ঠ পুত্র ও অল্প বয়স্কা কন্যার স্বামী কালগ্রাসে পতিত হয়। হেমচন্দ্রের এই জামাতা ও পুত্র বিয়োগ জনিত বিপদের অবস্থা দেখিয়া লোকে মনে করিল, এবারে বুঝি আর ইটালী-রামকৃষ্ণ-মিশনের উৎসব হইল না। কারণ হেমচন্দ্রই নেতা ছিলেন,

তাঁহার এই অবস্থায় অনেকেই হায় হায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু হেমবাবু অটল অচল ভাবে ধৈর্য্য ধরিয়া, দুঃখে কিছুমাত্র অভিভূত না হইয়া আনন্দে উৎসব-কার্য্যে যোগদান করিয়া উৎসব সুসম্পন্ন করিলেন। সকলে এভাব দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিল।

ইটালী-রামকৃষ্ণ-মিশনের যাহা কিছু আস্বাব সমস্তই তাঁহার দ্বারা প্রদত্ত ও ক্রীত। তিনি ইটালী মিশনে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তন্ মন্ ধন্ না দিলে ভগবান লাভ হয় না। হেমচন্দ্র তাহা অকাতরে দান করিয়া কথাটী কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ইটালী মিশন হেমবাবু বিহনে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত। উক্ত মিশনের নফরচন্দ্র একটী প্রস্ফুটিত কুসুম—যাহার গন্ধে আজ দিগদিগন্ত আমোদিত; কিন্তু হেমচন্দ্র আর এক জাতিয় কুসুম যাহার বিহনে ইটালী মিশন আজ সজীবতা ও সৌন্দর্য্যবিহীন। ভক্তি, বিশ্বাস ও ঈশ্বর-নির্ভরতায় হেমচন্দ্রের জীবন ভক্তজনের আদর্শ। আমরা তাঁহার জীবনের এ গুণাবলীর কথঞ্চিৎ লাভ করিতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইব। বারান্তরে হেমবাবু সম্বন্ধে আরও কিছু প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅমলচন্দ্র মিত্র।

সাধক-সংগীত।

(ভক্তবর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার বিরচিত)

(১)

সুর—"বল মাধাই মধুর স্বরে"।

একতারা নাম ভাই তোমার।
এক তারা বিনে একতারা তোর কেউ ভবে নাই আপনার॥
পাঁচ তারে ভাই বেতার বড় ঐক্য করা বিষম ভার।
এক বিনে নাই, হৃদ্‌মাঝে তাই সার করেছ একটি তার॥
এক থরজে মন মজেছে আর সুরের ধারণা ধার।
(ঋষভ.) রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবৎ, নিখাদ, পরিহার॥
এক বিনে ভাই আর কিছু নাই তোর কাছে পাই সাক্ষী তার।
তোর নাই বিভূক্তি, একে মতি, বুঝেছিস্ ভাই সারাৎসার॥
এক তারা তোর নিলাম শরণ উপায় কিছু নাই আমার।
তুমি নাম প্রসঙ্গে প্রেম তরঙ্গে কর ভবসিন্ধু পার॥

(২)

দিন গেল মন বল হরি, ছাড়রে বাসনা ॥ (ধুয়া)
চৌরাশী লাখ জনম পেয়ে তবু মিটল না তোর আশা,
(সেই) আশার আশে বৈলি বসে বুদ্ধি খুব তোর খাসা।
অস্ত দন্ত রহিত হলো (ওরে) পাক্‌লো মাথার কেশ,
এখনও তোর হুঁস্ হলনা, হবে কি গতি তোর শেষ।
কে তোমার বা, তুমি বা কার, ভেবে দেখ্‌না মন,
মায়া নিশায় মোহের ঘুমে ও মন দেখ্‌ছ কুস্বপন।
প্রাণ গেলে তোর হবেরে ভাই ঐ শশ্মান ঘাটে ঠাঁই,
(ওরে) দীনবন্ধু বিনে বন্ধু কেউ তখন তোর নাই ॥
আপন জেনে যাদের তরে (ভাই) মর খেটে খেটে।
হ'লে মড়া, দড়া দিয়ে তারা বাঁধবে এঁটে সেঁটে।
"চল্লে তুমি কল্লে কি মোর" প্রাণ প্রিয়সীর দাবি—
শুনতে হবে তখনো ভাই খাবে যখন খাবি ॥
ভব-নদীর তুফান ভারি উঠছে কত ঢেউ,
পারে নিতে পারে তোরে, এমন আছে কি তোর কেউ।
ভবেরি কাণ্ডারী হরি ওরে চরণ তরি তাঁর,
তাই বলি মন দিন থাকিতে (ও ভাই) কররে স্থসার।

(৩)

সুর—"কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন ইত্যাদি"।

সুন্দর এই দেহ তোমার একদিন মাটিতে মিশাবে ॥ (ধুয়া)
কর্‌ছো বাড়ী লোহার কড়ি দিচ্ছো মজবুত হবে।
(ও তোর) বজ্জর্ আঁটন ফস্‌কা বাঁধন দেখ্‌নারে ভাই ভেবে ॥
পান ভোজন সব নিয়মে খাও সাল্‌সা চ্যবণপ্রাস।
(ও তোর) সকল ফিকির ফস্‌কে যাবে হবি কালের গ্রাস ॥
দাঁত বাঁধিয়ে কলপ দিয়ে কাল ক'ল্লে চুল।
(ওরে) ভাব কি তার চিত্রগুপ্তের খাতায় হবে ভুল ॥
অহঙ্কারে ভাই কওনা কথা 'টাইটেল্' সি, এস্, আই।
মুদলে আঁখি নিশানা তোর থাক্‌বে চিতার ছাই ॥

(৪)

(মন আমার) বিনা অনুভূতি,
লাভ কি হবে যতই পড়না বেদ ভাগবৎ পুঁথি।
পড়া-পাখী ত 'রাধাকৃষ্ণ' বলে দিবারাতি,
রাধাকৃষ্ণে তায় কিবে তার হয় কভু প্রতীতি॥
ছল চাতুরী প্রাণে ভরা, মুখে হরিনাম গীতি,
মন মুখে তোর মিল না হলে, মিলবে কি শ্রীপতি॥
চিত্তশুদ্ধি শুদ্ধাবুদ্ধি না হলে সঙ্গতি,
সে ধন কি মন পাবি কখন, ধ্যানে পায়না যোগী যতি॥
সকলের মূল সাধু সঙ্গ হলোনা তায় রতি,
মোহের ঘোরে মরবি ঘুরে পাবিনা নিষ্কৃতি॥

(৫)

সুর—"রাম রহিম না জুদা করো" ইত্যাদি।

রামকৃষ্ণ, শ্যাম, শ্যামা, শিবে, ভেদ ভাবনা আমার মন।
নাম রূপের গেলাপে ঢাকা, আছেন সেই এক নিরঞ্জন॥
চিনির ছাঁচে উট্, হাতী, ঘোড়া, পুতুল, পাখী, রথ হয় যেমন।
যার যেমন মন লয় সে তেমন, এক চিনিতে সব গঠন॥
ভেদ-ভাবনা মন ছাড়না, সুখ পাবেনা তায় কখন।
বহুতে এক দেখ্‌লে তবে পাবে রে মন মোক্ষধন॥
অস্থি, মাংস, মেদ, শোণিতে সকল শরীর হয় সৃজন।
আত্মারাম বিহরে তাহে, কে হিন্দু বায় কে যবন॥
সাধ যদি তোর থাকেরে মন পেতে সত্য-সনাতন।
ভাসিয়ে দেনা দ্বেষাদ্বেষী, পর্‌না চ'খে প্রেমাঞ্জন॥

(৬)

সুর—সিন্ধু ভৈরবী।

অপবিত্র বলে কি নাথ, ত্যজিবে আমায়।
সমদর্শী নাম যে তোমার সর্ব্বশাস্ত্রে সদাই গায়॥
খানা, খন্দক, বিল, নালার জল উব্‌ছে গঙ্গাপানে ধায়।
গঙ্গাতো না বিচার করেন, ধরেন আপন বুকে তায়॥

ব্যাধের বাণ, আর সাধুর ত্রিশূল, উভয় নির্ম্মাণ হয় লোহায়।
স্পর্শমণি কি ভিন্ন ভাবে, স্বর্ণ করে দোঁহারি কায়॥
অস্পর্শীয় চণ্ডালে কোল, বনের পশু চরণ পায়।
কি গুণে নাথ, জগাই মাধাই, ভবসিন্ধু পারে যায়॥
যদি প্রভু ঠেল হে পায়, যা হয় হবে ভাবি না তায়।
তুমি পতিতপাবন নাম খোয়াবে, আমার চির কীর্ত্তি থাকবে ধরায়॥

সমালোচনা।

প্রেম ও শান্তি। ভক্তপ্রাণ সেবক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাভাস ও উপদেশাবলম্বনে লিখিত ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ নূতন উপন্যাস। পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। তত্ত্ব-মঞ্জরীর পাঠকবর্গকে 'প্রেম ও শান্তি'র প্রেমাংশ হইতে দুইটী পরিচ্ছেদ পাঠ করাইয়াছি, তাহাতেই তাঁহারা এই পুস্তকের পরিণতির কতকটা আভাস পাইয়াছেন। সরলপ্রাণ বিশ্বাসী-হৃদয় মন্মথ, জীবপ্রকৃতি-লালসাবশে মোহিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া বিভ্রান্ত পথে চালিত হইতে যাইতেছিলেন,—মূর্ত্তিমানধর্ম্ম পুরুষোত্তম রামব্রহ্ম ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে, উপদেশে, আকর্ষণে ও শক্তিতে তাঁহার মানসিক গতি ঈশ্বর পথে চালিত হইয়া গেল। পাটোয়ার-বুদ্ধিবিশিষ্ট, অর্থলোলুপ, পিশাচপ্রকৃতি, সর্ব্বপ্রকার অহিতাকাঙ্ক্ষী অগ্রজভ্রাতা প্রমথকে, মন্মথ তাঁহার ধন সম্পত্তি সাগ্রহে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরপাদপদ্মলাভের আশায় ফকির সাজিলেন। মহাপুরুষের কৃপায় তিনি নিজ অন্তঃপুরে যে পরমধন দেখিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় পার্থিব মণিমুক্তা অতি তুচ্ছ, অতি হেয়। অর্থ—বহু অনর্থের কারণ এবং রমণী জননী, ইহা তাঁহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হইয়া গেল। আবার কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত প্রমথর ভীষণ পরিণাম—অনিবার অশান্তি ও সন্দিগ্ধচিত্তে জীবন কাটিল; পরিশেষে পরের জীবননাশ চেষ্টায় ছুটিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিল। জগতসংসারে, সুচতুর বুদ্ধিমানের ত এইরূপে কাটিল—পরজীবনে আত্মার পরিণতি কি! কে বলিবে?

শান্তির অংশ লেখকের একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থকার এমন সরস মধুময় 'ঈশ্বরের সংসার' ছবি আঁকিতে পারেন নাই;

অথবা যদি কেহ আঁকিয়া থাকেন, সে ছবি আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। এ চিত্র অতীব সুন্দর, বড়ই মনোমুগ্ধকর, চিত্তের পরম আনন্দবর্দ্ধক এবং অন্তরে সুবিমল শান্তিদায়ক। সংসার তপোবনে ঋষি শ্যামসুন্দর, সহধর্ম্মিণী সাধ্বী তমালিনী, আর সংসার-খেলনা দুইটী হিরণ্ময় ফুল—পুত্র ধ্রুব এবং কন্যা তারা। এই ধ্রুব ও তারা শ্যামসুন্দর ও তমালিনীর সংসার-বন্ধন নহে, অপিচ সেই ধ্রুবতারার বদনে তাঁহারা সর্ব্বদা এই বিশ্বসংসারের ধ্রুবতারা প্রেমময় জগদীশ্বরের প্রেমমুখখানি দেখিতে পাইতেন। তপোবনে নিত্য বিরাজিত শ্যামসুন্দরের শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি। তাঁহার পূজা সেবা বন্দনা ও প্রার্থনা শ্যামসুন্দরের জীবনসর্ব্বস্ব। পতি অনুরতা পত্নী—শ্যামসুন্দরের দেবকার্য্যে ধর্ম্মকর্ম্মে সদা সহায়, সদাই প্রফুল্লমুখী। ক্ষুদ্র বালকবালিকার মুখেও সর্ব্বদা খেলার ছলে নিবৃত্তির গান—'যাবজ্জননং তাবন্মরণং।' শ্যাম—শ্যামসুন্দর ভাবেন, পতিব্রতা সতী সর্ব্বদা শ্যাম-চিন্তা করেন; উভয়ের যে মধুর পরিণাম গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে চক্ষে প্রেমাশ্রু স্বতঃই বাহিয়া পড়ে। শ্যামের ইষ্টমূর্ত্তির আরতি, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে ইষ্ট দর্শন,—ভক্ত ভগবানের সেই অপূর্ব্ব কাহিনী বড়ই হৃদয়গ্রাহী, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। 'শান্তি' পাঠ করিতে করিতে প্রকৃতপক্ষেই হৃদয়ে শান্তির পূর্ণ আবির্ভাব হয়। পাঠক! তুমি যদি শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া থাক, তবে একবার এই শান্তি-চিত্রটী পাঠ করিও।

গ্রন্থকার শান্তির একস্থলে লিখিয়াছেন—"শুনি না কি, শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনমন্দিরে সেই দেবলীলা এখনো সমানে হয়। কৃষ্ণের বাঁশী এখনো তেমনি বাজে। ভাবের কাণ লাভ করিলেই না কি তাহা শুনা যায়। তবে, হে ভাবরূপী ভগবান্! এস, একবার এ হৃদয়ে ব'স, আমি তোমায় দেখি। তেমনি বিনোদঠামে, ব্রজাঙ্গনার মন ভুলাইয়া শ্রীরাসমঞ্চে যেমন বসিতে, সেই ভাবে একবার ব'স দয়াময়! ব'সে সেই মোহন বাঁশীটি একবার বাজাও, আমি শুনি। 'বাঁশী বাজ দেখিরে'—বলিয়া ভক্ত যেমন তোমায় লইয়া মাতিয়াছিলেন, আমি তেমন পারিব না, তবে তোমায় প্রাণ পূরিয়া একবার দেখিব, বড় সাধ। আজন্ম বৃথায় ঘুরিয়া মরিলাম, কত জন্ম এ ভাবে কাটিয়াছে, হায়! তাই বা কে জানে,—যদি দয়া কোরে, পতিত ব'লে, একবার দেখা দাও পতিতপাবন—এই ভরসা! বড় সাধে, বড় আশায়, শ্যামের সংসার আঁকিতেছি, যদি সেই ভক্তের পুণ্যফলে—ভক্ত পরিবারের আশীর্ব্বাদে,

একবার তোমার দেখা পাই জনার্দ্দন!" লেখকের আরাধ্য-দেবতা, প্রেম ও শান্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা, কাঙ্গালের ঠাকুর, পতিতপাবন, ভক্তবৎসল, দয়াময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এ ক্ষোভ রাখিবেন কি?

নিম্নে 'প্রেম ও শান্তি'র দুইটী গীত উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

-৮৮৮ল দেনারে প্রাণটা যাব পায়।
ছুটি পাবি, ঘরে যাবি, ঠেকৃবিনিরে কোন দায়।
নাইকো কোন খরচ পত্র, চেষ্টা শ্রম জমি যোত্র,
সরলতা কেবলমাত্র, ইহার উপায়—
চিন্‌বি কি মন, এমন রতন, এবার এ কাট্‌মায়॥

(২)

কবে হবে মম শুভদিন সমাগম।
নয়নে হেরিব শ্যাম নব ঘন॥
যবে নাথ নাথ বলি,　　পড়িব গায়ে ঢুলি,
গাইব প্রাণ খুলি সরস প্রেম গান॥
শারদ পূর্ণিমা,　　অদৃষ্ট আকাশে,
উদয় হইবে মাতিব রাসরসে,
যমুনা পুলিনে,　　নিকুঞ্জ কাননে,
হৃদি বৃন্দাবনে বসিবে নারায়ণ॥
ভক্তি কেশদামে,　　মুছাব রাঙ্গাচরণ,
হৃদি বৃন্দাবনধামে বসিবে নারায়ণ॥

সূত্রধর-তত্ত্ব। ৬৮।১ নং ক্যাথিড্রালমিশন লেন হইতে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকে লেখক সূত্রধর জাতির উৎপত্তি ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সময়ে নিজ নিজ জাতির উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রশংসার্হ। সূত্রধরগণের জাতির বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পড়িলে অনেক জানিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সংবাদ।

১৬ই আশ্বিন হইতে ১৯শে আশ্বিন পর্য্যন্ত, ৺ শারদীয় পূজার দিবস চতুষ্টয় কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীপ্রভুর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল। অনেক সেবক একত্রিত হইয়া মাতৃনাম গানে প্রাণে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর, শুক্রবার ৺ কালীপূজার রাত্রে শ্যামপুকুরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তজনকে কালীপূজার আয়োজন করিতে বলেন। ভক্তগণ সকলই আয়োজন করিয়াছিলেন কিন্তু মাতৃমূর্ত্তি আনার কোনও প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই, অথবা তাহা যে করিতে হইবে, ইহাও কাহারও মাথায় আসে নাই। রাত্রি প্রায় আটটা হইলে সকল জিনিসপত্র ঠাকুরের সম্মুখে সাজাইয়া দেওয়া হইল। পরে ঠাকুরের আদেশে কিছুকাল সকলে ধ্যান রত অবস্থায় স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন। এমন অবস্থায় সেবক রামচন্দ্রের মনে উদয় হইল যে, "উঁনি পূজা করিবেন, কি আমরা উঁহার পূজা করিব।" এই কথা তিনি গিরীশবাবুকে কাণে কাণে বলিলেন। গিরীশবাবু ইহা শ্রবণমাত্র উৎসাহিত হইয়া "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া পুষ্পাদি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন, আরও সকলে দিলেন। ঠাকুর, মা আনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ, ভক্তগণ নবভাবে নিমগ্ন। এক অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। যাঁহারা এই বিবরণ ভালরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সেবক রামচন্দ্র প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী এবং শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পাঠ করিবেন। এই ভাবের পূজা সেই হইতে সেবক রামচন্দ্র পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন এবং প্রতি বর্ষে যোগোদ্যানে ঠাকুরের কালীপূজা সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার প্রাণপ্রতিম প্রিয় শিষ্যগণ অদ্যাপি এই পর্ব্ব সেই ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এবারে কালীপূজার রাত্রেও মহা সমারোহে ঠাকুরের পূজা হইয়াছিল।

১৭ই কার্ত্তিক, জগদ্ধাত্রী পূজার দিন, যোগোদ্যানে সেবক রামচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল। প্রায় শতাধিক ভক্ত একত্রিত হইয়া প্রভুর পূজা ও নাম গুণগান করিয়া সমস্ত দিবস আনন্দ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রায় সহস্র কাঙ্গালীকে অতি পরিতোষরূপে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ান হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শয়ন-গীতি।

(কীর্ত্তনাঙ্গের সুর)

কাশীপুরোদ্যান, মনোরম্য স্থান,
আপ্তজন সনে মেলা।
নিত্যধাম যেন, প্রেম আস্বাদন,
অহরহ প্রেমলীলা॥ (কিবা) (আপ্তজন সনে)
বসন্ত বিকাশ, মধু মধু মাস,
পূর্ণশশী হাসি চায়।
মৃদুল চঞ্চলে, চলে বায়ু দুলে,
শাখা পাতা নাচে তায়॥ (কিবা মনোহর)
অপরূপ শোভা, অতি মনোলোভা,
ভকত মোহিত প্রাণ।
সদা অকিঞ্চন, শ্রীপ্রভু সেবন,
নাহি সাধ মনে আন॥ (কিছু চাহেনা আর)
নিশির ভোজন, যবে সমাপন,
প্রভুর শয়ন-বেলা।

ভকত সকল, শেষ বিছাইল,
সাজিয়ে গৃহের তলা॥ (অতি পরিপাটি)
অতি সুকোমল, ধবল, বিমল,
সুখদ শয়ান ছাঁদ।
শুতিল তাহায়, প্রভু গুণরায়,
রামকৃষ্ণ হৃদি চাঁদ॥ (গৃহ আলো করে)

(কিবা) শ্রীঅঙ্গ ঢালিয়ে প্রভু শয়ন করিল।
পূর্ণ শশধর জিনি এ চাঁদ হাসিল॥
ভকত-চকোর-চিত সেবা সুধা আশে।
একে একে বসে পাশে মনের হরষে॥
রাখাল, যোগেন বসি বিজনী ঢুলায়।
শশী ও শরৎ বসে শ্রীপদ সেবায়॥
বাবুরাম, নিরঞ্জন আসি সাথে সাথ।
ধীরি ধীরি শ্রীঅঙ্গেতে বুলাইছে হাত॥
ক্রমেতে প্রভুর হয় নিদ্রার আবেশ।
সেবা সমাপন করে ভকত বিশেষ॥
অবশেষ শশী বসি পাদমূলে রয়।
মন্মনা তাহার চিত প্রভুর কৃপায়॥
অপরূপ প্রেমলীলা প্রভুর আমার।
তন্ময় হৃদয়ে হেরে ভাব চমৎকার॥

ক্ষীরোদ সাগরে যেন, শুতি রহে নারায়ণ,
রামকৃষ্ণ সেই মত সাজে। (হায়গো)
সুস্থির সে দেহ-কল, শ্বাস নহে চলাচল,
দেহী নাই সেই দেহ মাঝে॥
(আধার ফেলে যে পালালো)
বৃহৎ রোহিত মীনে, ধরি যদি কোন জনে,
সাগরের জলে ছাড়ি দেয়। (হায়গো)
গম্ভীর আনন্দ ভরে, সে মীন যেমতি চরে,
প্রভু-আত্মা সেই মত ধায়॥ (সচ্চিৎ সাগর মাঝে)

চিদানন্দে সন্তরণ, ব্রহ্মসুখ আস্বাদন,
দেহ-খাঁচা সাধ নহে আর। (হায়গো)
পুন ভাবি জীব-ত্রাণ, অবয়বে অধিষ্ঠান,
রামকৃষ্ণ দয়া-অবতার॥ (এমন দয়াল আর নাইরে)
মীন যবে স্থিতি রহে সলিলের মাঝে।
থির সে সরল দেহে চেতনা রাজে॥ (কিবা রাজে গো)
দেহী যথে প্রভু-দেহে করে আগমন।
জাগ্রত নিদ্রিত ভাব অভেদ মিলন॥ (মিলন গো)
সে ভাবে শায়িত প্রভু ভাবে মনে মনে।
সেবকে শকতি দিব জীবের কারণে॥ (শক্তি দিব গো)
তাদের পরশে জীব জ্ঞান-আঁখি পাবে।
চেতনা লভিয়ে সবে হেথায় আসিবে॥ আসিবে গো)
যতনে ধরিয়ে হাতে মাতৃ কোলে দিব।
হেন মতে জগজীবে ত্রাণ পথে নিব॥ (আমি নিবো গো)
নেহারি এ লীলা শশী বিভোর পরাণে।
নয়ন মুদিয়ে রহে রামকৃষ্ণ ধ্যানে॥
(ধ্যানে রহে গো) (রামকৃষ্ণ রূপ ধ্যানে শশী রহে গো)
প্রভুর শয়ন-ছবি, ভাব জীব নিরবধি,
ত্রাণ পাবে এ ভবের দায়। (হায় গো)
সেবকে শরণ লয়ে, অকপট চিত হয়ে,
সঁপ প্রাণ রামকৃষ্ণ পায়॥
(প্রাণের সকল জ্বালা দূরে যাবে)

সংসারীর ব্রহ্মবিজ্ঞান।*

(১)

আমি মনে করিতাম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার এমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এখন আর কিছুতে তেমন উৎসাহ নাই। যৌবনে যদিও আর বড় দাবি করিবার নাই, কিন্তু তার আগে হইতেই যেন জাল গুটাইতে

* সত্য ঘটনা।

হইয়াছে। এমনি একভাবে, একটানা স্রোতের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া যেমন গঙ্গার স্থির বক্ষ আন্দোলিত ও বিক্ষোভিত করিয়া তুলে, ভাবের তরঙ্গও তেমনই বুকে বড় আঘাত করিত, কিন্তু মাংসপিণ্ডের এই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য দেহ-বেলায় আঘাত পাইয়া সে তরঙ্গের তেমন স্ফূর্ত্তি হইত না। সাধ-আহ্লাদের অভিনয়ে কখন পড়িতে হয় নাই—এমন নহে, কিন্তু আনন্দে কখন আত্মবিলোপ ঘটে নাই, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি—আমি উহা হইতে স্বতন্ত্র।

মনে মনে বৃথা ভাবিতাম, এখন সব গিয়াছে। মনে করিতাম—বাসন্তী মারুতদোদুল্যমানা ব্রততীর সে শোভা আর নাই, সান্ধ্য-নীলাকাশের সে নীলিমাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে, চিরহাস্যময়ী দিগঙ্গনার প্রফুল্ল মুখকমল হইতে সে লাবণ্য মুছিয়া গিয়াছে। মনে করিতাম, যৌবনের বিদায়-অবসরে জীবনের অতীত কামনারাশির সমাধি হইয়াছে। যেমন জীর্ণ দেবমন্দির—তার সকলই পতনোন্মুখ, কেবল বড় বড় অশ্বথের শিকড় বড় বড় ভগ্নস্তূপ আঁকড়াইয়া রাখে, তেমনই সকলই গিয়াও যেন অন্তরের অন্তরে স্মৃতির শিকড়ে ভাবের জমাট বাঁধা পড়িয়াছে।

মনের এই ভাব যেমনই হউক, আমি বস্তুতঃই তত আশাহীন হই নাই। যৌবনের দীপ্ততেজে এখনও বুঝি এক একবার উৎসাহিত হই। মনে হয়, একটা ঝাঁকরাণী পাইলে বুঝি বা দেহের ও মনের এ অবসাদ ঘুচিয়া যায়! একদিন সেই ভাবের একটা ঘটনায় পড়িয়াছিলাম।

(২)

বন্ধু বলিলেন,—"এস, তীর্থদর্শনে যাই।"

"কোথায়?"

"পুরুষোত্তমে।"

উত্তম কথা। জগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দেখিব, অনেক দিন হইতেই প্রাণের বাসনা, সুযোগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল।

যাত্রার আয়োজন করিলাম। গৃহিণী ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে হইবে। তীর্থদর্শনে যদি পুণ্য থাকে, মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় যদি সৌন্দর্য্য থাকে, সে পুণ্য, সে সৌন্দর্য্য, সে মনের আনন্দ হইতে গৃহিণীকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা হইল না—তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। জননীও পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলেন।

আ মরি মরি! কি দেখিলাম! ইহজীবন কেন, জন্মান্তরেও এ আনন্দ ভুলিবার নহে। দেব-দর্শনে এত আনন্দ, এত সুখ—বুঝি কখন পাই নাই। দেহের জড়ত্ব বুঝি ঘুচিয়া গেল। প্রাণের ভিতর একটা যেন বেশ ওলটপালট হইয়া গেল, হৃদয়ের তলদেশে যেন কি জমিয়া গিয়াছিল, এই বিলোড়নে তাহা বিক্ষিপ্ত হইল, বেশ একটা মধুর অনুভূতি হইল—আমি ভক্তি-গদগদ-চিত্তে, নিমীলিত নয়নে তন্ময় হইয়া রহিলাম। মহাপাপীর হৃদয়ে মহাপ্রভুর অনন্ত করুণার বুঝি বিন্দুপাত হইল, আমি ধন্য হইলাম।

চক্ষু চাহিয়া দেখি, অশ্রুপরিপ্লুত নয়নে, গৃহিণী একান্ত মনে দেবতার পানে চাহিয়া আছেন। হাসি-মুখে বলিলেন, "তুমি এ সৌভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছিলে?"

তখন দুই জনে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। নিকটে এক সাধক গাহিতেছিলেন,——

দিন যবে—রবে না,
দীনবন্ধু হে।
যাবে হে দিন—সুখে দুঃখে,
থাকবে সুধু ঘোষণা॥

* * *

এই সঙ্গীত আমার বড়—বড় মধুর লাগিল। হরিনাম সর্ব্বসময়ে, সর্ব্ব অবস্থায় মধুর; কিন্তু ভক্তের অভিমানের সহিত হরিনাম মধুর হইতেও মধুরতর। আমি আত্ম-বিভোর হইয়া শুনিতেছিলাম।

গীতসমাপনান্তে, সাধক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা তাঁহার পদধুলি লইলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইতঃপূর্ব্ব হইতে এক নবীন সন্ন্যাসী আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। আমি সন্ন্যাসীকেও প্রণাম করিলাম। তিনি ঈষৎ হাস্য হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি ঐ গায়কের প্রতি এত মুগ্ধ হইতেছিলে কেন?"

আমি। শুনিয়াছি, উনি বড় ধার্ম্মিক লোক। একজন সাধুপ্রকৃতি ভগবদ্ভক্ত। ভক্তমাত্রেই লোকের পূজনীয়। কেন না, উঁহাতে ভগবানের অধিষ্ঠান।

সন্ন্যাসী। উঁহাতে ভগবানের আবির্ভাব না কি?

আমি। নিশ্চয়ই। ভগবানের বিশেষ কৃপা না পাইলে, ভক্ত হইবেন কেন?

স। আমি উঁহার আদ্যন্ত জানি। একজন সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তি বৈ আর কিছুই নহে। গলা মিঠা, দুটা হরিনাম করিলেই কি ভক্ত হয়?

আমি। আমরা সংসারের জীব, সংসারী-ভক্ত আমাদের হৃদয়কে অধিক আকৃষ্ট করে। উঁহার স্ত্রী পুত্র আছে, সংসারের চিন্তা আছে, সুখদুঃখের তারতম্য আছে। তথাপি উনি ভগদ্ভক্ত। কেন না, উঁহার সর্ব্বকর্ম্ম ধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত উনি কর্ম্মফলে অনাসক্ত, একান্ত দয়ার্দ্রচিত্ত এবং ভক্তিই জীবনের সারবস্তু বলিয়া, ভক্তির সাধনা করেন।

তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"উঁহার প্রতি তোমার ভক্তি অচলা হউক, কিন্তু উঁহাকে ভক্ত বলিতে আপত্তি আছে। জ্ঞানই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ভক্তি দুর্ব্বল চিত্তের অবলম্বন। সংসারের চিন্তায় যে জ্ঞানের সাধনা সম্ভবপর হইলে, তুমিও জ্ঞানী হইতে পারিতে, তুমিও একজন ভক্ত হইতে পারিতে। স্ত্রী পুত্রের চিন্তা করিবে, না ভগবানের ধ্যান করিবে? অর্থের চেষ্টায় জীবন যৌবন ক্ষয় করিবে, না কঠোর ধর্ম্মসাধনায় জীবন উৎসর্গ করিবে? যাহাদের পুত্রমুখ দর্শন করিবার সাধ আহ্লাদ আছে, দশের মধ্যে প্রতিষ্ঠাবান হইতে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারা একটু কোমল হৃদয়ে ভক্তিগদগদ হইয়া হরিনাম করিয়া, তোমাদের নিকট সহজেই ভক্ত হইতে পারে।"

আমি এই সন্ন্যাসীর বিষয় ইতঃপূর্ব্বে অবগত ছিলাম। ইনি নিজেকে বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত, সংসারে বীতস্পৃহ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতেন। সংসারজীবের মধ্যে ধর্ম্ম থাকিতে পারে, ঈশ্বর নির্ভর থাকিতে পারে, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় থাকিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এইরূপ আত্মাভিমান তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি যখন তখন, যেখানে সেখানে পরিবারগ্রস্ত ভক্তদিগের প্রতি আক্রমণ করিতেন। তিনি তাঁহার দলের নায়ক ছিলেন, তাঁহার শিষ্যসংখ্যাও বিস্তর ছিল। আমার সময়ে সময়ে সন্দেহ হইত, এইরূপ শিক্ষাভিমানী, সন্ন্যাসব্রতধারী, আপাতব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সন্ন্যাসী সংসারের কি কাজে আসিতেছেন? শিষ্যগণের সংগৃহীত অর্থে ইঁহাদের স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন হয়, কোন চিন্তার দায়ে পড়িতে হয় না, সংসারে কোন কাজেই ইঁহারা লিপ্ত নহেন, বিশেষ বিচার করিয়া পরহিতব্রত পালন করেন,—ইঁহারা শ্রেষ্ঠ? না, যাঁহারা দুঃখদারিদ্র্যের মধ্য দিয়াও সৎপথে থাকিয়া পরিবার প্রতিপালন, অতিথি অভ্যাগতে দয়া, স্বজনে প্রীতি, পরোপকারে আত্ম-

বিসর্জ্জন করেন এবং সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় ভগবানে আস্থাবান্, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ? যেই শ্রেষ্ঠ হউন, সে বিচারে আমাদের কাজ নাই। যিনি ভক্ত, যিনি আপনা হইতে আমার ভক্তি, আকর্ষণ করেন, তিনি প্রণম্য। তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্‌কে মনে পড়ে, তাঁহাকে দেখিয়া বলিতে হয়,—ভগবানের করুণাধারা, তাঁহার ভিতর দিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে। এ প্রকার ভক্ত কখনই উপেক্ষনীয় নহেন।

গৃহিণী চুপি চুপি বলিলেন, "ঠাকুর দেখা হল, এখন উঠ, তর্কের মহা-মারীতে কাজ কি? এখানে যে পঞ্চতীর্থ আছে, সমুদ্রও তাহার অন্যতম। চল সমুদ্র দেখিয়া আসি।"

(৩)

এই সেই বঙ্গোপসাগর! কি বিরাট ব্যাপার! দূর হইতে সে গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে আসিতেছিলাম। দূর হইতে সুনীল জলরাশির অত্যুচ্চ তরঙ্গের অপূর্ব্ব লীলা দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম। উপরে অনন্ত নীলা-কাশ, নিম্নে অনন্ত সমুদ্র, মাঝে উত্তাল তরঙ্গমালা; যেন সেই তুষারশুভ্র-তরঙ্গ, বায়ু দ্বারা আকাশে ও সমুদ্রে কি মধুর স্পর্শের অভিনয় করিতেছে। সৈকতভূমি কতদূর অতিবাহিত করিয়া, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলাম। সে গাম্ভীর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যের লীলা দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইলাম। আনন্দ, ভক্তি, ভয়,—যুগপৎ সকল ভাবের অভিনব সমাবেশ হইল, আমি আত্মহারা হইলাম।

তারপর ধীরে ধীরে সমুদ্রে অবগাহন করিলাম। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া, কখন ভাসাইয়া লইয়া গেল, কখন একেবারে তীরে উঠাইয়া দিল, কখন আছড়াইয়া ফেলিল, কখন তরঙ্গের মাথায় চড়াইয়া বসাইল—সে এক সভয় আনন্দের অপরূপ লীলা-খেলা। গৃহিণী আমার পার্শ্বে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমার পাঁচ বৎসরের শিশুটিও প্রথমে আমার ক্রোড়দেশে থাকিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু তরঙ্গের সে রঙ্গ-ভঙ্গে কে কোথায়, কখন পড়িতেছে—তাহা ঠিক করা যায় না। আমার বৃদ্ধা জননী, দুই চারিবার ওলটপালট খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তীরে দাঁড়াইয়া মহাসমুদ্রের সে তরঙ্গ-লীলা দেখিয়া, সরল বালিকার ন্যায় উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

আমি সত্যই তখন সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে তুমুল আলোড়ন ও বিলোড়নে আমার হৃদয়েও যেন একটা ওলটপালট হইয়া গেল, কিছুকালের পর যেন একটা ঝাঁকরাণী পাইয়া বুকের ভার লঘু হইয়া গেল।

তরঙ্গের তালে তালে আমার শিশুগণের সে আনন্দ-নৃত্য দেখে কে! গৃহিণী সহাস-নয়নে তাহাদিগের প্রতি চাহিতেছেন, পিছন হইতে বিশালতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া দিল, তিনি উঠিতে না উঠিতে আবার আমি ডুবিলাম।

এই বিশাল সমুদ্র দেখিয়া পিতম্' পাগল যে সমুদ্রকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল.* সে এমন কিছু অন্যায় করে নাই। চাঞ্চল্যে এমন গাম্ভীর্য্য, গাম্ভীর্য্যে এমন মাধুর্য্য, আতঙ্কেও এমন আনন্দ বুঝি কোথাও নাই! ক্ষুদ্র মানব। নিজের ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া, অনন্তে বিলীন হয়।

আমরা তীরে উঠিয়া সমুদ্রকে প্রণাম করিতেছিলাম। দেখিলাম পূর্ব্ব কথিত সেই সাধক হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইতেছেন। আমি বলিলাম, "ঠাকুর, এই শ্রীক্ষেত্র যেমন সার তীর্থ, এই মহাসমুদ্রও তেমনই চক্ষের সার দ্রষ্টব্য। যদি আর সব ভুলিয়া যাই, এই সমুদ্র ভুলিতে পারিব না।"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মা'র আমার কত ভাবেই যে নৃত্য করতে সাধ যায়, তা কেমন করে' বলব? তাঁর অনন্তরূপ, তাই তিনি লীলাময়ী। ঐ দেখো, তিনি না নাচলে কি সমুদ্রের এমন শোভা হয়?"

সহসা দেখিলাম, একটী শিশু উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া ছুটিতেছে, তাহার জননী অতি দ্রুতপদে আগে চলিয়াছে। যুবতী সুন্দরী, কিন্তু বিষাদ প্রতিমা; আলুলায়িত কেশ পৃষ্ঠে দুলিতেছে, বস্ত্রাঞ্চল ভূমিতে লুটাইতেছে; ঘন ঘন নিশ্বাসে বক্ষ কম্পিত হইতেছে। যুবতী অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কাহাকে ধরিবার জন্য চলিয়াছে, শিশু জননীর সঙ্গ রাখিতে না পারিয়া পিছনে ছুটিয়াছে।

আমি বলিলাম, "ঠাকুর একি? বোধ হয়, কেহ সঙ্গী-হারা হইয়াছে?"

সাধক হাসিয়া বলিলেন,—"দেখ্‌লে বাবা, মায়ের কত লীলাখেলা! বেটী সমুদ্রে নাচে; এই তপ্ত বালির উপর ছুটে। খানিক দাঁড়িয়ে যে একটা কিছু দেখ্‌বো তার জো নাই। সব ত সেরে নিতে হবে, তাই মা আমার সব দিকে ঘুরিয়ে নে বেড়ান! ও আমার জন্যই ছুটেছে—নইলে আমার প্রাণে টান পড়ে কেন?"

(৪)

আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল, একটু শীতল বাতাসও বহিতেছিল। বর্ষাকাল না হইলেও, যেন বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল।

* মাধবীলতা।

তবু বাহির হইলাম। সমুদ্রপারে দাঁড়াইয়া অস্তগামী সূর্য্যের শোভা দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু স্পর্দ্ধা কোথায়? চলিলাম।

শিশু কয়টিকে জননীর নিকট রাখিয়া, গৃহিণীকে লইয়া দিবাবসানে সমুদ্র তীরে গেলাম। কি আশ্চর্য্য, সেই বিশালসমুদ্রপারে জনমানব কেহ নাই। কেবল আমরা দুটী।

আমরা বুঝি নাই, কিন্তু আর সকলে বুঝিয়াছিল ঝড় উঠিবে। সেইজন্য সকলেই ইতিপূর্ব্বে সমুদ্র হইতে ফিরিয়াছিল।

যখন দুটীতে সেই বিশাল তরঙ্গলীলাময় সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলাম, সত্য কথা বলিতে কি, আতঙ্কে আমাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল। আমি সেই মেঘাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশতলে, সেই গম্ভীরনাদী, ঘোর বেগে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভয়ে অভিভূত হইলাম। প্রাতে যাহাকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি, দিবাবসানে তাহার তীরে দাঁড়াইতে সাহস হইতেছে না। নিতান্তই ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মনে করিয়া ভাবিলাম—এই অনন্তের মাঝে আমরা দুটি কি, আমারা কতটুকু! তখন সহসা মনে হইল, আমাদের পূজা-বাড়ীর উঠানে বাল্যকালে একটী প্রকাণ্ড জল-পাত্র দেখিতাম, তাহাতে কার্য্য-উপলক্ষে শত শত লোকের পানীয় জল থাকিত। একদিন সেই পাত্রের উপর দুইটী অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, ইহারা কতটুকু? যদি পা পিছলাইয়া এই জালার মধ্যে পড়িয়া যায়,—কে জানিবে, ইহাদের কি হইয়াছে! কোন স্থানে ইহাদের একটু চিহ্নমাত্র থাকিবে না। আজ আমারও সেইরূপ মনে হইল। এই দুইটী অতি ক্ষুদ্র মানুষ পিপীলিকা এই বিশাল সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া! আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া গৃহিণীকে ফিরিবার জন্য বলিলাম।

দেখিলাম, তিনি সমুদ্রের উপকূলে বসিয়া, অঞ্চল বিছাইয়া রাশি রাশি ঝিনুক কুড়াইতেছেন। যেমন শরতের প্রভাতে আমার কুটীরপ্রাঙ্গণে শ্বেত শিউলি ফুলের রাশি বিস্তীর্ণ থাকে, সমুদ্রের উপকূলে তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত ঝিনুকের রাশি তেমনি বিস্তৃত;—গৃহিণী সাগ্রহে সেগুলি অঞ্চলে তুলিতেছেন। ভয়ের লেশমাত্র নাই।

আমি অবাক্ হইলাম। এক একবার দু'একটা তরঙ্গ গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া নূতন ঝিনুক লইয়া প্রস্থান করিল, গৃহিণী সরিয়া গিয়া আবার কুড়াইতে

লাগিলেন। তিনি বলিলেন "ভয় কি? যদি ঝড় উঠে, ঝড় দেখা যাবে। সমুদ্রে ঝড়ের বড় সুন্দর শোভা হবে।"

কে বলে, রমণী বিধাতার কোমল সৃষ্টি। প্রকাণ্ড জাহাজ তরঙ্গাভিঘাতে চূর্ণ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু যে কুসুম শিশিরসংস্পর্শে সঙ্কুচিতা হয়, সে অনায়াসে তরঙ্গের মাথায় চড়িয়া হাসিতে হাসিতে ভাসিয়া যায়! এ রহস্য কে বুঝিবে?

সহসা ঝড় উঠিল। অন্ধকার রাত্রি—প্রবল বাতাস, বাতাসের সহিত প্রবল বৃষ্টি। সমুদ্র ও আকাশ এক হইয়া গেল। সমুদ্রের গর্জ্জন গম্ভীরতর হইল, আকাশেও তাহার গম্ভীর আহ্বানের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। সমুদ্রের কিছুই দেখা যায় না, কেবল মনে হয়, সেই অন্ধকার রাত্রিতে যেন কোন বিরাট প্রান্তরে কোটী কোটী লোক শুভ্র কার্পাসের বোঝা মাথায় করিয়া ছুটিয়াছে। আর সেই শুভ্র সফেন তরঙ্গে তরঙ্গে কি এক সুন্দর ছটা বাহির হইল। যেন সমস্ত সমুদ্রবক্ষ শুভ্র বৈদ্যুতিক আলোকে ভরিয়া উঠিল। প্রবল বাতাসে তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত সলিলরাশি চোকেমুখে পড়িতে লাগিল। নিরাশ্রয়ে, সিক্তবস্ত্রে সেই অনাবৃত সমুদ্রতটে প্রায় অর্দ্ধপ্রহর অতীত হইল।

এখন মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় আতঙ্কে অবসন্ন হয়, কি অসীমসাহসের কাজ করিয়াছি। উভয়েই শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। গৃহিণী আবার বায়ুরোগগ্রস্তা; মনে হইল, যদি এই সময়, এইখানে, তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হন, উপায় কি? লোকালয় নিকটে, কিন্তু সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া যাইতে বহু বিলম্ব, তাঁহাকে একা এই সমুদ্রগর্ভে রাখিয়াই বা কিরূপে যাইব।

তখন যুক্তকরে জগন্নাথকে ডাকিলাম। যাঁহার ইঙ্গিতে এই প্রলয়ের সংঘটন তিনি ভিন্ন কে ইহাকে শান্ত করিবে? বৃষ্টি কমিয়া আসিল, কিন্তু বাতাস উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। আমি সাহসে ভর করিয়া, গৃহিণীকে সেই সৈকতভূমি পার করাইলাম। যখন উপরে উঠিলাম, সাহস বাড়িল, কিন্তু পথ নির্ণয় করিতে পারিলাম না। সম্মুখে যে পথ পাইলাম, চলিলাম। গৃহিণী আর চলিতে পারেন না, দেহ অবসন্ন হইল, আমি আকুল হইলাম। অতি দ্রুতপদক্ষেপে যাইয়া একটী আশ্রম দেখিতে পাইলাম। দ্বারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলাম, "কে আছ রক্ষা কর।"

আলোক লইয়া, এক সন্ন্যাসী আসিয়া আমার বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"আমাদের আশ্রমে স্ত্রীলোকের আসিবার অধিকার নাই। আপনি স্ত্রীকে বাহিরে রাখিয়া, ভিতরে আসিতে পারেন।"

আমি বিপদের কথা জানাইলাম। ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইবার ভয়ে, তিনি একটুকুও বিচলিত হইলেন না, কেবল বলিলেন,—"আমি তোমায় রক্ষা করিব, রমণী আমার শত্রু—শত্রুকে আমি রক্ষা করিব না।" সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমি কোনও উত্তর করিলাম না দেখিয়া, তিনি স্বচ্ছন্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া গেলেন।

আমরা নিরুপায় হইয়া পথিপার্শ্বে বসিয়া রহিলাম।

ঝড়ের বেগ ঈষৎ প্রশমিত হইলে, আবার চলিলাম। এক গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিলাম। সেই বাড়ীর গৃহিণী আমাদের দুর্দ্দশা অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীকে অন্দরে লইয়া গিয়া, শুষ্কবস্ত্র ও গরম গাত্রবস্ত্র দিলেন। বিশ্রামের পর রাত্রি দশটার সময় বাসায় আসিতেছি, পথে সাধকের সেই বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠে সাধক-কবি শ্রীজয়দেবের স্তোত্র শুনিতে পাইলাম। তিনি ভক্তি-গদগদ চিত্তে গাহিতেছেন,—

"ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণি ধারণ-কিণচক্রগরিষ্ঠে,
কেশব ধৃত কূর্ম্মশরীর! জয় জগদীশ হরে।"

আমি তাঁহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি এই দুর্য্যোগে কোথায় গিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন,—"তোমরা যেমন বাহির হইয়াছিলে, আমিও তেমনি বাহির হইয়াছিলাম। মা'র আমার জগদ্ধাত্রীরূপ যেমন ভুবন আলো করে, এই ভয়ঙ্কর কালীরূপও তেমনি ভুবন অন্ধকার করে। কেবল আলো দেখেই কি বিচার হয়?—তোমরা এ দুর্য্যোগে কেন বাবা?"

"আমি তো বলেছি, সমুদ্র দেখে আমার আশা মিটে না, আমি সন্ধ্যাবেলা তাই দেখতে এসে, এই বিপদে পড়েছি।"

"এ আর বিপদ কি বাবা, ভগবানের দান পেতে গেলে, এ সব বুক পেতে নিতে হবে, চাহিবামাত্র পেলে কি মনের বাঁধন হবে, না সে বাঁধনের জোর আসিবে?"

দেখিলাম, সাধকের বক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদিত কি রহিয়াছে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, ওটা কি?"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"একটা বিড়াল, পোড়ারমুখীর কত ঢং, ঝড়ের সময় সব পালাল, আমিও দৌড়ে যাচ্ছি, উনি কোথা হতে বিড়াল হাতে আমার পিছু নিলেন। ঝড়ে মরবে কেন, তাই বুকে তুলেছি।"

আমি তাঁহার পদধূলি লইলাম। সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন—সেতো এই?

হে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসি! হে রমণী-ভয়-বিহ্বল ব্রহ্মচারি! হে বেদান্ত-দর্শনাভিমানী জ্ঞান-সাধন-তৎপর মহাপুরুষ, একবার চেয়ে দেখ, বৎসরান্তে পুত্রমুখদর্শনাকাঙ্ক্ষী, সংসারে প্রতিষ্ঠাপরায়ণ, সুখদুঃখসমাকুল এই মহাত্মা তোমার অপেক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সেই যুবতীর কি হইল?" তিনি বলিলেন,—"এক মোহান্ধ জীব, ঐ যুবতীকে কুলত্যাগিনী করে। সে অনেক কথা। যৌবনের প্রবল বন্যায় বেগবান হৃদয়কে বিশ্বাস কি? কিন্তু ভোগের একটা জ্বালাও আছে। যুবক শেষে অনুতাপে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। অনেক করিয়া বুঝাইলাম, যুবতী তাহার মমতা কাটাইতে চাহে না।—কিন্তু লোভে হতাশ হইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছে।"

আমি। তবে সে পতিতা?

সাধক। পতিতা না হইলে, আমি তার পদধূলি লইব কেন?

আমি বিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "যে পতিতা বলে নিজেকে বুঝেছে—মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে, অমনি পতিতপাবন তাহাকে দয়া করেছেন। যার উপর ভগবানের দয়া পড়ে, সে কি সামান্য গা?"

(৫)

গৃহে ফিরিয়া দেখি, জননীর চক্ষে নিদ্রা নাই। শিশু পুত্রেরা পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, সকলেই মনে করিয়াছে, তাদের পিতামাতা আজ সমুদ্রগর্ভে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে।

পরদিন প্রাতে সাধকের বাড়ী গেলাম। পতিতার কি হইল, জানিবার জন্য বড় আগ্রহ হইয়াছিল। দেখিলাম, মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া সেই গৃহস্থাশ্রমী সাধক মধুর হরিনাম করিতেছেন। আমার অভিপ্রায় জানাইলাম।

তিনি হাসিতে হাসিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি একটি কুটীরে গিয়া দেখিলাম, যুবতীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে, পার্শ্বে সেই সোণার শিশু ঘর আলো করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে।

আমি চমকিত হইলাম। তিনি বলিলেন,—"কেন, এই ত ঠিক; কার্য্য ফুরাইল, মা ডেকে নিলেন।"

আমি শিশুর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম,—"ইহার কি হইবে?"

উন্মুক্ত বাতায়নে প্রভাত-রবির উজ্জ্বল কিরণ বিকশিত হইল, সেই রবিকণা শিশুর অধর স্পর্শ করিল, নিদ্রা অপসারিত হইল। আমি দেখিলাম, শিশুর অধরে হাসি ফুটিল—সেই রবিকণার আর হাসিতে মিলিয়া গেল।

ব্রহ্মদর্শী সাধক বলিলেন, "ঐ দেখ, মৃতা জননীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া শিশু হাসিতেছে। জগতে যে মাতৃপিতৃহীন অনাথ,—ভগবান্ তাকে কোলে করিয়া মানুষ করেন। ঐ হাসিই তার নিদর্শন।"

অনেক দিন হইল, পুরষোত্তম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সেই পতিতা রমণীর মৃতদেহ পার্শ্বে নির্ভীক শিশুর সেই হাসি আজিও আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সেই গম্ভীরনাদী কূলপ্লাবী অকূল সমুদ্র, তাহার উত্তাল তরঙ্গলীলা, সেই প্রবল ঝড়, মানসচক্ষে যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। সেই সাধু-মহাপুরুষের অদ্ভূত চরিত্র—যিনি তরঙ্গলীলায় বিশ্বজননীর নৃত্য, পতিতা রমণীতে মায়ের অনুরূপ, ক্ষুদ্র বিড়ালশিশুতে ব্রহ্মদর্শন, রজনীর অন্ধকারে কালীরূপী মায়ের ভীষণরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তিনি যে ভাবেরই সাধক হউন না, তিনি যে ধন্য, তিনি যে প্রণম্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

সেবক শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৫ পৃষ্ঠার পর)

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রজা-নির্ণয়।

তোমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি কি করিয়া রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য-প্রজাবৃন্দের পরিচয় পাইবে এবং কাহাদের সঙ্গে মেশামিশি করিবে। আমি প্রত্যুত্তরে এই বলি যে, মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-নামধারীকে সেই সাম্রাজ্যের প্রজা বলিয়া জানিবে। কিন্তু মিশিতে হইলে কতকগুলি ব্যক্তিগত ভাব অগ্রে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। তারপর মেশামিশি, আলাপ-পরিচয়, কেননা—ঋষিগণ বলিয়াছেন, 'স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে'। স্বভাব সংস্কারপ্রসূত। সংস্কার সহজে যায় না।

কিন্তু একদিন না একদিন যাইতে বাধ্য। সুতরাং সৎস্বভাবাপন্ন, আদর্শজীবন-ধারী, রামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ প্রজার সঙ্গে তোমার মিলন আশুফলপ্রদ ও অবশ্যকর্ত্তব্য।

এখন সেরূপ প্রজা চিনিতে হইলে এইটুকু দেখিয়া লইতে হইবে যে, যাঁর সঙ্গে তুমি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতে যাইতেছ, তিনি পরধর্ম্মের বিদ্বেষী কি না; অপরধর্ম্মাবলম্বীকে তদীয় নিজ-মার্গে সাহায্য করিবার পরিবর্ত্তে তিনি তাহার উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত কি না? যদি মনে হয় যে, তিনি পরধর্ম্ম-বিদ্বেষী, উচ্ছেদসাধন-প্রয়াসী বা স্বার্থসাধনাকাঙ্ক্ষী—তাঁহার মুখে রামকৃষ্ণ-নাম শুনিলেও উচ্চতম সোপানারোহণে অসমর্থ তাঁহাকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু তাঁহাকে ঘৃণা বা তাঁহার নিন্দা করিবে না। কারণ ভগবান যাহাকে যেমনটী করিয়াছেন, সে তদ্রূপই হইয়াছে। বলিয়াছি, রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যভুক্ত প্রজাকে সকল ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব মার্গে সাহায্য করিতে হইবে—তাঁহাদের জীর্ণ-শীর্ণ ধর্ম্মবাটীর সংস্কার করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে আপন আপন পথের পাথক করিতে হইবে। আমার এই কথাটীর সমর্থনের জন্য রামকৃষ্ণ-সরোজে উপবিষ্ট, বিবেকানন্দ-মধুকরের একটী সুমধুর গুঞ্জন পাঠককে শুনাই। তিনি বলিতেন "Ours is the formation and not destruction" অর্থাৎ গঠনই আমাদের মূলমন্ত্র, বিনাশসাধন নহে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যভুক্ত প্রকৃত প্রজা, যাঁহাকে দেশ-জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে পরধর্ম্ম-বিদ্বেষবর্জ্জিত, আপন ধর্ম্মে সর্ব্বথানুরক্ত, পরনিন্দা বিষবৎ পরিত্যক্ত এবং অপরকে তাহার নিজ মার্গে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত দেখিতে পান, সেই সরলপ্রাণ ব্যক্তিকেই আপনার মনে করেন এবং তাঁহাকে রামকৃষ্ণ-সুবিশাল-সাম্রাজ্যভুক্ত পথিক বলিয়া জানিতে পারেন।

পাঠক! তুমি এক্ষণে সন্দেহের দোলায় একটু দোলায়িত—সন্দেহ-রাক্ষসীর করাল কবলে পতিতোন্মুখ—অধীর—অস্থির। ভাবিতেছ, আপন আপন ভাবের ভাবুক হইবার জন্য প্রবর্ত্তনা-দান-প্রয়াসী মানব, অপরকে তাহার নিজ ভাবটীর উন্নতিকল্পে প্রবর্ত্তনা দেয়—এ স্বভাব সে কোথা হইতে পাইবে? এ যে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার! তাই, তোমাকে মাঝখানে কয়েকটী কথা না বলিলে তুমি নয়নোন্মীলন করিতে পারিবে না। সুধু এইটুকু বলি যে, হে পাঠক! তুমি রামকৃষ্ণ-জীবনী ইত্যাদি পাঠ কর। তারপর একান্ত মনে ভাবিয়া আমায় বল যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ,—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীযীশুখ্রীষ্ট, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীমহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনানক ইত্যাদি অবতার সমূহের সমষ্টি কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচনায় নিবিষ্ট পাঠক! তুমি আমার সহোদর-প্রতিম। তোমাকে এইবার 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করি। আচ্ছা! ভাই! ইহার মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে, বাহির করিতে পারিবে? শ্রীরামচন্দ্র যে ভাবের ভাবুক হইয়া মানবসমাজ সম্মুখে একটী অপূর্ব্ব চিত্র ধারণ করতঃ লীলা সাঙ্গ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ যে কয়টী ভাবরাজ্যে বিচরণপূর্ব্বক মানবকে সুদুর্লভ মধুর রসের অধিকারী করিয়া লোকচক্ষুর অগোচর হইলেন; যীশু যে করুণভাবের খেলা খেলিয়া ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া নরদেহ পরিত্যাগ করিলেন; শ্রীচৈতন্য যে ভাবে বিভোর হইয়া জীবকে অমূল্য রত্ন বিনামূল্যে বিলাইয়া প্রস্থান করিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি;—অহোরাত্র স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ভেদী 'মা' 'মা' রবে উন্মত্তপ্রাণ, দ্বিজ-তনয় নিরক্ষর রামকৃষ্ণ, তিন্ তিন্ দিনে সেই সমস্ত ভাবগুলির চরমে পৌছিলেন!! এ যে শোনা কথা নয়! জলন্ত সত্য!! যাঁহারা—যে ভাগ্যবান্ মহাত্মারা তাঁহাকে দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা যে সশরীরে বর্ত্তমান!!! পূর্ব্বপূর্ব্ব অবতারে এক একটী ভাবের চরমে পৌছিবার জন্য কোথায় জীবনব্যাপী পরিশ্রম—আর এবারে তিন্ তিন্ দিনে সমস্ত সুসম্পন্ন! বশিষ্ঠ, রামচন্দ্রকে যড়ঙ্গবেদ অধ্যাপন করাইলেন, সুতরাং রামচন্দ্র বেদবিৎ; শ্রীকৃষ্ণের গীতা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি পণ্ডিত শিরোমণি; মহম্মদের এক হাতে কোরাণ অন্য হাতে খড়্গ; নানকাদি পণ্ডিতাগ্রগণ্য; শ্রীচৈতন্য প্রকাশানন্দ-প্রমুখ পাণ্ডিত্যাভিমানিগণের দর্পহারী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভগবান; কিন্তু হায় রে! রামকৃষ্ণ নিরক্ষর, রাণী রাসমণি-নিযুক্ত দক্ষিণেশ্বরস্থ কালীবাটীর পূজারী, দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার! পাঠক পাঠিকা! এ কুহেলিকা ভেদ করে সাধ্য কার? তিনি যাহাকে বোঝান—সেই ভাগ্যবানই বুঝে। 'ধরা না দিলে কে পারে ধরিতে মোরে' কথাটী বাস্তবিক সত্য। আবার দেখ, নব ভাবের ভাবুক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র; বেদোজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন, ইউরোপখণ্ডে সর্ব্বত্র পূজিত, ভারতপ্রিয় মোক্ষমুলার; বঙ্গবিভাগের শিক্ষাবিভাগীয় স্থিরবুদ্ধিসমন্বিত ডাইরেক্টার মিষ্টার টনি; বৈজ্ঞানিকজগতে যুগান্তর উপস্থিতকারী, বিজ্ঞানালোচনা-লুব্ধ চিকাগোবাসী মিষ্টার হুপার ইত্যাদি ইত্যাদি দেবস্বভাবসম্পন্ন, সরস্বতীর বরপুত্রগণ এদিকে ইঁহার নিকট প্রণত মস্তক! কেন? এ যে বিচিত্র! অতি বিচিত্র! অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব! এই বিজ্ঞানালোকিত, অন্ধবিশ্বাস-প্রতিকূল, বিশুদ্ধ বস্তুর আদর-শিক্ষায় শিক্ষিত বর্ত্তমান যুগের নয়নোন্মীলন করিবার জন্য বুঝি এ ব্যবস্থা! যাহাই হোক, তুমিও খাঁটী কি বুজরুকি জানিবার

জন্ত একবার বাজাইয়া লও। তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন—মাথা নীচু করিয়াছেন বলিয়াই যে তোমাকেও তাহা করিতে হইবে, এ কথার কোনো তাৎপর্য্য নাই। কিন্তু প্রকৃত সত্য লাভ প্রয়াসী সরল অন্তঃকরণে তোমাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। তর্কজালে জড়িত হইয়া নহে, কারণ "এ যে বিষম কলিকাল, ভক্তি গেল, যুক্তি এল, তর্কের জঞ্জাল।" ভাই, তাঁহার এত সাধনৈশ্বর্য্যাদি সুধু অবিশ্বাসকূপ-পঙ্কে নিমগ্ন তোমার আমার জন্ম নয় কি? কামিনী কাঞ্চন-ত্যাগী রামকৃষ্ণের ত একটা কোনো সাধনা করিয়া তাহাতে সিদ্ধ হইলেই হইত, এত বিভিন্ন ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার কি প্রয়োজন? ভাই! মানব কখনো এক জাতি, একভাব, বা এক ধর্ম্মবিশিষ্ট হয় নাই ও হইবার নহে। বোধ হয় সেই জন্যই অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা! এইবার হয় ত একটু বুঝিতে পারিয়াছ যে, রামকৃষ্ণ-বটবৃক্ষ কেন বিভিন্ন ধর্ম্ম-জাতি সম্প্রদায় দেশাবিশিষ্ট পৃথিবীর উপর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া ছায়া প্রদানোদ্যত। তাই রামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে আগত ব্যক্তি মাত্রেই সকল ভাব বা সমস্ত মতকে এক একটী পথ বলিয়া জানেন।

বিবেকানন্দ, রামচন্দ্র, অভেদানন্দাদি তারকাসমন্বিত রামকৃষ্ণ সুধাকর আজ আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে সেই অমৃতময় চন্দ্রিকা বিতরণ করিতেছেন—মানব, তুমি কি তাহা দেখিতে পাইতেছ? না, এখনও লোকের বাক্যজালে জড়িত মন লইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ? ভাই, আর একটা কথা বলিয়া রাখি,—জল-বায়ু চন্দ্র-সূর্য্য-সম নিরপেক্ষতার প্রতিমূর্ত্তি রামকৃষ্ণ। তোমার আপন ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাতে তোমার ইষ্টমূর্ত্তির আবির্ভাব অনুভব করিতে যিনি শিক্ষা দেন, তিনি এ সাম্রাজ্যের ভাব কিছু বুঝিয়াছেন জানিও। তৎপরে সময়-স্থান-পাত্র ভেদে যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা তিনি (ভগবান্) করাইয়া লইবেন, যাঁহার যাহা প্রাপ্তব্য তাঁহাকেও তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে পাইতে হইবে।

আর একটু দেখিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চনে বিভোর কি না। যিনি কামিনীর মোহিনী ফাঁদে পড়িয়া প্রাণ মন অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—যাঁহার রমণীরূপনিহিত দৃষ্টি আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দেখিয়া লইতে চাহে না—পরদার কামনাদির যৎসামান্য রেখাও যাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে, তিনি অত্যাপি এ সাম্রাজ্যের প্রজা নামে অভিহিত হইতে পারিবেন না। আর যিনি কাঞ্চনের জন্ম আত্মহারা; প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা

ইত্যাদি যাঁহার অঙ্গীভূত তিনি 'এ ঘাটের' নহেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের নাম করিলেও জানিতে হইবে যে, তিনি বহু বিলম্বে এধারে আসিবেন, এইরূপ অনেক পশ্চাৎপদ; অথবা ভণ্ড, যাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ কহিয়াছিলেন :—

"পাষণ্ড তরাতে আমি পারি অবহেলে,
ভণ্ডদের গতি কিন্তু নাহি কোনকালে।"

যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া রামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন—

"ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে হইবে না।"

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের যথার্থ প্রজা স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত। পাঠক! মানস-নয়নে একবার স্বামী বিবেকানন্দকে পরিদর্শন কর। আর যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ নিজে বলিতেন—'জনক দেখিতে হয় তো কলিকালে রাম দাদাকে দেখ"—সেই রামচন্দ্রের নিঃস্বার্থপরতার মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সাফল্য প্রতিপাদন কর। যতই অবতার বল, মহাপুরুষ বল, নেতা বল—পৃথিবীর ইতিবৃত্তে ইহা জলন্ত সত্য যে, স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কেহ এ সংসারে মানবের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন নাই; তাই বলি, এ সাম্রাজ্যে আসিতে হইলে এ সাম্রাজ্যের প্রজা হইতে হইলে, স্বার্থত্যাগ—তীব্র স্বার্থত্যাগ—অমানুষী স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। তিনিই—সেই আদর্শ স্বার্থত্যাগীই—এ সাম্রাজ্যের গৌরবস্বরূপ।

পাঠক! তুমি শুনিয়াছ কি?—কোনো সুধীবর তত্ত্বপিপাসু জীবনের সারগর্ভতা অনুভব করিয়া শূন্য শব্দ নিচয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করতঃ একদিন এই পূতশ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

"শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণং।"

তাই বলিতেছিলাম যে, রামকৃষ্ণসাম্রাজ্যে প্রজার একটী লক্ষণ এই যে, তিনি কখনো পাণ্ডিত্যাভিমানে অভিমানী নহেন। রামকৃষ্ণদেব যেমন খুব চুম্বকে এক একটী কথা বলিতেন, তিনিও সেইরূপ সামান্য কথায় বৃহদ্ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। শেষোক্ত প্রজারা রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ শাসনের উপযোগী। এ সাম্রাজ্যে গৃহিগণ ভ্রমরের মত রামকৃষ্ণ-চরণ-পুষ্প-মধুপানে সর্ব্বদা প্রমত্ত। সন্ন্যাসীবৃন্দ এও করেন এবং লোকশিক্ষা-দান ইঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য। কারণ রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—

"আমলী কমকে করে ধ্যান,
গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান,

যোগী হোকে কুটে ভগ্,
এ তিন্ আদ্মী কলিকা ঠগ্।"

অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া যাঁহারা ধ্যানস্থ হয়েন, যাঁহারা গৃহী হইয়া জ্ঞান উপদেশ প্রদানে প্রয়াসী, যাঁহারা যোগী হইয়া স্ত্রীসঙ্গ করেন—তাঁহাদিগকে কলিকালের প্রতারক বলিয়া জানিতে হইবে। তাই গৃহিগণ সে কার্য্য হইতে আপনাকে পৃথক্ রাখেন। তবে জনক-সদৃশ জীবনধারী মহাত্মা রামচন্দ্রের ন্যায় গৃহিদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা সন্ন্যাসীর আদর্শ, গৃহিগণেরও পূজ্য। কিন্তু এই শ্রেণীর লোক যে অত্যন্ত বিরল বা সাধারণ লোক চক্ষুর সর্ব্বদা গোচরীভূত নহেন, তাহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এই প্রজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গের শেষ এবং অতিশয় গুরুতর আবশ্যকীয় বিষয়টী এই যে, হে আসঙ্গ-লিপ্সু মানব, তুমি সাথী বিহীন হইয়া কালাতিপাত করিতে কষ্ট বোধ করিবে, তাই উপরোক্ত লক্ষণগুলি যাঁহাতে একাধারে দেখিতে পাইবে, তাঁহাকে তোমার সাথীরূপে গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু চাণক্য-পণ্ডিত বলেছেন "একশ্চন্দ্র তমোহন্তি নচ তারাগণৈরপি।" তাই মনে পড়িয়া গেল যে, এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি তোমার ভবিষ্যত সাথীর প্রাণে বুকভরা গুরুভক্তি দেখিতে না পাও, তবে তাঁহার সঙ্গে সখ্যতা করা দূরে থাক্, তাঁহার সংস্পর্শে না আসাও মঙ্গলজনক। গুরুভক্তি চন্দ্রস্বরূপ, অন্যান্য গুণাবলী নক্ষত্র মালার অনুপাতে ধর্ত্তব্য। আরবিদিগের একটী চলিত কথার উদ্ধার করিয়া আমি প্রজ্ঞা-নির্ণয় প্রস্তাবের উপসংহার করি।

"He that knows not and knows not that he knows not, is a fool,
shun him.
He that knows not and knows that he knows not, is simple,
teach him.
He that knows and knows not that he knows, is asleep,
rouse him.
He that knows and knows that he knows, is a wise man,
follow him."

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত।

আশা।

আশার নেশা বোঝা ভার। কখন যে কি ভাবে মানব হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, তাহা লোক বুদ্ধির অগোচর। অথচ কখনও কোন মানব আশা শূন্য নাই। প্রত্যেকেই আশার কুহকে জড়ীভূত। নানা ভাবে, নানা প্রকারে, মানব হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। এই আশাতেই জগৎ পূর্ণ। কাহার বিদ্যার আশা, কাহার ধনের আশা, কাহার প্রেমের আশা, কাহার মানের আশা, কাহার নামের আশা; কাহার বা ভ্রমণের আশা, কাহার রাজ্য সুখের আশা; আবার কাহারও বা কবি হইবার আশা ইত্যাদি। যেখানে যাই, সেইখানেই এইরূপে মানব-হৃদয় আশালতায় আচ্ছন্ন দেখি। কিন্তু কেহই ভাবেনা, কেহই জানে না, যে তাহার অন্তর কন্দর এক অভিনব আশায় পূর্ণ রহিয়াছে। আচ্ছা। কেহ কি আমায় বলিবে, আশাটা কি? আমি বলি আশার নামই আশা। কেননা,—কোনও বস্তু বা পদার্থকে কামনা করাই ত আশা; কিম্বা আমি যে চাই, তাহাই কি আশা নয়? হাঁ, ইহাই সত্য। আমি বা যে কেহই হউক না কেন, আমরা যে পাইবার জন্য কামনা বা আকাঙ্ক্ষা করি, সেই কামনা বা ইচ্ছার নামই যে আশা, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ, ইহাই স্বীকার্য্য।

তবে বল দেখি ভাই, কিরূপ আশা করা আমাদের উচিৎ? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধেয় এবং আধার অন্বেষণ করাই প্রকৃত আশা। কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য বলিতে অনেক বুঝাইবে; তন্মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ এবং লভ্য, তাহারই আশা কর। ভ্রাতৃগণ বৃথা কালক্ষেপ করিয়া কিম্বা বৃথা তর্ক করিয়া কোন ফলোদয় হইবে না। এ জগৎ আশাময়, আশায় পূর্ণ; যখন আমরাও এই জগৎবাসী তখন আমরাও ঐ আশায় মুগ্ধ; আশায় আমাদের অন্তঃস্থল পূর্ণ। তবে যদি আমায় বল,—"আশা সিদ্ধির পদ্ধতি কি?" তাহার উত্তর—"সৌন্দর্য্যের আরাধনা কর।" তারপর দেখিবে, সমস্তই সফল হইয়াছে।

তাই বলিয়া মনে রাখিও, সৌন্দর্য্য বলিতে অনেক আছে; সেই অনেকের মধ্যে একটী সৌন্দর্য্যে আধেয় এবং আধার দুইটিই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছে। আমি সৌন্দর্য্য বলিতে,—রমণীর বাহ্য হাবভাবময়ী সৌন্দর্য্য অথবা প্রাকৃতিক কোনও বিশেষ শোভা-সৌন্দর্য্য অথবা কুসুমকলিকার কমনীয় মনোমোহন সৌন্দর্য্যের কথা তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি না; আমি

যাহা বলেতেছি তাহা আপন আপন অন্তর মধ্যেই নিহিত আছে; খুঁজিলেই পাইবে। তবে খুব সাবধানে, খুব সন্তর্পণে অনুসন্ধান কর, বৃথা বাক্যব্যয় বা পণ্ডশ্রম করিও না। এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর, সেই সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ পাইবে।

যদি বল, "কর্ম্ম ত্যাগ কিরূপ ভাবেঁ করিব, অথবা ফলকামনা-শূন্য কর্ম্ম কি?" তাহার উত্তর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কর্ম্মী, কর্ম্ম কর; আর ফল বা শুভাশুভ পাপপুণ্য আমায় (ঈশ্বরে) অর্পণ করিয়া; রণে প্রবৃত্ত হও।" আবার বর্ত্তমান সময়ে সেই শ্রীকৃষ্ণই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছেন—"আমায় (ঈশ্বরে) সর্ব্ববিধ কর্ম্মের জন্য বকলমা দিয়া নিশ্চিন্ত থাক।" সেই দীনসুহৃদ দয়ালঠাকুর প্রতি দ্বারে দ্বারে, মহাপাপীগণের উদ্ধার সাধন করিয়া, শেষে অদৃশ্যাত্মা হইয়া সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, এবং "আত্মভূতাহি দৃষ্টতু, ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার আদেশ-বাক্য লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারই রূপসাগরে মগ্ন হইয়া "রুচির কনকজ্যোতিঃ" সন্দর্শনানুরূপ আশা কর। প্রকৃত আনন্দ, প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাহাতেই পাইবে।

অযথা কালক্ষেপকারী সংসার-মায়ায় আবদ্ধ জীবগণ! একবার ভাবিয়া দেখ;—সেই পূর্ণব্রহ্ম "শ্রীকৃষ্ণ", আর এই "রামকৃষ্ণ" একাত্মা কি না? পুরাকালে সংস্কৃত ভাষার আদর ছিল এবং ঐ ভাষা প্রচলিত ছিল, তাই পূর্ব্ব ভাষে "গীতা" নামে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশামৃত প্রচারিত হইয়াছিল। এক্ষণে কালভেদে ও দেশভেদে ভাষান্তরে ঠাকুরের আদেশ বা উপদেশামৃতকে একালের "গীতা" বলিলে কোনও প্রকার দোষ হয় না। সে "গীতা" সর্ব্বানন্দময়, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়।

এখন যদি আশার মত আশা করিতে চাও; তবে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে মন প্রাণ সঁপিয়া দাও। ইহারই নাম প্রকৃত আশা। নতুবা বৃথা কামিনী ও কাঞ্চনের—আসক্তিতে ডুবিয়া কূলহারা হইয়া, মৌখিক 'কোথা কূল' 'কোথা কূল', করিয়া ভবসমুদ্রে ডুবিও না। হে বিভ্রান্ত জীব! রমণীর রমণদাস হইও না, কিম্বা কাঞ্চনলালসার কুটিলচক্রে নিপতিত হইয়া আত্মাকে অন্ধমনের দাস করিয়া রাখিও না। একবার কামিনী ও দেহের পরিণাম ভাবিয়া দেখ দেখি; কি ভীষণ। ভাবিয়া দেখ দেখি, নাই বস্তুর আশা কি বৃথা আশা নয়? এই জড়দেহ, যে দেহের এত যত্ন যে দেহের সুখপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়

আমরা কত দূরই যে অগ্রসর, সেই দেহ, সেই বড় সাধের, বড় যত্নের দেহ, কখন যে ভস্মে কিম্বা শৃগাল, কুকুরের আহার অথবা স্রোত-সলিলবাহিনীর বক্ষে ভাসমানরূপে পরিণত হইবে, তাহা কি কেহ জানে? তবে বল ভাই! সেই শেষের সেদিনে এই দেহের সুখশান্তি কোথায় রহিবে? যে রমণীর মোহে সংসার বিষময়; পিতা মাতা বা স্নেহের ভ্রাতা ভগ্নীকেও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হও না, সেই স্ত্রী, সেই দেহ সুখদায়িনী, হৃদিবিলাসিনী রমণী, কোথায় থাকিবে ভাবিয়াছ কি? নশ্বর সংসার-লীলায় এ আনন্দ কোথায় থাকিবে? এই জীব-দেহ, কি নর-দেহ, কি রমণীর কমনীয় অঙ্গ, সময়ে এ সমস্তই ভস্মে কিম্বা শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি জীবগণের ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইবে। তবে এর জন্য এত মায়া কেন?

অপর দিকে দেখ, কাঞ্চন বা অর্থ-লালসার ঘৃণ্য প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, না হইতেছে কি? সমস্তই হইতেছে বটে কিন্তু হয় নাই ঈশ্বরের তুষ্টি আর হৃদয়ের অন্তরাত্মার শান্তি। দেখ, যে অর্থ আজ আমার, হয় তো—কাল তোমার, তারপর আবার সংসারের কোন্ অজানিত প্রদেশে ক্রমে ক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া যাইতেছে। তবেই দেখ, এই অর্থ বা কাঞ্চনও কাহারও চিরস্থায়ী নয়। আর যে দেহের সুখে তুমি কিম্বা আমি সদাই সুখী, সেই বড় সাধের দেহ তোমার বা আমার চিরস্থায়ী কার? এ যে কেউ বুঝেনা, বা কেউ জানে না, তাও নয়,—সকলেই জানে যে, এ দেহ ক্ষণভঙ্গুর, কাচ সদৃশ, অথবা এ অর্থও ক্ষণস্থায়ী; তত্রাচ দেখ, প্রতি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, এমন কি প্রতি ঘরে ঘরে, এই কামিনী ও কাঞ্চন লইয়াই হাহাকার! কোথাও অর্থের জন্য দস্যুতা, কোথাও এই অর্থের লোভেই রমণীর সতীত্বহরণ; কোথাও আবার নরহত্যাদি অঘটন ঘটনের খেলা; নিত্য নূতন ভাবেই চক্রধরের সংসার-চক্রের প্রতি আবর্ত্তনে ভীষণ কোলাহল। চক্রের প্রতি ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও মায়াময়ের মায়ায় আচ্ছন্ন জীবগণ কামিনী কাঞ্চনের মায়ায় এবং মোহে আবদ্ধ। কিন্তু এ সকল কদিনের জন্য ভাই?

আবার এই সকল কারণেই, ভগবান বহুবারে বহুমূর্ত্তিধারী হইয়া মহান্ধ জীবগণের মুক্তি-মানসেই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া মধ্যে মধ্যে সতর্ক করিয়া দেন, তাই তিনি অবতার। নরসমাজের মন মতি যথাপথে চালিত করিয়া দিয়া আবার তিনি বিরাম লাভ করেন। যখন এইরূপে বিরাম লাভ করেন, তখন তিনি অন্তরীক্ষে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করেন।

তবে আর কেন ? এস ভাই,—প্রভুর আদেশে আমরা সকলে মিলিয়া, সেই ভগবানরূপী জগৎতারণ মধুসূদন মোহনিসূদন "রামকৃষ্ণ" নামে হৃদয়পূর্ণ করিতে আশা করি। বৃথা কামিনী কাঞ্চনের আশায় বিরত হইয়া, সেই আশাময়ের সৌন্দর্য্যময় লাবণ্য অথবা প্রভুর "কনক-জ্যোতিঃ" সন্দর্শন করি, এস।

সেবক শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

তোমার বিরহে নাথ! হৃদি শূন্যময়,
জীবন মরণ সম অনুভূত হয় ;
হৃদয় সর্ব্বস্ব তুমি,
তুমি প্রভু, দাস আমি,
তবে কেন দীন দাসে না কর স্মরণ ;
চিরাশ্রিতে দাও প্রভু! চরণে শরণ ॥

নাহি চাই ধন জন, কামিনী কাঞ্চন,
প্রাণের পরাণ তুমি পরশ-রতন ;
তব পাদ-পদ্মমূলে,
বিকায়েছি বিনামূলে,
তন্ মন্ ধন্ বলি দিয়াছি তোমায়,
কেমনে বলিব ভাব সসীম ভাষায় ॥

ভুলে গেছি বিদ্যাবুদ্ধি, বেদান্ত জল্পনা,
ভুলে গেছি ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বন্দ্ব আলোচনা ;
ভুলেছি অতীত স্মৃতি,
বর্ত্তমান, ভাবীগতি,
জীবন মরণ তত্ত্ব বুঝিতে নাহিক আশ ;
তব মুখ পানে চেয়ে মিটেছে নিখিল ত্রাস ॥

জীবন মরণ সম, যবে তোমা ভুলি,
অন্ধকারে প্রাণ করে আকুলি ব্যাকুলি ;

কিন্তু যবে হৃদি মাঝে,
তব মূরতি বিরাজে,
ইন্দ্র চন্দ্র যমরাজে নাহি কার ডর ;
শতসিংহ দীপ্তবীর্য্য পূরিত অন্তর ॥

অভ্রভেদি সিংহনাদ, শুনি অনন্ত অম্বরে,
ব্রহ্মজ্ঞান তুচ্ছ হয় যেখানে তোমারে হেরে ;
জীবনের আশা তুমি,
ওহে পরাণের স্বামি !
শিরায় শিরায় তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই ;
তুমি ভিন্ন ভবে অন্য আর যে বাসনা নাই ॥

প্রারব্ধ করম স্রোতে, যেদিকে ভাসিয়া যাই,
তরঙ্গ তুফানে যেন তোমারে নাহি হারাই ;
তব পদ ভেলা ধরে,
অকূল ভব পাথারে,
চলেছি ভাসিয়া প্রভো ! হইয়ে আপনহারা ;
অনন্ত আঁধার পথে তুমি মোর ধ্রুবতারা ॥

প্রাণারাম আত্মারাম, ইষ্ট ব্রহ্ম তুমি মোর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম তব পদে করজোড় ;
তোমারি একাংশে হয়,
কোটী সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তুমি কিন্তু নিরাধার নির্ব্বিকার জ্যোতিঘন।
তব ভয়ে ইন্দ্র চন্দ্র করিছে আজ্ঞা পালন ॥

তোমার মহিমা প্রভো ! বলিতে নিরস্ত শ্রুতি,
মুনি ঋষি ধ্যানপথে হেরে তব শুভ্র জ্যোতি,
তুমি শিব জ্ঞানময়,
তুমিমাত্র লীলাশ্রয়,

তোমার বিভূতি দেব গন্ধর্ব্ব চারণ নর;
তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম তুমি বিশ্ব চরাচর॥

অন্তরে বাহিরে তুমি, ওহে গুরু প্রাণারাম,
দশদিশি দিবানিশি গায় তব পুণ্য নাম;
তব নামে প্রাণ তৃপ্ত,
মহাসিংহ বলদীপ্ত,
জীবনে মরণে তুল্য অনুক্ষণ জ্ঞান হয়;
মৃত্যুঞ্জয়ী তব নামে হয়ে গেছি সুনিশ্চয়॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।

শ্রীবিবেকানন্দ।

নবনীত তনু তাঁর। এ অবনীতলে
অবতরি গুরুলীলা-সহায় কারণে,
সাধিল অসাধ্য কর্ম্ম, গুরু-ভক্তি বলে;
পারে কি সামান্য নরে সে শক্তি ধারণে?
পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কত অভিনয়—
দেখাইল মহাজন! কে বর্ণিতে পারে?
চমকি চপলা সম হরিল হৃদয়।
কোথায় লুকা'ল হায়! কোথা পাব তাঁরে?
রবি-খর-করে ঢাকা তারকার মালা—
দিবস হইলে শেষ, ঢালে প্রভারাশি;
জ্ঞান-সূর্য্যে ঢাকা তাঁর ভকতি অচলা
মাতাইছে লীলা অন্তে বিভূতি বিকাশি।
গুরুপ্রেমে মাতোয়ারা হে প্রেমিকবর,
মাতাইও রামকৃষ্ণ-নামে চরাচর।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

পৌষ, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, নবম সংখ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠযাত্রা-গীতি।

(যবে) প্রভাত সময় বেলি, পল্লি-বালদল মিলি,
খুদিরাম গৃহ মাঝে যায়। (হায়গো)
(তারা) ডাকে সবে গদাধরে,(১) "ভাইরে গদাই আ'রে
হোলো পাঠে যাবার সময়।"
(দেখ্ দেখ্ কত বেলা হয়ে গেল) (ওরে তুই কি আজ যাবিনা ভাই !)
শুনিয়া বালক-বোল, উচ্চ করি তুলি বোল,
আঙ্গিনায় ছুটিল গদাই। (সখাগণ স্বর শুনে)
গলা ধরাধরি করি, মুখে বলি হরি হরি,
নাচিতে লাগিল সেই ঠাঁই ॥ (সবাই বোল্ হরি হরি বোলে)
দেখি সেই শিশুমেলা, আনন্দ অন্তর ভেলা,
চন্দ্রমণি আই ঠাকুরাণী।
(সে যে পুণ্যবতী শিরোমণি) (শুণেক গদাধর প্রসবিনী)
আসিয়ে তাহার মাঝে, হাতে ধরি শিশুরাজে,
ডাকিলেন ধনি কামারিণী ॥ (সে যে বৃন্দাবন-যশোমতী)

(১) শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের ডাক-নাম 'গদাধর' ও 'গদাই'।

শুনিয়া আইর ধ্বনি ধনি ছুটে আসে।
(কিবা) সাজাসে হৃদয়-ধনে পড়ুয়ার বেশে॥
বাসন্তী-বসনে দিল বাঁধিয়া কোমর।
আঁটিল শিকলি গোট তাহার উপর॥
(কিবা শোভা মরিরে—যেন সোণায় গাছে হীরালতা)
হাতেতে বলয় শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
গদায়ের গোরা রূপ করে ঝলমল॥ (রূপের নিছনি যাইরে)
(আবার) শ্রীঅঙ্গে জড়ায়ে দিল রঙ্গিন বসন।
মসিপাত্র তালপত্র হস্তে সুশোভন॥
(কিবা সুরূপ হোলোরে—পড়ুয়ার বেশ সেজে)
সাজায়ে সে বেশে ধনি বদন চুমিল।
শিশুগণে হৃদিধনে যতনে সঁপিল॥ (বলে 'দেখিস যেন মারিস্ নারে')
সহপাঠীগণে, একত্র মিলনে, ধীরি ধীরি চলে চলি।
(খেলিতে খেলিতে নাচিতে নাচিতে)
(আবার) আরো শিশুগনে, হইল মিলনে, লাহার ভবনস্থলী॥
(গঙ্গাবিষ্ণু, শ্রীরাম আদি)
ধর্ম্মদাস-জায়া,(১) হৃদে বসে মায়া, শিশুগণে অতি প্রীতি। (ও তাঁর)
(আবার) সকল অধিক, স্নেহ সমধিক, খুদিরাম-সুত প্রতি॥
(ভাবে—এই কিরে সেই ব্রজের গোপাল)
সবে সমাদরে, ডাকি লয়ে ঘরে, কোঁচড়েতে মুড় ভরে,
(কিবা) গদাধরে দিয়ে, হরষিত হিয়ে, অনিমিখ মুখ হেরে॥
(ভাবে—শিশুর বেশে এই কি ঠাকুর—তাই)
(কিবা) কলম কাটির চাপে, গদাধর মুড়ি চাপে,
দেখি যত রামাগণে হাসে।
(আহা) লাহার গৃহিণী তায়, হৃদে অতি প্রীতি পায়,
গদাধরে ধরে হৃদি দেশে॥ (সে যে হৃদয় জুড়ানো ধন)
সে চাঁদ-বয়ান চুমি, মনে মনে পদে নমি,
বলে—'বাপ যাও পাঠশালে।'

(১) ধর্ম্মদাস লাহা কামারপুকুরের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার, তাঁহার স্ত্রী।

'থাকিও সবার মাঝে, না যাইও আন্ কাছে,
না মিশিও খল দুষ্ট ছেলে॥'
(তারা পাছে তোমায় মারে ধরে)
(তখন) সেঙ্গাতের(১) হাতে ধরে গদাধর চলে।
আসে পাশে মিলে চলে আর যত ছেলে॥
(তখন) খাইতে খাইতে মুড়ি প্রফুল্ল হৃদয়।
শিশুগণে সমতানে যাত্রাগীতি গায়॥
অনিমিখ লাহা-জায়া ব্যাকুল অন্তরে।
যতক্ষণ আঁখি চলে সে ছবি নেহারে॥ (কত স্নেহ মাখারে)
সবাকার পদরজঃ শির পাতি তুলে॥
অদৃশ্যে এ দাস তার পিছু পিছু চলে॥
(প্রাণের গদাধর জয় গেয়ে—আনন্দে নেচে নেচে)
(যত পড়া মুড়ি খুঁটে খেয়ে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৫১ পৃষ্ঠার পর)

৩৯৭। ঈশ্বরের উপর যদি ভক্তি হ'ল তো সবই হ'ল। হঠযোগের কিছু দরকার নাই।

৩৯৮। হঠযোগে শরীরের উপর বেশী মনোযোগ দিতে হয়। রাজযোগে মনের দ্বারা যোগ হয়; ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারা যোগ হয়। ঐ যোগই ভাল, হঠযোগ ভাল নয়। কলিতে অন্নগত প্রাণ!

৩৯৯। যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। ঠিক যে রাজার বেটা, সে মুশোহারা পায়। যার কোনও কামনা নাই,—সে টাকা কড়ি চায় না; টাকা আপনি আসে। গীতায় আছে—যদৃচ্ছালাভ।

৪০০। যত স্ত্রীলোক সব শক্তিরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে, স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন।

৪০১। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ হয়

---

(১) গঙ্গাবিষ্ণু লাহা।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত হইতে সংগৃহীত।

নাই, ততক্ষণ জন্ম গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু জ্ঞান লাভ হলে আর এ সংসারে আসতে হয় না—পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না।

৪০২। কুমোরেরা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয়। দেখ নাই, তার মধ্যে পাকা হাঁড়িও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়িও আছে? গরু টরু চলে গেলে হাঁড়ি কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সে গুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে, কুমোর তাদের আবার লয়, নিয়ে, চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ারি হয়। তাই, যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

৪০৩। সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? আর গাছ হয় না! মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে, তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।

৪০৪। পুরাণ মতে ভক্ত একটী, ভগবান একটী; আমি একটী, তুমি একটী; শরীর যেন সরা, মন বুদ্ধি অহঙ্কার যেন জল, ব্রহ্ম যেন সূর্য্য। এই শরীর মধ্যে মন বুদ্ধি অহঙ্কাররূপ জল রয়েছে। ব্রহ্ম সূর্য্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্চেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

৪০৫। বেদান্ত মধ্যে ব্রহ্মই বস্তু আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ। অহংরূপ একটী লাটি সচ্চিদানন্দ সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে। অহং লাটিটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অহং লাটিটি থাকলে, দুটো দেখায়, এ একভাগ জল, ও একভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুছে যায়।

৪০৬। জ্ঞানীর লক্ষণ—জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারেনা। বালকের মত হয়ে যায়। লোহার খড়্গ যদি পরশমণি ছোঁয়ান হয়, তখন খড়্গ সোণা হয়ে যায়। সোণায় হিংসার কাজ হয় না। তবে বাইরে হয়ত দেখায় যে, রাগ আছে, কি অহঙ্কার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছু থাকে না।

৪০৭। দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখলে বোধ হয় যে, ঠিক এক গাছা দড়ি পড়ে আছে, কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। জ্ঞানীর কেবল ক্রোধের আকার, অহংকারের আকার, কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহঙ্কার নয়।

৪০৮। জ্ঞানীর হয়ত বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য,—কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ী, ঘোড়া; আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে।

৪০৯। নেতি নেতি করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। নেতি নেতি বিচার করে সমাধিস্থ হলে, আত্মাকে ধরা যায়।

৪১০। বিজ্ঞান,—কিনা বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দেখেছে সে জ্ঞানী, যে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বর দর্শন করে, তাঁর সহিত আলাপ—যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।

৪১১। সংসার ত্যাগ না করলে আচার্য্যের কাজ হয় না, লোকে মানে না। লোকে বলে, 'এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনীকাঞ্চন লুকিয়ে ভোগ করে, আমাদের বলে ঈশ্বর সত্য, সংসার স্বপ্নবৎ, অনিত্য।' সর্ব্বত্যাগী না হলে তার কথা সকলে লয় না। ঐহিক যারা, কেউ কেউ নিতে পারে।

৪১২। সংসার করতে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে। ভোগের জায়গাই সংসার।

৪১৩। যত লোক দেখি, ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে, এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া করে। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকেই শিব বলা হয়, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়, তাঁকেই যীশু বলা হয়, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। 'এক রাম তাঁর হাজার নাম।'

৪১৪। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, সব শাস্ত্রেই তাঁকে চায়, আর কারুকে চায় না। সেই এক সচ্চিদানন্দ। যাঁকে বেদে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই 'সচ্চিদানন্দ শিব' বলেছে; তাঁকেই আবার পুরাণে 'সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ' বলেছে।

৪১৫। বাপ, মা, কত বড় গুরু! তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত, তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান্। বল্লেন 'মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।'

৪১৬। কতকগুলি ঋণ আছে। দেবঋণ, ঋষিঋণ, আবার মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, স্ত্রীঋণ। মা বাপের ঋণ পরিশোধ না করলে কোন কাজই হয় না।

৪১৭। যদি প্রেমোন্মাদ হয়, তা হলে, কে বা বাবা, কে বা মা, কে বা স্ত্রী! ঈশ্বরকে এত ভালবাসলো যে, পাগলের মত হয়ে গেছে। তার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোন্মাদ কি রকম? সে অবস্থা

হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নাই! মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন—ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই, শরীর বলে বোধই নাই।

৪১৮। যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান।

৪১৯। গোপীপ্রেমে কোনও কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করেনা। শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে, কোনও শক্তি, কি সিদ্ধাই, কিছু চায় না।

৪২০। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সূতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হবে না।

৪২১। সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্ব্বভূতে সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বল্লেন, তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বল্লেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহ্লাদ বল্লেন, যদি বর দেবে, তবে এই বর দাও, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের অপরাধ না হয়।

৪২২। যোগী দু রকম। ব্যক্ত যোগী, আর গুপ্ত যোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী, কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়।

৪২৩। জোর করে সংসার থেকে চলে আসা ভাল নয়।

৪২৪। ঈশ্বর সম্বন্ধে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়—অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম ঠিক আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম্ম ঠিক, আর ওদের ধর্ম্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল। কেননা, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ-কার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলতো, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারি'।

৪২৫। দেশকাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় কল্লে, তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় করে, তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন। যদি কেউ

আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তা হলে অবশ্য পথে কেউ বলে দেয়, ওহে ওদিকে যেওনা— দক্ষিণ দিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনও না কখনও জগন্নাথ দর্শন করবে।

৪২৬। যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন, কামার শালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্ব্বিকার; যেমন তেমনি। যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তবে সব সহ্য করতে হবে।

৪২৭। দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর চিন্তা হয় না? দেখনা, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করতো। চারিদিকে বাঘ, ভল্লুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎ লোকের বাঘ ভল্লুকের স্বভাব, তেড়ে এসে অনিষ্ট করে।

৪২৮। এই কয়টীর কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড় মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে কল্লে তোমার অনিষ্ট করতে পারে। তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে, সায় দিয়ে যেতে হয়। তারপর কুকুর। তেড়ে আসে, কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তা হলে বলবে, তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন বলে গালাগালি দেবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তা হলে খুব খুসী হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে। কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জাননা, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা না হলে হয়তো তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, তার আবার উল্টে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হয়।

৪২৯। আমি মনে ত্যাগ করতে বলি, সংসার ত্যাগ করতে বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে, তাঁকে আন্তরিক চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায়।

৪৩০। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। মহাকারণে গেলে চুপ্। সেখানে কথা চলে না।

৪৩১। ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে উঠে, আবার নীচেয় আসতে পারে। ছাদের উপর উঠে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আনাগোনা করতে পারে। অনুলোম, বিলোম। সাত-তোলা বাড়ী, কেউ বারবাড়ী পর্য্যন্ত

যেতে পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ী, সাত-তোলায় যাওয়া আসা করতে পারে। এক এক রকম তুবড়ী আছে, একবার এক রকম ফুল কেটে গেল, তারপর খানিকক্ষণ আর এক রকম ফুল কাটবে, তারপর আবার আর এক রকম। তার নানা রকম ফুলকাটা ফুরোয় না। আর একরকম তুবড়ী আছে, আগুন দেওয়ার একটু পরেই ভস্ করে উঠে ভেঙ্গে গেল। যদি সাধ্যসাধনা করে উপরে যায়, ত আর এসে খপর দেয় না। জীব কোটির সাধ্য সাধনা করে সমাধি হতে পারে, কিন্তু সমাধির পর নীচে আসতে পারে না, এসে খপর দিতে পারে না।

৪৩২। অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ বা কারু শেষ জন্ম।

৪৩৩। জ্ঞানীর পক্ষে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বা কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায়না, কুণ্ডলিনীকে আহুতি দেয়।

৪৩৪। শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সে লোক ধন্য! আর হবিষ্য করে যদি কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে, তা হলে সে ধিক!

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী।

(আকাঙ্ক্ষা ও শুভযাত্রা।)

বহুদিনের সাধ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি ও শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর জন্মভূমি দর্শন করিব। ইতিপূর্ব্বে আমার ধর্ম্মবন্ধুগণ যখন যখন উক্ত তীর্থদ্বয় দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগের সঙ্গী হইয়া দুই তিনবার যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কি জানি কিরূপ বিধাতার ইচ্ছা যে, যাইবার নির্দ্দিষ্ট দিবসের ২।৩ দিবস পূর্ব্বেই আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি; আর যাওয়া ঘটিল না।

১৩১৪ সালের আশ্বিন মাস, বাগবাজার-নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব। এই উপলক্ষে তিনি শ্রীশ্রীমাতৃদেবীকে আনিবার জন্য জনৈক ভক্তকে জয়রামবাটী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আসিবার দিন স্থির হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া শ্রীম-প্রমুখ কয়েক জন ভক্ত ১৫ই আশ্বিন, রাত্রি দশটার ট্রেনে বিষ্ণুপুরে

যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন। পাছে মায়ের বিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়া কোন প্রকার কষ্ট হয়, তাই তাঁহারা তথায় যাইয়া বাসা ঠিক করিয়া ও রন্ধন কার্য্যাদি সমাধা করিয়া রাখিবেন। আমি এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক বলিয়া জানাইলাম। তাঁহারা সানন্দে আমাকে সঙ্গী করিয়া ১৬ই তারিখ প্রত্যুষে বিষ্ণুপুরে পৌঁছিলেন। ষ্টেশন হইতে রাস্তা বাহিয়া প্রায় ২০। মিনিট গেলে বীরদরজার চটি। ইঁহারা একটি চটি ঠিক করিয়া তথায় রন্ধনাদি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা ঠিক দশটায়, স্বামী সত্যকাম সমভিব্যাহারে দুইখানি গোযান একটু দূরে দৃষ্ট হইল। মা বাসায় নামিয়া মুখে কিছু দিলেন। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত গোছগাছ করিয়া বাসা হইতে উঠা হইল। বেলা ১১টায় ট্রেন। আমরা ষ্টেশনে আসিয়া এক ঘণ্টার উপরেও অপেক্ষা করিয়া প্রায় ১২টায় ট্রেন পাইলাম। ট্রেন কোনও কারণে বিলম্ব হইয়াছে। সেই ট্রেনে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। এ যাত্রাতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলাম।

বর্ত্তমান বর্ষের ১৭ই কার্ত্তিক, সোমবার, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিন, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণসেবক মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে; ২০শে কার্ত্তিক শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণাশ্রিত জনৈক ভক্ত কহিলেন যে, তিনি জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দর্শনে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, শুনিয়া তাঁহার সঙ্গী হইবার জন্য মনে মনে যেমন সাধ হইতে লাগিল, আবার হিম লাগিয়া হাঁপানি ও কাশি হইবার ভয়ও হৃদয়ে তেমনি দেখা দিতে লাগিল। যাহা হউক, ২২শে কার্ত্তিক, শনিবার প্রত্যূষেই রওনা হওয়া স্থির হইল।

শনিবারে খুব প্রভাতে উঠিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে একটী পুটলী হস্তে বাটীর বাহির হইলাম। রাস্তায় গ্যাস নিবাইতেছে। শিয়ালদহের মোড়ে প্রথম ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ৫-৪৫ মিনিটে ট্রাম আসিল, তাহাতেই আরোহণ করিয়া ঠিক ৬টায় হাওড়া ব্রিজের সম্মুখে নামিলাম। বড়বাজারের গঙ্গা-স্নানের ঘাটে কত মাড়োয়ারী-নরনারী পূতস্নাত হইয়া স্তবস্তোত্র পাঠ করিতেছে। সে দৃশ্যে হৃদয় পুলকিত হইল। ব্রিজের প্রায় অর্দ্ধেকটা গিয়াছি, দেখি—বটুবাবু (শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত) একজন সঙ্গী সমভিব্যাহারে ষ্টেশনে যাইতেছেন। ইনিই আমার সহযাত্রী, সুতরাং ইহাকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দ হইল। যাইয়াই টিকিট লইয়া আমরা পুরাতন প্লাটফরমে (Old platform) গেলাম। ৬-৫৪ মিনিটে ট্রেন, তখন ৬-২৫ মিনিট,

তখনও গাড়ী প্লাটফরমে আইসে নাই। আমরা বেড়াইতে বেড়াইতে একখানি বি, এন, আর, গাইড্ কিনিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীই অধিক, অনেক জমিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন টিকিট-ইনেস্পেক্টর ঢুকিলেন—এক কুলির হাতে নম্বর লাগানো টিকিট নাই, তাহাকে ধরিলেন। কুলি বলিল 'তোম্ পাকাড়্‌নেকা কোন্ হ্যায়?' সাহেব বলিলেন 'হাম্ কোন্ হ্যায়?—আচ্ছা তোম্‌কো দেখ্‌লায়েগা হাম্ কোন্ হ্যায়।' অমনি কতকগুলি কুলিকে ডাকিয়া তিনি সাক্ষী করিতে লাগিলেন। বেশ অভিমানের অভিনয় দেখিতে লাগিলাম। তখন প্রায় ৬-৪৫ মিনিট হইয়াছে, তবুও গাড়ীর খোজ-খবর নাই। ৭টার সময় গাড়ী প্লাটফরমে পৌঁছিল। আমরা তখন গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। সেই সাহেব একবার সকলের টিকিট দেখিতে লাগিলেন। ৭টা ১৫ মিনিটে ২।৩টা ভোঁ ভোঁ শব্দ করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমরা দিন কয়েকের জন্য কলিকাতা এবং সংসারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

[রেলপথে—যাত্রী সঙ্গে।]

ষ্টেশানের পর ষ্টেশান থামিয়া গাড়ী হু হু শব্দে চলিতে লাগিল। রাস্তার দুধারে নালার জল, তাহাতে মাঝে মাঝে শালুক ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ধান্যের বিস্তৃত ময়দান, চারিদিকেই বাঙ্গলাবাসীর জন্য আহার্য্য বুকে ধরিয়া, পড়িয়া পড়িয়া হাসিতেছে। স্থানে স্থানে কৃষককুল জল সেচিতেছে, কোথাও বা দুই চারিটি গরুকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্তকার আকাশ অতি মেঘাচ্ছন্ন, তাই গাড়ীতে হাওয়া খুব ঠাণ্ডা বলিয়া অনুভব হইতেছে। সঙ্গী-বন্ধু তামাক সাজিয়া লইয়া মাঝে মাঝে শরীর চমকাইয়া লইতেছেন। তামাকের যোগন্ধে অনেক যাত্রী আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে জাহানাবাদ ভগবানপুর গ্রামনিবাসী শ্রীশশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি বিশেষরূপে আমাদের সহিত পরিচিত হইলেন, তিনি প্রায় সমস্ত রাস্তাই আমাদের সহযাত্রী হইয়া বিবিধ প্রকার গল্প করিতে করিতে চলিলেন। গাড়ী ফুলেশ্বরে পৌঁছিলে বামে একটী সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। দূরে যেন বিস্তীর্ণ জলরাশি দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং তাহারই কোল দিয়া যেন একটী পথ প্রবাহিত, তাহার উপর দিয়া মানুষ চলিতেছে। মানুষগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, দূরের জলরাশিটী ভাগীরথী এবং রাস্তাটী একটী বাঁধ। উলুবেড়ের ষ্টেশানের নিকট একটী হাট মিলিয়াছে, অনেক গরু হাটের মাঝে দেখা গেল। কুলগাছী ছাড়াইয়া

দামোদর নদীর পোল। দামোদর এখন খুব ভাল মানুষ, কিন্তু বর্ষায় ইহার প্রকোপ বড়ই বাড়িয়া থাকে। বাগনান ষ্টেশানে গাড়ী থামিলে একজন কহিলেন, 'এইখানে নামিয়া বাণেশ্বর শিবের নিকট যাইতে হয়, সে শিব ভারি জাগ্রত, অম্বলের পীড়াগ্রস্ত শত শত ব্যক্তি এই শিবের পূজা দিয়া এবং মাদুলী ধারণ করিয়া রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছে।' আমরা উদ্দেশ্যে বাণেশ্বরদেবকে প্রণাম করিলাম। ইহার পর রূপনারায়ণের ব্রীজ; খুব বড় নদী—বড় ব্রীজ। পার হইয়াই কোলাঘাট ষ্টেশান। নদীর ধারে দেখি, একখানি 'মোটর কার্' দাঁড়াইয়া আছে। দূরে বাঁধা ষ্টীমারের ধোঁয়া উড়িতেছে। কোলায় আসিলে একটু রৌদ্র দেখা দিল, বেলা তখন ৯টা অতীত হইয়া গিয়াছে, আমি একবার গাড়ী থেকে প্লাটফরমে নামিয়া একটু হাত পা ছাড়াইয়া লইলাম। ইহার পর মেচেদা। এখানে গাড়ী প্রায় ১৫।২০ মিনিট থামে, ইঞ্জিনে জল ভরিয়া লয়, সুতরাং প্যাসেঞ্জারগণের বেশ সুবিধা। অনেকে নামিয়া কলে মুখ হাত ধুইতে লাগিলেন। আমরাও নামিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বেশ গরম গরম মুড়ি ও ছোলাভাজা এখানে বিক্রয় হয়। অনেকে কিনিলেন, আমরাও কিনিয়া লইলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে তবে তাহার গতি করিতে আরম্ভ করা হইল। ক্রমে আমরা কংসাবতী নদী অতিক্রম করিয়া গেলাম। মাঠের মাঝে মাঝে এইবার ছোট ছোট খাল দেখা দিতে লাগিল। সাধারণে এ স্থলে ইহাকে 'কেনেল' বলিয়া থাকে। জমিতে সেচ দিবার আবশ্যক হইলে জমিদারকে টাকা দিয়া এই কেনেল হইতে জল লওয়া যাইতে পারে। যখন গাড়ী যাইয়া বালিচক ষ্টেশানে পৌছিল, তখন দেখি যে, প্লাটফরমে কেবল মাদুর গাঁট্ গাঁট্ বাঁধা স্তুপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। শুনিলাম, ইহার সন্নি কটবর্ত্তী স্থানসমূহে বিস্তর মাদুর প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এইরূপে সর্ব্বত্র, বিশেষ কলিকাতায় প্রায়ই চালান যায়।

বেলা প্রায় ১১-১৫ মিনিটে আমরা খড়্গপুর ষ্টেশানে যাইয়া পৌছিলাম। খড়্গপুর অতি বিস্তৃত ষ্টেশান এবং বি, এন্ আরের বৃহৎ জংসন। ইহাদের লোকো-কারখানা এইখানে অবস্থিত। একমাত্র রেল কোম্পানির দৌলতেই খড়্গপুর একটী সহরে পরিণত হইয়াছে; আগে কেবল ধূ ধূ ময়দান ছিল। এখানে গাড়ী প্রায় একটী ঘণ্টা থাকিবে সুতরাং বেড়াইবার বেশ সুবিধা—আমরা দু'জনে নেমে প্রথমে ব্রীজ পার হইয়া রেলওয়ে সরাইখানা দেখিতে গেলাম। এই স্থানটী, সহস্র লোক থাকিতে পারে এই ভাবে রেল কোম্পানি

প্রস্তুত করিয়াছেন। ৭।৮টী কল, অনেকগুলি পাইখানা, রাঁধিবার স্থান এবং মুদিখানা, খাবারের দোকান এবং টিকিট কাটার ঘরও তাহার মধ্যে দেখিতে পাইলাম। খড়্গাপুরের মাটি বেশ লালাভাযুক্ত, অনেকটা পাহাড়ে ভাবের জায়গা। আমরা পুনবায় ষ্টেশান-প্ল্যাটফরমে আসিয়া 'দেশীয়দিগের' জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানের মধ্যে ঢুকিয়া মুখ হাত ধুইয়া একটী দোকান হইতে গরম গরম পুরি তরকারী হালুয়া জিলিপি ইত্যাদি লইয়া উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। যদিও একটী মাত্র দোকান, কিন্তু খাবার গুলি ভাল। আহারের পর বটুবাবু গাড়ীতে বসিলেন। আমি ষ্টেশানে, এবং ষ্টেশান মধ্য হইতে সহরে ঢুকিবার সুড়ঙ্গ অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলাম। একজন মোটা মেমসাহেব প্ল্যাটফরমে চলিতে ছিলেন, তাহাকে দেখিয়া অনেকেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই, কারণ সেই প্রকার স্থূলাকার কদাচিৎ লোকের দৃষ্টিপথে পড়িয়া থাকে। বিশেষতঃ যাত্রী স্ত্রীলোকেরা তাহাকে হা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, কিছু পরেই মেদিনীপুর ষ্টেশানে পৌঁছিল। এখানে আসিয়া নাড়াজোলের রাজা এবং রাজদ্রোহাদিসূচক মামলাদির কথা মনে পড়িল। বামে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড—সমস্ত মাটি রক্তাভ। একটী লোক বলিলেন, প্রায় দুই ক্রোশ দূরে মহাভারতোক্ত বিরাটরাজের দক্ষিণ গোগৃহ স্থান, এখনও অনেক ধ্বংশাবশেষ তথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ট্রেন ছাড়িলে দক্ষিণে একটী মনোরম্য উদ্যান দৃষ্ট হইল, তন্মধ্যে একটী বায়ুনির্ণয় যন্ত্র রহিয়াছে। তাহার কাঁটা ঠিক দক্ষিণমুখে—কারণ এদিকে উত্তরে হাওয়াটা খুবই ছিল। চলিতে চলিতে মাঠের মাঝে যেখানে যেখানে জল দেখিতে পাইলাম, তন্মধ্যেই ৪।৬টি করিয়া মহিষ পতিত রহিয়াছে। চাষের পর তাহারা জলে অঙ্গ শীতল করিতেছে। নিকটে কোনও বৃক্ষমূলে ৩।৪টী কৃষক বসিয়া কেহ বা দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছে, তাহারাও চাষের পর শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে দেখিয়া স্বামি বিবেকানন্দজীর স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি এই কৃষককুলকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাহাদের বেদনা আপন অন্তরে অনুভব করিতেন। কৃষককুল নগণ্য হইয়াও নীরবে যে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, তাহার পরিশ্রম ফলস্বরূপ তাহারা কিছুই পায় না। ইহাদের শ্রমফলে অপরাপর বিদেশীজাতির আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। এই কৃষককুলের অবিশ্রান্ত রুধিরস্রাবেই মনুষ্যজাতির যাহা কিছু উন্নতি, কিন্তু হায় তাহাদের গুণগান

কে করে? ইহাদের মধ্যে যে নিঃস্বার্থতা, যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখা যায়, শিক্ষিতগণের মধ্যে তাহার শতাংশের একাংশ দৃষ্টিগোচর হয় না—তাই স্বামিজী ইহাদিগের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়াছেন—আমরাও প্রণাম করি। এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে দূরে আকাশের পানে চাহিলাম—আহা কি সুন্দর! নীলাকাশের কোলে সবুজবর্ণের একটী সুবিস্তৃত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ইহা আর কিছুই নহে, দূরে শালবন,—বৃক্ষগুলির একত্র সমাবেশে ঐরূপ দেখাইতেছে। এখান হইতে এই যে শালবন দৃশ্যপথে পতিত হইল—বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত তাহাই দেখিতে দেখিতে চলিলাম। আমি বটুবাবুকে বলিলাম—'দেখুন কিরূপ শালবন। বোধ হয়, এইখানকার পাতা পাতিয়া আমরা কাঁকুড়গাছীতে ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে থাকি।' বটুবাবু কহিলেন, 'হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?' এমন সময় একজন কহিলেন 'মহাশয়। এই শালবনে বেশ বড় বড় 'জানোয়ার' আছে। একদিন একটী ভদ্রলোক সক্ করে, বেলা ২টা আন্দাজের সময় গড়বেতার রাস্তা দিয়ে বাইসিকেল চড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, একটা ডোবার ধারে দুইটী বাঘ জড়াজড়ি কচ্ছে। তাই দেখে, তার হাত পা র'য়ে এলো, বাইসিকেল থেকে অজ্ঞান হয়ে ধপাস্ করে পড়ে গেলেন। ১০।১৫ মিনিট পরে তার জ্ঞান হোলো এবং হৃদয়ে সাহস এলো; তখন সাইকেল চড়ে বাড়ীর দিকে চো চা দৌড়। পড়ে গিয়ে তার পা সমস্ত ছড়ে রক্তপাত হয়ে গিয়েছিলো। নেহাত ভগবান বাঁচালেন তাই, নতুবা হয়েছিল আর কি!' আমরা বলিলাম 'তা ত ঠিকই। রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?'

শশীবাবু চন্দ্রকোণা-রোড ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। পরে গড়বেতা—এই গড়বেতায় প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বটুবাবু এবং গিরিজা (এখন সন্ন্যাসী) একবার নামিয়া ঠাকুরের দেশে গিয়াছিলেন—বটুবাবু সেই গল্প করিতে লাগিলেন। গড়বেতা ছাড়াইলে একটী যুবক একটী গান ধরিলেন। স্মৃতি হইতে গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"জয় মা জয় মা তারা, কৃপা কর মা কাতরে।
অধম সন্তান তব হের মা দাঁড়ায়ে দ্বারে॥
তোমার চরণ লাগি, কর গো মা অনুরাগী,
হৃদয় নহে বিরাগী, ফিরি সদা এ সংসারে॥
সুবোধ সন্তান যারা, অনা'সে কোল পেলে তারা,
অবোধ সন্তান যারা, মরিবে কি ঘুরে ফিরে॥

বিষম মোহের ফাঁদে, আছি সদা অবসাদে,
„বিষাদ ঘুচায়ে দে মা, করুণ-নয়নে হেরে ॥"

আমরা শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর শ্রীচরণ দর্শনে চলিয়াছি—সুতরাং গানটী অতি মধুর লাগিল—অন্তরের অন্তরপ্রদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া ইহার প্রতি কথাটী পৌছিল। আর বড় অধিক সময় লাগিল না, আমরা প্রায় ৩টার সময় বিষ্ণুপুরে পৌছিলাম।

[বিষ্ণুপুরেব দুই চার কথা।]

এখানে দুঃখী স্ত্রীলোকেরা মুটের কাজ করে, একজন আমাদের মোট বীর-দরজার চটির দিকে লইয়া চলিল। ষ্টেশান হইতে বিষ্ণুপুরের রাজবংশ-কীর্ত্তি 'যমুনা বাঁধ' একটী বৃহৎ দীঘী বামে দৃষ্ট হয়। জলরাশি নীরদবর্ণ। বীরদরজায় আমরা একটী 'হিন্দু হোটেল ও বিশ্রামস্থান' লেখা সাইনবোর্ড দেখিয়া তথায় মোট নামাইয়া বিশ্রাম ইচ্ছা কবিলাম। হোটেলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবুরাম মুখোপাধ্যায়। ইনি অতি ভদ্রলোক এবং ভক্তলোক। ইহার আদর আপ্যায়ন ও যত্নে আমরা বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলাম। আমরা তখনই গরুর গাড়ী ঠিক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কবাতে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন 'আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, আমি সমস্তই যথা সময়ে বন্দোবস্ত করিয়া দিব।' অতঃপর আমবা বিষ্ণুপুর সহব, রাজবাটী ও মৃণ্ময়ী ঠাকুর দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া হোটেল হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় অত্যন্ত ধূলা—কিছুদূব গিয়া শ্রীপতিকরের তামাকের দোকান। এই তামাকই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত তামাক। বাজার অতিক্রম কবিয়া যাইয়া চৌধুরী মহাশয়দিগের (স্থানীয় বর্দ্ধিষ্ণু লোক) রাসমঞ্চ, পরে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, চ্যারিটেবেল ডিসপেনসারী ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। ইহার পরে 'পোকাবাঁধ' ইহাও রাজবংশের অপর কীর্ত্তি। বেশ বড় পুকুর। কত লোক এখান হইতে জল লইতেছে। আরও কিছুদুব যাইয়া ডাইনে একটী গলি ধরিয়া আমরা রাজবাটীর উদ্দেশ্যে চলিলাম। রাজবাটীর সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত অতি পুরাতন একটী বৃহৎ সিংহদ্বার এবং তৎবামে পাহাড় সদৃশ একটী স্তূপ। ফটক পার হইয়া রাজবাটী খুঁজিয়া পাইনা,—রাজবাটী একটু জাকজমক বিশিষ্ট হইবে, এই ধারণাই ছিল। পরে আমরা একটী জীর্ণ পুরাতন বাটীকে রাজবাটী বলিয়া অনুমান করিয়া লইলাম। প্রকৃতপক্ষে তাহাই রাজবাটী। একটী পুরাতন রাজধানী আমাদিগকে তাহার সাক্ষ্য দিল। 'স্তূ

বলিল, 'আর বাবা! এখন আর কিছুই নাই। বংশে একটী ছেলে আছে, ১০।১১ বৎসর বয়স। ইহাদের পঞ্চাশ পুরুষ এই খানে বাস। এই—'দরবার'।' (এখানে সর্ব্বসাধারণে রাজবাটীকে "দরবার" বলিয়া থাকে।)

আমরা বাটীর সম্মুখে একটী মন্দির দেখিয়া বলিলাম, 'এখানে কি ঠাকুর আছেন?' বৃদ্ধা কহিল, 'বাবা! এখন সমস্ত ঠাকুরই এই মন্দিরে আছেন, যত দেবালয়ের ঠাকুর একত্র করিয়া এইখানে রাখা হইয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি সকাল সন্ধ্যা এসে পূজা ও আরতি করেন। আমরা সেই মন্দিরে প্রণাম করিলাম, দরজা বন্ধ, দেব দর্শন ঘটিল না। পরে তাহাকে বলিলাম, 'হাঁগা বাছা! এখানে মৃণ্ময়ী ঠাকুর কোথায় আছেন?' সে আমাদিগকে রাজাদিগের একটী ভগ্ন ঠাকুর দালান দেখাইয়া দিল। আমরা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, দালানের সম্মুখে বাঁকারির সমস্ত আগোড় বাঁধা রহিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া দেখিলাম, দালানে ভগবতীর মূর্ত্তি। ইহারই নাম মৃণ্ময়ী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ একবার বিষ্ণুপুরে আসিয়া লালবাঁধের কাছে এই দেবীকে ভাবাবেশে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রথম ভাগের সপ্তম খণ্ডে তাহা এইরূপে উল্লেখ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন—"আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ী আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্ত্তি আছে, নাম মৃণ্ময়ী। ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে বড় দীঘী। আচ্ছা, দীঘীতে আঁব আঠার (মাথাঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি। আমি ত জানতুম না যে, মেয়েরা মৃণ্ময়ী দর্শনের সময় আঁবআঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘীর কাছে আমার ভাব সমাধি হ'ল, তখনও বিগ্রহ দেখিনি, আবেশে সেই দীঘীর কাছে মৃণ্ময়ী দর্শন হ'ল—কোমর পর্য্যন্ত।"

আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই ভাবমূর্ত্তি তখন হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং দেবীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া লালবাঁধ দেখিতে চলিলাম। রাজাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া হৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হইল। বিধাতার কি বিধানচক্র! তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। যে দিকে চাই কেবল ভগ্ন দেবমন্দির! একজন কহিলেন, 'মহাশয়! ৩৬০ দেবালয়, কত শত দীন দুঃখী এই সমস্ত দেবালয়ে প্রসাদ পাইয়া দিন গুজরান করিয়া গিয়াছে, আর এখন! দরবার দেখলেন ত!' তখন চলিতে চলিতে হঠাৎ রূপ-সনাতনের কথা মনে পড়িল। রূপ গোস্বামী সনাতনকে লিখিয়াছিলেন—

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী ?
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরাকোশলা ?
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমন স্থিরং,
ন সদিদং জগৎ ইত্যবধারয়।"

আমরা একটু গিয়াই লালবাঁধ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম বেশ বাঁধান ঘাট, ঘাটের ফটক এবং দুইটী শিবমন্দির নূতন চূণকাম করা। আমরা বরাবর ঘাটে নামিয়া গিয়া একটু জল মুখে দিলাম ও দীঘী দেখিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড দীঘী। ঘাটে ৩।৪টী লোক ছিল, তাহাদের বলিলাম—'হাঁগা রাজ-বাড়ীর এমন দুর্দ্দশা দেখে এলাম, আর ঘাটটী ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখছি, এর কারণ কি ?' তাহারা কহিল, 'এখানে একটী ব্রাহ্মণ থাকেন, তিনিই এই সব করিয়াছেন।' আমরা কহিলাম 'কোথায় থাকেন ?' তখন তাহারা ব্রাহ্মণটীকে দেখাইয়া দিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মুণ্ডিত-মস্তক ও সম্মুখে কমণ্ডলু, গৈরিক-বস্ত্র ইত্যাদি দেখিয়া দূরাগত কোন শ্রান্ত সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে গেলে, তিনি আমাদিগকে বসিতে কহিলেন এবং কোথা হইতে আসিতেছি এবং কোথায় যাইব, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা যথা পরিচয় প্রদান করিলাম। তিনি কহিলেন, 'তবে বেশই হইয়াছে, আপনারা রাত্রে এখান থেকে খেয়ে একে-বারে চলে যাবেন. আমি সব ঠিক করে দেবো।' আমরা বল্লাম 'সে কিরূপ ?' তখন তিনি বল্লেন যে, 'স্বামী নির্ভয়ানন্দ, ডাক্তার কাঞ্জিলাল এবং বড় মাষ্টার ছোট জামাতা, অদ্য বেলা ৯টার সময় জয়রামবাটী থেকে এখানে এসে পৌঁছেচেন, এই সব তাঁহাদের জিনিস পত্র রহিয়াছে। তাঁরা এখন লালবাঁধ ঘুরে 'দোলমাদোল'* বলে একটা বৃহৎ কামান পাতা আছে, তাই দেখতে গেছেন। ঐ গাড়ী রাত্রে ফিরে যাবে, আপনারা ঐ গাড়ীতেই যাবেন। আপনারা ঐখানে ঠাকুর আছেন, দেখে আসুন।' আমরা গেটের দক্ষিণ পার্শ্বে চলিয়া গেলাম—যাইয়া দেখি, একটি দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবী বসিয়া আছেন। পার্শ্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণের, স্বামী বিবেকানন্দের, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এবং আর্য্য-মিসনের শ্যামলাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তিগুলি বর্ত্তমান। দেখিয়া প্রাণে যে কি

* কলিকাতায় বাগবাজারে ৺ মদনমোহন বিগ্রহ আছেন, উহা পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের ছিল। প্রবাদ আছে যে, রাজারা কোনওরূপে শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ৺ মদনমোহন-জিউ এই কামান ছুড়িতেন। শত্রুগণ পলায়ন করিত।

প্রচুর আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা প্রণাম করিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ সমীপে বসিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার নাম শ্রীরামরূপ ভট্টাচার্য্য। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, ইনি স্বামী শিবানন্দ সমভিব্যাহারে একবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিয়াছিলেন। ৪।৫ বৎসর হইল তিনি এই দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু তখন তিনি জানিতেন না যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ লালবাঁধের ধারে ভাবে এইরূপ দেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। পরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতার মুখে ইহা অবগত হইলেন, তখন একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার মন প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এই উপবিষ্টা (কোমর পর্য্যন্ত) দেবীর নাম সর্ব্বমঙ্গলা। ইঁহারা বৈশাখ মাসে এখানে একটী উৎসব করিয়া থাকেন।

কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা হইল। শুক্লাচতুর্দ্দশীর নিশি—শুভ্র জ্যোৎস্না চতুর্দ্দিক ছাইয়া পড়িয়া সেই প্রান্তর এবং বনানি হাসাইয়া তুলিয়াছে। লালবাঁধের অগাধ জলরাশিতে ক্ষুদ্র বীচিমালা শশধর সন্দর্শনে তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে একে অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। নব শীতাগমে হিমানি চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন সময়ে দুইটী বালক আসিয়া কহিল, তাঁহারা (নির্ভয়ানন্দ প্রভৃতি) বেড়াইতে বেড়াইতে দরবারের দিকে গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সাক্ষাৎ মানসে উঠিয়া দরবারাভিমুখে চলিলাম। মৃণ্ময়ী দেবীর মন্দির সম্মুখে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর পরমানন্দ ও হাসি। তাঁহারা ঘাটে আসিয়া আমাদিগকে মায়ের বাটীর প্রসাদ দিলেন—জয়রামবাটী হইতে মা তাঁহাদের আহারের জন্য বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আমরা আনন্দে প্রসাদ পাইলাম। পরে তাঁহারা গাড়ী দুইখানি ২৶০ আনায় ঠিক করিয়া দিলেন—গাড়োয়ানেরা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একেবারে মায়ের বাটীতে তুলিয়া দিবে। ক্রমে সেখানে ১০।১২ জন জুটিলেন, অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাত্রি ৯টায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে বিশেষ যত্ন সহকারে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াইলেন—পেট ভরিয়া গেল তবু ছাড়েন না—বলিলেন 'খুব খান্, পরে লালবাঁধের এক গ্লাস জল খাবেন, সোডা অপেক্ষা অধিক কাজ করিবে—খুব হজমি জল।'

আমাদের আহার সমাপ্তে যথাবিহিত অভিবাদনাদির পর তথা হইতে সকলে সেই দুইখানি গোযানে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করা হইল। কিছু দূরে গিয়া আমরা কাছারীবাড়ীগুলি দেখিতে পাইলাম। ইহা দেখিয়া মনে হইল

যে, ঠাকুর একদিন অবতার প্রসঙ্গে হাজরা মহাশয়কে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—"বিষ্ণুপুরে রেজেষ্টারীর বড় আফিস। সেখানে রেজেষ্টারী করতে পাল্লে, আর গোঘাটে গোল থাকে না।" গাড়ী আরও খানিক গেলে আমরা মুখুয্যে মহাশয়ের হোটেলে নামিয়া পড়িলাম। নির্ভয়ানন্দ প্রভৃতি ষ্টেশনে গমন করিলেন। পরে হোটেলে ঢুকিলে রাবুরামবাবু আমাদিগকে কহিলেন যে, আপনারা ৮টায় বাহির হইয়াছেন, রাত্রি এখন ১০টা—এখনও ফিরিতেছেন না দেখিয়া, আপনাদিগকে পুলিশের লোক বলিয়া মনে হইতেছিল, এখন ওদের দেখে বুঝিলাম যে, আপনারা সত্য সত্যই যাত্রী। আমরা তখন হাসিয়া উঠিয়া তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা বলিলাম। আমাদের আহারাদি হইয়া গিয়াছে শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন পরে ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইনি আগে রেল অফিসে বুকিং ক্লার্ক ছিলেন, সেই সময়ে ঠাকুরের কথা শ্রবণ করেন। আমাদিগকে ভক্ত শ্রীসুরেশ দত্ত প্রকাশিত উপদেশ পুস্তক বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন যে, 'আমরা মধ্যে মধ্যে ইহা পাঠ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়া থাকি। ঠাকুরের একখানা ছবি আমাকে দিতে পারেন, আমি এখানে বাঁধাইয়া রাখিব।' আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া তাহা ডাকে পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। তাঁহার সহিত রাত্রি প্রায় ১১৷৷০টা পর্য্যন্ত গল্প করিলাম। তিনি তৎপরে শুইতে গেলেন। আমরা গোযানের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গোযান ফিরিয়া আসিল। আমরা রাত্রি ১২টায় 'জয় রামকৃষ্ণ', বলিয়া গোযানে চড়িয়া গাড়ীতে শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম এবং কিয়ৎ দূরে গেলেই শায়িত হইলাম। সহরের শেষে কৃষ্ণবাঁধ—বৃহৎ জলাশয়—এইখানে যাইয়া গাড়োয়ানেরা কিছু মুড়িমুড়কী একটী দোকান হইতে কিনিয়া লইয়া জল খাইল এবং ক্ষণপরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এই সুবিমল জ্যোৎস্না নিশিতে দুইখানি শকট, দুই পার্শ্বে বৃহৎ শালবন পরিবৃত ক্ষেত্র রাখিয়া কোতলপুরাভিমুখে সদর সড়ক দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কোতলপুর এখান হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ হইবে। মধ্যে মধ্যে যখন আমাদের তন্দ্রা ভাঙ্গিতে লাগিল, তখন গাড়োয়ানদ্বয়কে মাঝে মাঝে ডাকিয়া দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম—'কতদূর এলো?' কোন্ জায়গা?' গাড়োয়ানদ্বয়ের নাম কুঞ্জ ও ভুবন।

(ক্রমশঃ)

বৃন্দাবন।

(১)

বিরহ বিধুর
সুষমা বিহীন,
বিষাদিনী ব্রজপুর।
ফোটে না অধরে
ফুল কুল হাসি,
নাহি সে বাঁশরী স্বর।

(২)

মরম উছাস
যমুনা উজান,
নাহি সে মৃদুল তান।
বিহগের স্বরে
নিতি নব নব,
নাহি সে মধুর গান।

(৩)

নবীন পল্লবে
কলেবর আভা,
বিকাশেনা মধু ছটা।
নাহি সে যামিনী
মধুর চাঁদিনী,
নাহি সে বিগত ঘটা।

(৪)

ধেনু পালে নাই
সে মধু হরষ,
সমীরে মধুর ভাষ।
শ্যামধন হারা
বৃন্দাবন ধাম,
বিষাদিনী বার মাস।

(৫)

(যবে) সে শ্যাম তমালে
রাধিকা লতিকা,
বেড়িত মধুর হেসে।
বিটপীর সারি
ষোড়শ গোপিকা,
ঘেরিত মধুর বেশে।

(৬)

সুষমায় ভরি
সোণার গোকুল,
প্রমোদে থাকিত ভাসি।
মুরলীর স্বরে
ব্রজ ঘরে ঘরে,
ঢালিত সুধার রাশি।

(৭)

যবে—
নবীন নধর
নীল তনু খানি,
চন্দন চর্চ্চিত ভাল।
শ্যামলী ধবলী
ধেনুগণ পাছে,
ধেয়ে যেত শ্রীগোপাল।

(৮)

রুনু, রুনু, রুনু,
ঝুমুর, ঝুমুর,
বাজিত নূপুর পায়।

বেণু করে শ্যাম
ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নাচিয়ে নাচিয়ে যায়।

(৯)

শ্রীদাম সুদাম
সাথীদের সনে,
কদম্বের তলে খেলা।
গোপিকার ননী
গোপনে হরণ,
মধুর শৈশব-বেলা।

(১০)

অতীত স্মৃতিটি
আসিয়া ফিরায়,
ধ'রিয়া বিষাদ সাজ।
লীলা ভূমি ব্রজ
লীলাময় হারা,
পড়িয়া রোয়েছে আজ।

(১১)

গোকুল রতন,
গোলোকে প্রকাশ,
শূন্য করি ব্রজধাম।
দেখিবার সাধ
হয় যদি ভাই,
পরাণ মাতান শ্যাম!

(১২)

তবে সবে মিলি
মায়া মোহ ভুলি,
সাধনা করিবি আয়।
করুণা আধার
শ্যাম প্রাণময়,
রাখিবে রাতুল পায়।

(১৩)

চিরশান্তিময়
সে দুটী চরণ,
পরশে হইবি সোণা।
সে চরণ তরী
পেয়ে গেল তরি—
পাতকী কতই জনা।

শ্রীসুশীলমালতী সরকার।

সংসার।

এ ভব সংসার, বড়ই সুন্দর,
হেরিছে বাহিরে যারা।
খুঁজিতে খুঁজিতে সকলি অনিত্য,
শেষে দেখে পুনঃ তারা॥
সংসার সুখের সায়র ভাবিয়া,
ডুব দিতে গেনু তায়।

ডুবিতে ডুবিতে, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুঃখের বায় ॥
কিবা অপবিত্র সংসার সায়র,
সমল তাহার জল।
দুঃখের মকর ফেরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল ॥
রোগ শোক জ্বালা, জলের শিহালা,
মৃত্যুটী তাহার পাছে—
কাম ক্রোধ লোভ, কাঁটা এ সকল,
উন্নতি পথের মাঝে ॥
বাসনা পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাকিয়া ফেলিতে নারি।
অন্তরে বাহিরে, যেই মত ঘেরে,
ছাড়ান বিষম ভারি ॥
কহে সাধুজন, শুনহ সংসারি !
সুখ দুঃখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে সংসার
দুঃখ যায় তার ঠাঁই ॥
ধরম বলিয়া, একটী কমল
সংসার সায়র মাঝে।
চতুর রসিক, হয় গো যে জন,
ধায় গো তাহার পাছে ॥
সাধুজন ভণে শুন রে মানব !
ধরম রসের সার।
ধরম-রসের যে নহে রসিক,
কি ছার পরাণ তার ॥
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, কলিকা সকল,
সে কমল চারি পাশ।
একে একে তারা, ফোটে গো সকলি,
করিলে তাঁহার আশ ॥

ভক্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, বলিছে মানবে,
ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম সার।
যাহাতে মিলিবে, সেই প্রাণারাম,
ভবসিন্ধু হবে পার॥

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ।

শ্রীরামকৃষ্ণকল্পতরু-উৎসব।

১লা জানুয়ারী, ১৯০৯ খৃঃ, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব হইয়া গিয়াছে। অনেক ভক্ত সমবেত হইয়া কীর্ত্তনানন্দ করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কটকের সেবকবৃন্দও একটী উৎসব করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া কিছু কিছু বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদিগের প্রকাশিত 'শুভবার্ত্তা' নামক প্রীতি-উপহার নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শুভবার্ত্তা।

"ভাঙ্গিব প্রেমের ভাণ্ড আয় ছুটে আয়,
অমর হইবি পানে মিটে যাবে আশ;
জাগরে ঘুমন্ত-সিংহ দিন চলে যায়!
মায়ার কল্পিত গৃহে মিছে কেন বাস?"

শুনিয়াছে জগবাসী তব আবাহন,
জাগিয়াছে জাগিতেছে শুইবে কি আর?
সবাই শীতল আর নাহি জ্বালাতন,
গাইছে জীমূত-মন্দ্রে প্রার্থনা তোমার!

নিদাঘ-সন্তপ্ত ধরা বরষা আগমে,
ফুল্লমনে করে গান পরমেশ-স্তুতি;
তোমায় হেরিয়া তথা সংসার আশ্রমে,
হরষিত চিত্তে সবে গায় তব গীতি।

নির্ব্বাণ উন্মুখ দীপ তৈলবিন্দু যোগে,
প্রদীপ্ত কিরণ যথা ছুটায় হরষে,
ধরাবাসী মৃতপ্রাণ কুটবিষ ভোগে;
পাইয়া তোমারে পুনঃ মহানন্দে ভাসে।

যে আলোক-স্তম্ভ দেব পুঁতেছ ভারতে,
ছুটায় আলোক রেখা বহুদূর দেশে;
অন্ধকারে ভ্রাম্যমান তাকায় চকিতে,
বুঝিয়া আপন ভ্রম শুদ্ধমার্গে আসে।

উদিয়াছে বালরবি পূরব গগনে,
সুপ্তনর ছাড় শয্যা খুলিয়া নয়ন,
ঘুমাইতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু রেখ মনে,
এ রবির খরতেজে স্থধু জাগরণ।

'নাহি বাদ বিসম্বাদ নাহি কোলাহল,'
'সব ধর্ম্ম সত্য,' 'যত মত তত পথ',
'নামেতে বিভিন্ন কিন্তু একবস্তু জল,'
'সরলে ডাকিলে পূর্ণ হবে মনোরথ।'

ঐক্য সূত্রে গাথা তব উপদেশ বাণী,
ফুকারিছে ঐক্যমন্ত্র, শুনিছে সংসার;
তুমি আজ কল্পতরু—শুভবার্ত্তা শুনি,
জাগ্রত-জীবন-কল্পে প্রার্থনা এবার!!

সমালোচনা।

গয়াধাম। শ্রীশ্রীহরি ঘোষ মহাশয় প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম এবং গয়াধাম সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় জানিতে পারিলাম। গ্রন্থকার এই পুস্তকে গয়াধামের পুরাবৃত্ত, তীর্থমাহাত্ম্য, পৌরাণিক আখ্যায়িকা একে একে বর্ণনা করিয়াছেন এবং

কাহার দ্বারা ইহার প্রথম সৃষ্টি হইল, গয়াসুর কাহিনীর প্রকৃত রহস্য কি, বৌদ্ধ ইতিহাসের সহিত গয়াধামের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণন করিয়া গয়াধাম সম্বন্ধে সাধারণকে সবিশেষ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তীর্থ দর্শন করা হিন্দুজীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম। ইহাতে বিবিধ জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যাঁহারা গয়াধাম দর্শনাভিলাষী, তাঁহারা গয়ায় যাইবার পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিয়া তথায় গেলে বিশেষরূপে উপকৃত হইতে পারিবেন।

বোধগয়া। উপরিউক্ত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বুদ্ধগয়ার ইতিবৃত্ত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। বোধগয়ার সবিশেষ বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায় এবং বোধিদ্রুম, রাজা অশোক, এবং বৌদ্ধগণের ভক্তি এবং সহৃদয়তার পরিচয়াদি পাঠ করিয়া চক্ষু আর্দ্র হইয়া আইসে। গ্রন্থকারের এরূপ সংগ্রহ চেষ্টাকে অন্তরের সহিত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। উক্ত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক শ্রীক্ষেত্রের ইতিবৃত্ত। মূল্য ।০ চারি আনা। ইহার মধ্যে জগন্নাথ-ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিবিধ পুরাতত্ত্ববিদের মতামত সংগৃহীত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার নিজেও অনেক কথা বলিয়াছেন কিন্তু শ্রীদেবতা সম্বন্ধে বিশেষ মীমাংসাপ্রদ কোনও সিদ্ধান্ত ইহাতে পাইলাম না, এবং আমাদের ধারণা যে সেরূপ স্থির সিদ্ধান্ত কোনও গ্রন্থকারই দিতে পারিবেন না।

কর্ম্মকার বৈশ্য-তত্ত্ব। খুলনা জেলার অন্তর্গত খালিশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরষিত লাল রায় এই পুস্তকের প্রণেতা। আমাদিগের বিশেষরূপে জানা আছে যে, গ্রন্থকার প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল বিশেষ যত্ন আগ্রহ চেষ্টা ও পরিশ্রমসহকারে তাঁহার স্বজাতির ইতিহাস খানি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা যতদুর জানি কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে এরূপ বিশদ বিবরণ পরিপূর্ণ পুস্তক বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। যাঁহারা কর্ম্মকারতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ॥০ আট আনা মূল্যে এই পুস্তক খিদিরপুর ২৪ নং রামকমল মুখার্জির ষ্ট্রীটে পাইবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

মাঘ, ১৩১৫ সাল।

দ্বাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মকর-মঙ্গল-গীতি।

(কীর্ত্তনের সুর)

পৌষ মাসের শেষ, সাগর সঙ্গম দেশ,
তীরিথ সেনান কত করে।
হিন্দু নর নারী যত, সবে ধর্ম্ম কর্ম্ম রত,
সুরধুনী পাদপদ্ম স্মরে॥
পূজা দান সাধুসেবা, যার ভাগ্যে ঘটে যেবা,
সাধ্যমত সাধিছে সকলে।
খোল করতাল লয়ে, উচ্চ হরিনাম গেয়ে,
কত জনে নাচে কুতূহলে॥
আজিকে এ শুভদিনে, আমার প্রভুর মনে,
মরি কিবা ভাবের উদয়!
উঠিয়া সে উষাকালে, মুখে হরি হরি বলে,
কায় মন সদানন্দময়॥
কামারপুকুরে যবে, মিলি গ্রামবাসী সবে,
হরিনাম গেয়ে গাঁয়ে ফেরে।

(কিবা) চৌদিকে পুণ্যের ছটা, বিলবুড়ী(১) পূজা ঘটা,
হরিধ্বনি উঠে ঘরে ঘরে ॥
শ্রীদক্ষিণেশ্বরে আসি, যবে প্রভু হৈলা বাসী,
তখনো সে হেন মত ভাব।
সঙ্গীভক্তগণ লয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হিয়ে,
বিতরেন পবিত্র প্রভাব ॥
বাজে খোল করতাল, ভাবে প্রভু মাতোয়াল,
'জয় জয় হরিবোল' গান।
(কিবা) মায়ের মন্দিরে গিয়ে, নাচে প্রভু থিয়ে থিয়ে,
সেই ভাবে বিষ্ণুঘরে যান ॥
(আবার) আপন মন্দির মাঝে, ভূমে লুটি কিবা সাজে,
হরি বলি চমকিয়া ওঠে।
হরিবোল, হরিবোল, তুলি নাম উতরোল,
নেচে নেচে গঙ্গা পানে ছোটে ॥
চাহি ভাগীরথী পানে, ধারা বহে দুনয়নে,
কিবা মনে কেবা তাহা জানে!
ক্ষণিক স্তবধ থাকি, হরি হরি বোলে ডাকি,
ধেয়ে চলে পঞ্চবটী পানে ॥
(কিবা) আসি পঞ্চবটী তলে, নাচে প্রভু ঢোলে ঢোলে,
সঙ্গী সবে ঘুরে বেড়ে নাচে।
হরিনামে হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি,
প্রভু পেয়ে আনন্দে ভাসিছে ॥
এদিকে ভাবের দায়, জড়বৎ প্রভু কায়,
ভক্ত অঙ্গে হেলা অঙ্গ স্থিতি।
হেন অবসর পেয়ে, পদে শির লুটাইয়ে,
আজি সবে করিছে প্রণতি ॥
হেরি এই শুভযোগ, ঘুচাইতে ভব-ভোগ,
ছুটি যাযি পড়িনু সেখানে।

(১) পৌষ সংক্রান্তিতে মাঠে মাটির একপ্রকার ঠাকুর গড়িয়া তাহার পূজা ও ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। কামারপুকুরে অদ্যাপি এই পূজা ও মাঠভোজন হয়।

সর্ব্বাঙ্গে চরণধূলি, মাখি রৈনু কুতুহলী,
চাহি রৈনু শ্রীবয়ান পানে ॥
(প্রভু আমায় দয়া কর বোলে) (আর ভবকূপে রৈতে নারি)

শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২১০ পৃষ্ঠার পর।)

[প্রভাতে—গোযানে।]

"অয়ি সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?"

২৩শে কার্ত্তিকের উষা, ভোর ৫টা হইয়াছে। পথিক শীত তাড়াইবার উদ্দেশ্যে গান গাহিতে গাহিতে পথে চলিয়াছে। তাহারই গলার সুরে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পথিক গাহিতেছে—"নয়নবাণে বিঁধলে আমার প্রাণ।" বটুবাবু শুনিয়া বলিলেন 'ও ঠিক গাহিতে পারিতেছে না—'শীতের বাণে বিঁধছে আমার প্রাণ' গাওয়া উচিত ছিল।' বটুবাবুর খুব শীত করিতেছে এবং সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দিবোধ হইয়াছে। তামাক খাইয়া শরীর একটু গরম করিয়া বটুবাবু একটি গান ধরিলেন। আমিও তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে লাগিলাম—

"অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেমমুখচ্ছায়া,
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে ॥
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে;
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে ॥

আর একটী গান হইল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার সেই অতুলনীয় সুমধুর কণ্ঠে এই গান কতবারই গাহিয়াছেন।

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুমি দ্যাখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে ॥
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো,
জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রাখো, সে যেন সাবধানে থাকে ॥
(খুব যেন সাবধানে থাকে)

এই গানটী শেষ হইলে আর একটী গান হৃদয়ে উদয় হইল। ঠাকুর এই গান শুনিলে প্রায়ই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। ব্রাহ্মভক্তেরা ঠাকুরকে এই গান কতবারই শুনাইয়াছেন। এটীও গাওয়া হইল—

"আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ি)।
আর কাজ নাই (ও মা) জ্ঞান-বিচারে ॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্তহরা (আমায়) ডুবাও প্রেমসাগরে ॥
(তুমি দয়া ক'রে) (তুমি নিজগুণে)
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দভরে—
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, তাঁরা তোমার প্রেমে অচৈতন্য,
হায় মা কবে হব ধন্য (আমি) মিশে গে' তাঁদের ভিতরে ॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে—
তুইও প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর্ মা ধনী (এই) কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে ॥"

গান সমাপ্ত হইল। এদিকে পূর্ব্বদিক আরক্তিম করিয়া দিবাকর উজ্জ্বল আলোক জগতে বিকীর্ণ করিতে লাগিল। আমরা এইবার একটী বড় পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়া গোযান হইতে অবতরণ করিলাম, এবং তথা হইতে জল আহরণ করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন করতঃ পুনরায় গাড়ীতে উঠিলাম। এই স্থানের নাম রাজগা। একটু চলিয়া প্রান্তরে একটী মন্দির দৃষ্ট হইল। শিবমন্দির বলিয়া মনে হয়। যখন রৌদ্রের একটু তেজ হইল, তখন গাড়োয়ানদ্বয় গাড়ী হইতে নামিয়া গরুগুলিকে তাড়াইতে লাগিল, আমরাও একে একে গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে লাগিলাম। রাস্তায় বিষম ধূলো—

এমন কি নাকে কাপড় বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। সানতাড়া, মৃজাপুর, বাঁইবাঘিনী প্রভৃতি বিবিধগ্রাম আসেপার্শ্বে রাখিয়া বেলা প্রায় ১০৷৷০টায় আমরা কোতুলপুরে পৌঁছিলাম। এখানে এণ্ট্রান্স স্কুল, থানা, রেজেষ্টারী-অফিস ইত্যাদি রহিয়াছে, একটী ছোট সহরের ন্যায়। অদ্য রাস পূর্ণিমা। এখানে তিনটী স্থলে রাসে ধুম হইবে। পালেদের ঠাকুর বাটী এবং ভদ্রদের দুই বাটীতে। খাবারের দোকানগুলি খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিয়া সাজাইয়াছে। ডকার খোল ও নলিচা অনেক দোকানে কাঁড়ি করিয়া রাখিয়াছে। একটী সতীর সমাজ দেখিলাম। তাহার গায়ে 'সতীমঠ' বলিয়া খোদাই করা আছে। শুনিলাম এখানে অতিথি সেবা হয়। গাড়োয়ানদিগের ইচ্ছা যে আমরা এই কোতুলপুরে বিশ্রাম করিয়া জলযোগ করি, কিন্তু আমরা কোয়ালপাড়ায় যাইয়া বিশ্রাম করিব বলায়, তাহারা একটু গঁৎ গঁৎ করিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। যতই চলিতে লাগিলাম, দেখি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক প্রভৃতি পল্লিস্থ নরনারীগণ সকলেই কোতুলপুরাভিমুখে রাস দেখিতে যাইতেছে। অনেকে রাত্রিতে তথায় থাকিয়া যাত্রা শুনিবে। মুইটাড়া নামক স্থানে পৌঁছিলে ৩।৪টী যুবক সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের বাটী কোথায় জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"ময়নাপুর গ্রামে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি প্রণেতা ভক্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের জন্মস্থান ময়নাপুর। আমরা তাঁহাদিগকে সেন মহাশয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা তাঁহাকে জানেন বলিলেন। ময়নাপুর এখান হইতে তিন ক্রোশ বা তাহার কিছু অধিক দূরে হইবে। আমরা সেই ভক্তের জন্মভূমি উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। এই পথে দুইটী প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ দৃষ্ট হইল। এরূপ বড় বকুল বৃক্ষ ইতিপূর্ব্বে চক্ষে পড়ে নাই। এখান হইতে কোয়ালপাড়া সন্নিকটে শুনিয়া বটুবাবু নামিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ দিক হইতে চারি ভার দধি লইয়া চারি ব্যক্তি কোয়ালপাড়ার পথে যাইতে লাগিল। বটুবাবু বলিলেন "ভাই! দধিযাত্রা বড় শুভ।" আমি বলিলাম, "হাঁ, তবে এখন যেরূপ বেলা হইয়াছে (প্রায় ১১৷৷০টা হইবে) তাহাতে যদি হাতে-পাতে দই পড়ে, তবে আরও শুভকর।" বটুবাবু একটু হাসিলেন এবং দ্রুতপদক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

[কোয়ালপাড়া—ভক্ত সমাগমে।]

বেলা ১২টা হইয়া গিয়াছে—আমরা কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিলাম। সম্মুখে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ হাজরা মহাশয়ের দোকান। ইনি ঠাকুরকে ভক্তি ও

বিশ্বাস করেন শুনা ছিল, তাই আমরা ইঁহার দোকানে নামিয়া বসিলাম। তিনি তখন দোকানে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আমরা তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই জনৈক লোক তাঁহাকে ও কেদারবাবুকে (শ্রীকেদারনাথ দত্ত) ডাকিয়া আনিল। তাঁহারা আসিয়া আমাদিগকে বিশেষ সমাদরে কেদারবাবুর নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। কেদারবাবুর বাটীতে ঠাকুরের নিত্যপূজা হয়। যে ঘরে ঠাকুর আছেন, সেই ঘরেই আমাদিগের বসার জন্য জায়গা দিলেন। সন্নিকটে মা শীতলার মন্দির আছে। এখানে তিন দিন ধরিয়া চব্বিশ প্রহর সংকীর্ত্তন হইয়াছে, অদ্য ধূলট—এখনও সংকীর্ত্তন চলিতেছে। একটী দল প্রতি বাটীতে যাইয়া গান করিতেছে। কেদারবাবুর বাটীতেও সেই দল আসিয়া পৌছিল, আমরা কিয়ৎক্ষণ গান শুনিলাম। কেদারবাবু ও হাজরা মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী। গানের দল চলিয়া গেল— কেদারবাবু আমাদের জন্য আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমাদের সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। আমরা গিয়াছি শুনিয়া ক্রমশঃ অনেকগুলি যুবক একে একে আসিতে লাগিলেন। ১৩১৪ সালের শ্রাবণ মাস হইতে কেদারবাবুর এবং এই সকল যুবকগণের সদিচ্ছায় এখানে একটী "রামকৃষ্ণ-সেবক-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য ধর্ম্মজীবন গঠন করা এবং দীন দুঃখীবেশধারী নারায়ণের সেবা করা। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর ও জয়রামবাটীতে যাইয়া থাকেন। এখান হইতে ঐ উভয় তীর্থ আড়াই ক্রোশ তিন ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত।

বেলা প্রায় ১৷৷০টার সময় আমরা স্নানান্তে আহার করিলাম। আহার কালে দেখিলাম, একটী ব্রাহ্মণ বালক আমাদের জন্য রন্ধন করিয়াছে। বালকের বয়ঃক্রম ১৭।১৮ বৎসর হইবে। বালকটী সেবকসমিতিভুক্ত। ৭।৮ দিন জ্বর ভোগ করিয়া এই দিন সে বেশ ভাল ছিল। আমরা গিয়াছি দেখিয়া, সে আনন্দচিত্তে সাগ্রহে আমাদের জন্য রন্ধন আরম্ভ করে। আমরা খিচুড়ি রাঁধিতে বলিয়াছিলাম—আমাদের আহারাদির পরে সেই বালকও পরিতৃপ্তরূপে খিচুড়ি পথ্য করিল। বালকের ধারণা যে, আমাদের উদ্দেশ্যে ঠাকুর তাহাকে সুস্থ করিয়া দিয়াছেন, উপস্থিত সে নিরাময় থাকিবে। গাড়োয়ান দুজনও এখানে আহার করিল। তৎপরে আহারাদির পর কেদারবাবু এবং অপরাপর ভক্তগণ আমাদের সহিত ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেদারবাবুর পিতা কর্ম্মোপলক্ষে কিছুকাল জয়রামবাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই

সময়ে তিনি ঠাকুরকে তথায় বহুবার দর্শন এবং তাঁহার সহিত আলাপনাদি করেন। সেই শুভসম্মিলনফলে আজ তাঁহার পুত্রের হৃদয়ে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ঠাকুরের কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা কিছু গান শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমাদের সঙ্গে "রামকৃষ্ণ-সংগীত" ১ম খণ্ড দুই খানি ছিল; তাহা বাহির করিয়া লইলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার উদ্দেশ্যে সেবক রামচন্দ্র ১২৯৯ সালের ফাল্গুন হইতে প্রায় এক বৎসরকাল তাঁহার শিষ্যবর্গের দ্বারায় প্রতি রবিবারের প্রত্যূষে কলিকাতায় বিবিধ পল্লীতে এবং যুড়া, নারিকেলডাঙ্গা, মাণিকতলা প্রভৃতি স্থলে "টহল" দেওয়াইয়াছিলেন। টহল দেওয়া আরম্ভ হইবার সমসময়ে বোম্বাই সহর হইতে ভক্তবর শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয় একটী গীত রচনা করিয়া রামবাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। কালীবাবু "টহল" সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না, কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছায় গীতটী যেন ঐ উপলক্ষেই রচিত বলিয়া রামবাবুর প্রাণে লইল। তিনি সুরতালে গীতটী যুবকগণকে স্বয়ং শিখাইয়াছিলেন। "রামকৃষ্ণ-সংগীতের" সর্ব্বপ্রথমেই সেই গীতটী আছে। আমরা সর্ব্বাগ্রে সেইটীই গাহিলাম। গীতটী এই—

মগন হৃদয় ভকত জাগে দয়াল নাম গানে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নামসুধা পানে॥
রজত আসন, ধরণী শাসন, না চাহি মণিকাঞ্চনে।
তুলসীমাল, মৃগছাল, রামকৃষ্ণ বদনে॥
ভুবনমোহন রমণীরতন না চাহি আলিঙ্গনে।
চাহে মন রামকৃষ্ণ স্থান অভয় চরণে॥
নাহিক সাধ, মধুর স্বাদ, রসনা পরিতোষণে।
প্রসাদ শান্তি রামকৃষ্ণ চরণামৃত সেবনে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ধ্যানে॥

কেদারবাবু এবং অপরাপর যুবকগণও আমাদিগের সহিত মিলিয়া গাহিতে লাগিলেন। গানের সুর শিখিয়া লইয়া ভবিষ্যতে তাঁহারা ইহা গাহিবেন, ইহাই প্রাণের বিশেষ সাধ। আমরা দ্বিতীয় গান ধরিলাম—

দীনহীন তারণ কারণ দীননাথ নাম হে।
পতিত তাপিত তাপ হরণ পতিতপাবন নাম হে॥
কলুষনাশন কৃপানিধান করুণাময় নাম হে।

জগতজীবন ভকতপ্রাণ ভক্তাধীন নাম হে ॥
পীতবসন মুরলীবদন মদনমোহন ঠাম হে।
সাধন ভজন বিহীন যে জন, রামকৃষ্ণ নাম হে ॥

গান গাহিতে গাহিতে ভক্তদিগের আগ্রহ আরও বাড়িতে লাগিল, হৃদয় প্রফুল্ল হইল। তাঁহারা কহিলেন, আরও একটী গান গাহিতে হইবে। তখন আমরা গাহিলাম—

প্রাণ খুলে রামকৃষ্ণ বলে প্রেমে নেচে নেচে আয়।
যে ভবের মাঝে নাম এনেছে বিলায়ে দেছে কাঙ্গালের দায় ॥
জুড়াতে অন্তরের জ্বালা, বদন ভরে নামটী বলা,
ভক্তিদানে প্রাণে প্রাণে প্রাণটী ঢালা ;—
সাধে হেরবে হৃদে হৃদয়চাঁদে, রামকৃষ্ণ নামের মহিমায় ॥

একজন বৃদ্ধব্যক্তি হাতজোড় করিয়া তথায় বসিয়াছিলেন, অতি ভক্ত-প্রকৃতি; তিনি গীতটী শুনিয়া 'আহা!' 'আহা!' বলিয়া উঠিলেন। আমরা আর একটী গান ধরিলাম—

এসেছে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের তরে।
(তোরা) আয় ভিখারী সবা করি প্রেম নিধি আয় প্রাণ ভরে ॥
দীনের মাঝে দীননাথ দীনে নাম বিলায়,
দীনের ব্যথা প্রাণে প্রাণে সুখের পানে চায়.
(বলে) পাপী তাপী কে আছিস রে আয়—
(তোদের) ভয় কিরে আর, আমারি ভার. বক্লমা দে আমারে ॥

বেলা ৩॥০টা হইয়াছে, আমরা জয়রামবাটীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌছিবার উদ্দেশ্যে তখন বিদায় চাহিলাম। ভক্তগণ তখনও ছাড়িবেন না; বলিলেন "আমরা আপনাদিগকে কখনও পাই না, যদি পাইয়াছি, আর একটু বসুন—আরও দুটো ঠাকুরের গান শুনি।" আমরা আর কি বলিব! ঠাকুর বলিতেন 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা'—ভাবিলাম, ইঁহারা ঠাকুরের ভক্ত, ইঁহাদেরই অন্তরে তাঁহার অধিষ্ঠান। আমরা জনমজীবন সার্থক করিবার জন্যই ঠাকুরের জন্মদেশ দেখিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি। এমন ভক্ত-সঙ্গ আবার এ জীবনে ঘটিবে কি না, তা কে জানে! তবে আরও কিয়ৎকাল ইঁহাদের সঙ্গে ঠাকুরের নামপ্রসঙ্গে থাকা যাক্। তখন আমরা আবার গাহিলাম—

বাঞ্ছা পূর্ণ হল আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এল।
তত্ত্বলাভের বিড়ম্বনা দ্বৈতভাবের বিবাদ গেল॥
রামকৃষ্ণ এবার, এ নব ভাবে প্রচার,
এক অনন্ত সবার মূলাধার :—
যে যা বলে, তাতেই মিলে, একজনার খেলা সকল॥
যে কালী সে বনমালী, হরি বলি (আর) ঈশাই বলি,
আল্লা বোলে মোল্লা ভজায়, কর্ত্তাভজায় সেই কেবল—
স্বভাবে সহজে পাবে, অভাবে হবে বিফল॥

([illegible])

জীবের তরে [illegible]
দীনের ত্রাণ কল্পে [illegible]
সংসার-সন্তাপে সদা দগ্ধ [illegible] নিমগন,
নামটী স্মরণ করবে ভাই নাই সাধন ভজন,
পাওনি যে জন ইষ্টধনে করবে রামকৃষ্ণ স্মরণ—
রামকৃষ্ণ পেলে ইষ্টমিলে হবে সফল জীবন॥*

এইবার গাড়োয়ানদ্বয় তাড়া দিল, কহিল 'মহাশয়! এখন না উঠিলে আপনাদের যাইতে রাত্রি হইয়া যাইবে।' আমরা 'যাচ্ছি, যাচ্ছি' বলিয়া তাহাদের ঠাণ্ডা করিতে না করিতে বটবাবু স্বয়ং আর একটী গান ধরিয়া দিলেন। এই গীতটী এই বৎসর যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে গীত হইয়াছিল।

মহা মহোৎসবে মাতি আজি সবে (প্রেমে) বদনে বল রামকৃষ্ণ জয়।
সাধন ভজন বিহীন যে জন অভয় শ্রীপদে লও আশ্রয়॥ (ভবভয় রবেনা)
মোহন বেদি পরে, প্রভু বিরাজ করে,
(ফুল ফুলহারে কিবা শোভা ধরে)
(ভবে এ রূপের তুলনা নাইরে)
ও রূপ দরশনে প্রেম ভকতি উদয়॥
(চিত্ত বিমোহন) (পূর্ণ জ্যোতিঘন) (চিদানন্দময়)
পূর্ণানন্দ স্থান, ধরায় যোগোদ্যান, গোলোক সম প্রভু নিত্য অধিষ্ঠান,

---

* এই সমস্ত গীতগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেবক রামচন্দ্রের বক্তৃতা উপলক্ষে ভক্তবর শ্রীকালীপদ ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।

(কলির জীবের তরে হেন তীর্থ নাহি আর)
(হেথা প্রেমদাতা প্রেম বিলায় অনিবার)
বিচিত্র এ লীলা, শুধু প্রেম খেলা, চৈতন্য বিকাশে আনন্দময়॥
(তরুলতা আদি)
বাজলো নামের ডঙ্কা, ঘুচলো শমন শঙ্কা,
(তোরা আয়রে সবে ত্বরায় ছুটে)
(তোদের ভব বন্ধন যাবে টুটে)
(শুন গগনভেদী জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনি)
(সেবক রামচন্দ্রের অভয়বাণী)
নামে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুনিশ্চয়॥
(দয়াল নামের গুণে) (মধুর নামের গুণে) (রামকৃষ্ণ নামে)

এই গানের সুরটী সকলেরই অতি প্রিয় বোধ হইল। তাঁহারা সকলেই গানটী লিখিয়া রাখিবার আগ্রহ করিয়া কাগজ ও দোয়াৎ কলম আনিয়া উপস্থিত করিলেন। গানটী তখন আমিই তাঁহাদিগকে লিখিয়া দিলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একখানি রামকৃষ্ণ-সংগীতও তাঁহাদিগকে প্রদান করিলাম। তাঁহারা পরম আনন্দিত হইলেন।

বেলা ৪॥০টা অতীত হইয়া গিয়াছে। আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। সকলেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন। কেদারবাবুকে কহিলাম, 'চলুন্ না আপনি আমদের সঙ্গে?' কেদারবাবু আমারই ন্যায় হাঁপানি রোগী, দুই দিন একটু টান ধরিয়াছে, তাই কহিলেন যে, 'আর যাইব না, তাহা হইলে আরও বাড়িবে।' তখন, যে বালকটী আমাদের রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিল, তাহাকে যাইবার জন্য বলিলাম। বালকটীর নাম শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। সে আনন্দে আটখানা হইয়া গায়ের কাপড় লইয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে চড়িয়া বসিল, ৫টায় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কেদারবাবু ও আরও দুই এক জন আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ৎদূরে গমন করিতে লাগিলেন। আমরা বিশেষ অনুরোধ করিলে তবে তাঁহারা ফিরিয়া গৃহে গেলেন।

[জয়রামবাটীতে—মাতৃচরণে।]

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা গাড়ী চলিলে পূর্ণচন্দ্র গগনভালে উদিত হইল। জ্যোৎস্না কিরণে দশদিক উৎফুল্ল বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। এখান হইতে রাস্তা

তত ভাল নহে, তাই গাড়ী হেলিয়া দুলিয়া পড়িয়া উঠিয়া চলিতে লাগিল, কখনও কখনও জল ও কাদার মধ্য দিয়াও গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ীতে বিনোদের সঙ্গে নানা কথা কহিতে লাগিলাম। দেশড়া নামক একটী বৃহৎ গ্রাম অতিক্রম করিলে গাড়োয়ানরা বলিল 'আর বড় বেশী দূর নাই।' আমরা অনুমান ৭৷৹টায় গাড়োয়ানদিগের বাটীতে (তাজপুর গ্রামে) যাইয়া পৌঁছিলাম। ভুবনের একটী ৭।৮ বৎসরের ছেলে 'বাবা' 'বাবা' করিয়া দৌড়িয়া আসিল এবং আনন্দে গরু দুইটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমরা গাড়ী থেকে যখন নামিতে লাগিলাম, তখন সে একটু অপ্রতিভ হইল এবং আস্তে আস্তে গরু দুইটীকে টানিয়া লইয়া গিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। আট দশ মিনিট পরেই ভুবনের একটী দাদা এবং কৃষ্ণ আমাদের পুটলি লইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া জয়রামবাটীতে লইয়া যাইতে লাগিল। বরাবর মাঠ। দুই পার্শ্বে কেবল ধানগাছ। পূর্ণ জ্যোৎস্নার এমন সৌন্দর্য্য বুঝি আর কখনও দেখি নাই। কিছুদূর গিয়া 'আমোদর' নামে নদী। এই নদীতে এক হাত দেড় হাত জল হইবে, তাহা হাঁটিয়া পার হইতে হইল। নদী পার হইয়া কিয়দ্দূর যাইয়া জয়রামবাটী দেখা যাইতে লাগিল।

গ্রামের পূর্ব্ব উত্তর কোণ দিয়া এইবার জয়রামবাটী গ্রামে প্রবেশ করিলাম। পাঁচ সাত ঘর অতিক্রম করিয়াই আমরা মায়ের বাটীতে পৌঁছিলাম। রাত্রি ৮টা হইবে। দেখিলাম, বরদা মামা, তাঁহাদের নিযোজিত দুইটী কৃষক সহ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। 'মামা! চরণে হাজির'—এই বলিয়া আমরা প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া খুব হর্ষযুক্ত হইলেন, এবং 'এস এস বোসো বোসো' বলিয়া আসন বিছাইতে উঠিলেন। বটুবাবু তাঁহার হস্ত হইতে আসনখানি লইয়া নিজে বিছাইয়া বসিলেন; আমিও বিশ্রাম করিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শকদিগকে যথাপ্রাপ্য বুঝাইয়া দিলাম, তাহারা তামাক খাইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। মামা আমাদিগের পৌঁছ সংবাদ মায়ের নিকট জানাইয়া আসিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে, মা আমাদিগকে ভিতরে যাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। মামার সহিত আমরা ভিতরে গেলাম। জননী তাঁহার ঘরে দণ্ডায়মান ছিলেন। তথায় ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। আমরা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। মা কলিকাতার ভক্তগণের নাম করিয়া করিয়া সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পথে আমাদের কতই কষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলিয়া

কহিলেন যে, 'তোমাদের জন্য প্রসাদ রাখিয়াছি, খেয়ে সুস্থ হয়ে ঘুমাও গিয়ে। আজ আর বেশী, রাত করিওনা।' আমরা আরও একটু কথাবার্ত্তার পর প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। মামা সম্মুখে বসিয়া এবং মা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। 'আর দিব?' 'আর দিব?' এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমরা যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া সমস্ত গ্রহণ করিলাম। পরে যে নূতন বাটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারই বৈঠকখানার ঘরে আমাদের বিছানা হইল। আমরা তথায় শয়ন করিলাম, এবং কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

রাত্রি ৪টা হইবে, অভ্যাসবশতঃ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে বাতি ছিল, আলো জ্বালিয়া লইলাম। মনে করিলাম, বৃথা ঘুমে আর সময় না কাটাইয়া "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি" পাঠ করি। পুঁথির ২য় খণ্ড পড়িতে লাগিলাম। ইহাতে জয়রামবাটী সম্বন্ধে ঠাকুরের অনেক ঘটনা লেখা আছে। বিনোদ ছেলেটী উঠিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। বটুবাবু খানিকটা শুনিয়া আবার একটু শয়ন করিলেন। পুঁথি পড়িতে পড়িতে ভোর হইয়া গেল। দ্বার খুলিয়া দেখি, উষার অরুণরাগে চারিদিক রঞ্জিত হইয়াছে। মনে করিলাম,—আঁধারের পর আলোক প্রকাশিত করিতে এক সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর ব্যতীত আর কে পারেন! দয়াময়! আমার মানস-কালিমা কবে বিদূরিত করিবে! কবে এ হৃদয়ে তোমার কৃপায় প্রেমভক্তি ও জ্ঞানালোক ফুটিবে প্রভো। তখন বিদ্যাপতির একটী প্রার্থনা মনে পড়িল। সেইটী শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম।

"মাধব। বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া করি না ছাড়িবি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি,
যব তুঁহু করিবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ, জগত কহয়সি,
জগ বাহির নহি মুই ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুঁয়া পরসঙ্গ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুঁয়া পদ-পল্লব, কবি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।"

এইবার বটুবাবুকে ডাকিলাম, তিনি উঠিয়া বসিলেন। আমি ও বিনোদ একবার মাঠের দিকে দেখিতে গেলাম। এটী গ্রামের উত্তর প্রান্ত। মাঠের আলে বেড়াইতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটী ১২।১৩ বৎসরের বালক একটা গোরু আনিয়া মাঠে বাঁধিতেছে। শিয়ড় গ্রামটী কোন দিকে, ইহা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে দূর হইতে আমাকে দেখিতে লাগিল। যেমন তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, অমনি সে গোরুটীর নিকট হইতে দৌড়িয়া গেল। আমি তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম, 'ওহে ছোকরা, শোনো শোনো।' সে আমার ডাক শুনিয়া দাঁড়াইয়া কহিল 'তুমি আমায় ধরবে যে'।

আমি কহিলাম 'কেন? তোমায় ধরবো কেন?' এই বলিয়া যেমন আর একটু অগ্রসর হইলাম, সেও আবার সরিয়া গেল। বিনোদ তখন শৌচে গিয়াছে, আমি একাই হাসিতে লাগিলাম। পল্লিগ্রামের সরল বালক,—অচেনা লোক দেখিয়া, কেমন ভীত হইয়াছে। আমি বলিলাম, 'তোমার কোনও ভয় নাই, দাঁড়াও; তুমি শিয়ড় গাঁ কোন্ দিকে বলতে পার?' সে পশ্চিম দিক নির্দ্দেশ করিয়া দিল এবং কহিল 'অধিক দূরে নহে।' তখন শিয়ড়ে বেড়াইতে যাওয়া স্থির করিলাম। এদিকে বটুবাবু এবং বিনোদ দুই দিক দিয়া আসিয়া তথায় জুটিলেন। তাহাদিগকে কহিলাম 'চল, শিয়ড়ে বেড়াইয়া, মায়ের মাতুলালয় এবং হৃদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী দর্শন করিয়া আসি।' তাঁহারা সম্মত হইলেন। আমরা বাটী আসিয়া গায়ের কাপড় লইলাম। বরদা মামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'শিয়ড়ে আমরা কোন্ পথে যাইব?' তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া কথা কহিতে কহিতে কিছু দূর গিয়া সোজা পথ নির্দ্দেশ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আমরা গল্প করিতে করিতে শিয়ড়ে চলিলাম।

(ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮৬ পৃষ্ঠার পর।)

প্রধান ভাব।

এ সাম্রাজ্যের প্রধান ভাবই মাতৃভাব। তাহা হইতে আবার দুইটী শাখা বহির্গত হইয়াছে। মার্জ্জার শাবকের মাতৃভাব ও কপি শাবকের মাতৃভাব। মার্জ্জার শাবক তাহার জননীর একেবারে অধীন। সে যেখানে লইয়া যায়, সেই স্থানে যায়; যেখানে ফেলে, সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে মিউ মিউ শব্দ করে। এই শ্রেণীর ভক্তগণ জগজ্জননীর উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া "আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি রথ, তুমি রথী" এই ভাবের পোষকতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবানকে বকল্‌মা দিয়াছেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এ ক্ষেত্রে ভক্তপ্রবর গিরীশচন্দ্র ও রামচন্দ্রের নাম উল্লেখ্য। আবার কপিশাবক-ভাবাবলম্বী ভক্ত নিজেই জননীকে ধরিয়া থাকেন। ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনর্ব্বার জননীকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেন। সুতরাং জননীকে বড় ভাবনাগ্রস্ত হইতে হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তেজস্বী ভক্তবৃন্দ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

মহিষাসুরমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী দশভুজা যেমন তাঁহার চরণযুগলের একটী মহিষাসুর এবং অন্যটি সিংহের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, ব্যাকুলতাও সেইরূপ উপরোক্ত মাতৃভাবদ্বয়ের উপর চরণার্পণ করিয়া দণ্ডায়মান। এই ব্যাকুলতা না আসিলে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের একমাত্র প্রাপ্য বস্তু লাভ করা যায় না। পাঠক! সুরধুনী-তীরে শচীপ্রাণধন কোমলতনু গোরাচাঁদের মুখঘর্ষণ-জনিত রক্তবিন্দুর ছবি তুমি কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাও কি? তাহা ব্যাকুলতাপ্রসূত। চন্দ্রমণি-প্রাণপুত্তলী চিরকুমার মাতৃভাবে আত্মহারা মাতৃঅদর্শনে ব্যাধবিদ্ধ-কুররী সম রোরুদ্যমান হৃদয়াসুধাবিত রামকৃষ্ণের ভাগীরথী-তীরে মুখ ঘর্ষণ ব্যাপার শুনিয়াছ কি? ব্যাকুলতাই ইহার জন্মদাতা। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" তাই বুঝি এত কষ্ট স্বীকার!! সেইজন্য বলিতেছিলাম, ব্যাকুলতা এই সাম্রাজ্যের অভিপ্রেত বস্তু। এই সাম্রাজ্যে আসিয়া সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত প্রাণ কখনও নিরাশাজর্জ্জরিত হয় না। একান্ত মনোযোগের সহিত সম্রাটের অনুধ্যান করিলেই তিনি গুরুরূপে নিকটবর্ত্তী হইয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তবে কাহারও একটু বিলম্ব হয়,

কাহারও বা-সত্বর হইয়া যায়। সেজন্য বিষণ্ণ বা উন্মত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ধীরে স্থিরে যাহা আসে তাহার অভিবাদন করিতে হইবে। ভগবৎ ইচ্ছার নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে। বৃথা কোলাহল করিলে কাজ হইবে না।

গুরুপ্রাপ্তির পর তোমার মধ্যে ধর্ম্ম-চারাগাছ রোপিত হইল বুঝিতে হইবে। এইবার বিভিন্ন মানবের ভাবরূপ গো-ছাগলাদি হইতে তোমার ভাব-চারাটী রক্ষা করিতে হইবে। গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইবে। তোমাকে প্রথমে কিছুদিন অন্ততঃ কয়েক বৎসর নববিধবা নারীর একান্ত বাসব্রত অবলম্বন করিয়া হৃদয়-স্রোতস্বতীকে ভগবৎ সমুদ্র পানে ধাবিত করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখিবে নদী যেরূপ সমুদ্রে পড়িবার যত নিকটবর্ত্তী হয় ততই প্রশস্তত্তর হইতে থাকে, তোমার হৃদয়নদীও সেইরূপ প্রশস্ততর হইতে থাকিবে। মানবমাত্রেই বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট; এইটী ভুলিয়া গিয়া আমাদিগকে বড়ই প্রবঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং তুমি এ সাম্রাজ্যের হও আর না হও, আপন ভাবের প্রকৃত ভাবুক হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে মিশিতে পারিবে না। যদি ইহার অন্যথা হয় জানিও তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী। ভাব-চারাটী যখন বলশালী বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে, তখন তোমার ভাব উল্‌টাইয়া দেওয়া মানবশক্তির অসাধ্য হইয়া পড়িবে। লোকে কি বলিবে? বড় জোর পাগলই বলিবে। বলুক্। রামকৃষ্ণ বলিতেন 'লোক পোক'। এই বাক্যের সমর্থনের জন্য আরব্য উপন্যাসের একটী গল্প বলি। কোনো পর্ব্বতে একটী স্বর্ণময় উৎস (Golden Fountain) ছিল। যে কেহ তাহা দেখিতে যাইবেন, চতুর্দ্দিক হইতে বিভীষিকাপ্রদ ও অপমানসূচক শব্দ তাঁহার অনুগমন করিবে। সে শব্দ নিচয় যদি তাঁহার শ্রুতিগোচর না হয় তাহা হইলে মঙ্গল, নতুবা একবার সে শব্দ শুনিতে পাইলে দর্শনেচ্ছুককে একেবারে কালপাথরে পরিণত হইবে! সেইরূপ ভগবৎ-উৎসদর্শনাভিলাষী তুমিও দেখিতে পাইবে, তোমাকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করিবার জন্য অজস্র বিভীষিকা রাক্ষসীগণ লেলিহমান জিহ্বা লইয়া স্বকার্য্যসাধনোদ্যত। সেই সময় যখন তুমি সবে মাত্র নবীন পথিক—তোমাকে কর্ণকুহরদ্বয় এরূপ ভাবে দৃঢ়াবদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে সে শব্দ তোমার শ্রবণ বিবরে না পৌঁছে। পৌঁছিলেই পদস্খলন—ঘোরবিপদ—অনন্ত নৈরাশ্য তোমার কোমল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রাণকে ঘিরিয়া তোমাকে প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া তুলিবে।

তাই পুনর্ব্বার বলি, গুরুপাদপদ্মে অচলামতি রাখিতে হইবে। তাহা হইলে পিতৃ-ধৃতহস্ত পতনাশঙ্কারহিত সাহসী বালকের ন্যায় তুমি গন্তব্যপথে চলিতে পারিবে ও শেষে গম্যস্থানে অনায়াসে পৌঁছিতে পারিবে। সংসারের শত শত বিভীষিকা, অসংখ্য বিপদরাশি, সুতীব্র উৎপলনানিচয়—পর্ব্বতপ্রমাণ তুলাস্তূপকে একটা অগ্নিকোণা যেমন ধ্বংস করিয়া দেয়—শ্রীগুরুপ্রদত্তজ্ঞানাগ্নির সামান্যমাত্র ইঙ্গিতে কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে, তাহারও কোনো সঙ্কেত থাকিবে না। সেইজন্য বুঝি মহোরগাবতংশভূষণ মহাদেব প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—

"গুরুসেবা পরং তীর্থং অন্যতীর্থমনর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি! সদ্গুরোশ্চরণাম্বুজম্।"

মাতৃভাব এ সাম্রাজ্যের প্রধান ভাব সত্য, তা' বলিয়া অন্যান্য ভাব সকলকে অনাদর বা অস্বীকার করা *রামকৃষ্ণ-প্রচার অভিপ্রায় নহে।* অন্যান্য ভাব চিরদিন আছে—থাকিবে। স্বতন্ত্র ভাব স্বতন্ত্র লোকদিগের পক্ষে প্রযুজ্য। কিন্তু এই মাতৃভাবটী প্রথম সোপানে সকলেরই অনুকূল। কেননা মা সকলেরই আদরের বস্তু।

পাঠক! ভুলিবেন না, এ বিশ্বজনীন ধর্ম্মে সকল ভাবের সমান প্রতিপত্তি। আমার ক্ষীণালেখনীতে যদি রামকৃষ্ণবিতরিত মহোদার ভাবের কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে—তাই মনে মনে বড়ই ভয় হয়। সব ভাবই সমান। একটীকে আঁট করিয়া ধরিতে হইবে।

প্রার্থেয় বস্তু।

ভবরোগে-রুগ্ন মানব আমরা—সান্নিপাতগ্রস্ত রোগীর জল অম্বল চাওয়ার মত, ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনার জন্য সাতিশয় অভিলাষী। সান্নিপাত রোগী বেশ জানে যে, যাহা চাহিতেছে তাহা পাইলে তাহার উপকার হইবে না; কিন্তু লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া যখন যাহা চায় তাহা না পাইলে অপরকে ভয়ানক নিষ্ঠুর বলিয়া মনে করে। আমরাও লোভের এমনি করায়ত্ত যে পরমকারুণিক ভগবানকে যারপরনাই নির্দ্দয় ভাবিয়া থাকি। যাই হোক্, ভব-পীড়া-চিকিৎসক রামকৃষ্ণও তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন "মিশ্রি যেমন মিষ্টির মধ্যে নয়, রোগীকে দেওয়া চলে; ভগবানের কাছে বিশুদ্ধ ভক্তি প্রার্থনা করা একটা প্রার্থনার মধ্যে নয়, তার জন্য

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা যাইতে পারে।" একবার প্রভুর প্রকটাবস্থায় পীড়াগ্রস্ত কোন ভদ্রসন্তান মনে মনে পীড়ারোগের জন্য ভাবিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। অন্তর্যামী প্রভু বলিলেন 'তারকেশ্বরে যাও, এখানে হইবে না।'

তাই বলি হে দেহাত্মবুদ্ধিজড়িত, শরীরসর্ব্বস্ব, কামিনী-কাঞ্চনপ্রার্থী মানব, শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে তোমার প্রার্থনাপূর্ণ হইবে না। সময় থাকিতে স্থানান্তরে গিয়া তোমার কামনা-পূর্ত্তির বন্দোবস্ত কর। এ সাম্রাজ্যে ভক্তি, মুক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য ও প্রেমের উৎস স্বরূপ রামকৃষ্ণ নিরন্তর বিদ্যমান। তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার বিশুদ্ধাভক্তি বিশুদ্ধ প্রেমাদিতে পূর্ণ। যদি তুমি এই সকলের জন্য মনের গভীরতম স্থান হইতে একবার ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা কর—করিতে পার,—তবে সেবক রামচন্দ্রের অভয়বাণী স্মরণ রাখিও, "তিনদিনে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে।" কিন্তু পাঠক! হৃদয়-কলসে ভক্তিবারি সিঞ্চন করিতে গিয়া আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লও, সেই কলসের নিম্নে বাসনা ছিদ্র আছে কি না? সেই ছিদ্রটী থাকিলে তোমার নাম জপ, রূপধ্যান এবং লীলাস্মরণমননাদি সমস্ত বিফল হইবে। তোমাকে গর্ত্তনিরাকরণাপ্রয়াসী বারিসঞ্চনোন্মত্ত কৃষকের নিরাশা-জর্জ্জরিত পরিণাম অনুভব করিতে হইবে। ভক্তকে আপন প্রার্থের নির্ব্বাচনে সতর্ক করিবার জন্য ভগবানের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাহা এই—

> "যো দারাগার পুত্রাপ্তন্ প্রাণানবত্তমিমং পরং
> হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তু মুৎসহে ?"

অর্থাৎ 'যাঁহারা পত্নী, গৃহ, পুত্র, আত্মীয়, প্রাণ, ধন, ইহলোক, পরলোক এই সকল গুলির মমতা পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি?'

পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন, আত্মতুলনা কি প্রকার বহুমূল্য পদার্থ। এ সংসারে যিনি আত্মতুলনায় অভ্যস্ত, ভ্রম তাহার শত্রু। মনে কর, তোমার নিকট দুইজন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। একজন সুধু তোমাকে দেখিতে চায়, অপর ব্যক্তিটী তোমার নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করে। তুমি কাহাকে ভালবাসিবে? এতক্ষণে ঠিক বুঝিতেছ যে, সুধু দর্শন প্রার্থীটী তোমার স্নেহের পাত্র। এইরূপ বুঝিয়া সুজিয়াও অনেক সময় কূটতর্কের আশ্রয় লইয়া আমরা প্রকৃত পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। তবে যাঁহারা মহাজনগণের পন্থা অনুসরণ করেন, যাঁহারা ভক্তচিত্র আপন হৃদয়ে আঁকিয়া লয়েন, যাঁহারা

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপে তৈলবিন্দু যোগে তাহাকে প্রদীপ্ত করিবার মত আপনার ভ্রান্তজীবনকে মহাপুরুষদিগের দ্বারা অনুসৃত পথে চালাইয়া উপযুক্ত মার্গে আনয়ন করেন, তাঁহারা কখনও যথেচ্ছা ভাবে প্রার্থনা করেন না। কারণ প্রহ্লাদের সেই মনোমোহিনী প্রার্থনা,—

"মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ,
তৎসঙ্গভীতোনির্ব্বিন্নোমুমুক্ষুস্তামুপাশ্রিতঃ।"

অর্থাৎ 'আমি স্বভাবতঃই কামেতে আসক্ত, আমাকে আর বরদ্বারা প্রলোভিত করিও না। আমি সেই কামশক্তি হইতে ভীত হইয়াই তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তোমার আশ্রয় লইয়াছি' ইত্যাদি, তাঁহার চিত্তপটে স্বর্ণাক্ষরে বিরাজিত রহিয়াছে। বিত্তলিপ্সু ধ্রুব যখন ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, তখন কি ধন প্রার্থনা করিয়াছিলেন? না, দেখিলেন সে ধনের নিকট আপন অভিপ্সিত ধন অতীব তুচ্ছ, তাই বলিতেছেন 'আর ধন চাইনা, এই করুন যেন আপনাতে মতি থাকে। আর রাজ্য, যশঃ ইত্যাদি কিছুরই প্রয়োজন নাই—কেবল আপনাতেই প্রয়োজন।' তাই বলিতেছিলাম, হে সুধি, তুমি প্রার্থনা করিবে—কর। কিন্তু সাবধান! তিনি কল্পতরু। কি চাইতে কি চাহিয়া ফেল, একটু সতর্ক থাক। সেই বিলাসপ্রমত্ত যথেচ্ছ-প্রার্থীর ব্যাঘ্র-কবলে-পতন ঘটনা স্মরণ কর।

প্রধান কর্ত্তব্য—ব্রহ্মচর্য্যপালন।

পাঠক! রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অচিন্তিতপূর্ব্ব উন্নতির কারণ কখনও মনে মনে ভাবিয়াছ কি? একটু স্থির মনে দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, ইহার মূলভিত্তি ব্রহ্মচর্য্য—জীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য। বাস্তবিক বলিতে গেলে ব্রহ্মচর্য্যের অমানুষীশক্তি রামকৃষ্ণজগতে প্রতিফলিত হইয়াছে। সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম একটা নূতন ধর্ম্ম নহে। ইহা প্রাচীন সনাতনধর্ম্মের পুনর্জ্জাগ্রত রূপান্তর মাত্র। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্য সাধনা করিয়া আর্য্যঋষিগণ যে সাহিত্য জগতে, মনোবিজ্ঞানে, ধর্ম্ম-জগতে কি প্রকার উন্নতির চরম সীমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। একবার সুদূর অতীতের দিকে চাহিয়া তাহার উন্নতি, আর এ বর্ত্তমানের পানে চাহিয়া তাহার অবনতির বিষয় ভাবিয়াছ কি?—তখনও মানুষের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল, আজও তাহাই আছে; তখনও তাঁহারা যাহা খাইত, আজও ভারতমাতা আমাদিগকে তাহা খাইতে দেন;

তখনও তাহারা যে বিষয় লইয়া আন্দোলন করিত, আমরাও আজ অল্পবিস্তর সেই সকল বিষয়ে আন্দোলন করিয়া থাকি। তবে কেন তাহারা অমর হইয়াছে, আর আমরা জলবুদ্বুদের মত লোপ পাইতেছি? সুধী নিশ্চয়ই উত্তর করিবেন যে, আমরা ব্রহ্মচর্য্য ধন হারাইয়া বাস্তবিক নিঃস্ব হইয়াছি। ভারত যে ধর্ম্মপ্রাণ তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিনা। বাস্তবিক ভারতে—ভারতে কেন, সর্ব্বত্র—ব্যায়াম ও খাদ্য যেমন শরীরের জন্য প্রয়োজন, ধর্ম্ম ও নীতি সেইরূপ মনের জন্য আবশ্যক। ভোজনাভাবে শরীরের যেরূপ অবনতি আরম্ভ হয়, ধর্ম্মাভাবে মনেরও সেইপ্রকার অবনতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মানবের প্রধান অলঙ্কার চরিত্র-গঠন। কেবল ব্রহ্মচর্য্যই এই চরিত্র-গঠনের একমাত্র সহায়।

সুপক্ক রসালফলের অভ্যন্তরে একটী পোকা কেমন করিয়া প্রবেশ করে—তাহাকে একেবারে অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলে; পিতামাতাও দেখিতেছেন পুত্রটী সুশ্রী, কিন্তু পীড়ার করালকবলে গ্রস্ত। সে সমাজের ও বসুন্ধরার একটী ভার হইয়া পড়িয়াছে। তবুও মোহাচ্ছন্ন মানবের এমনই ধারণা, তাহাকে কোনও মতে ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহৌষধের ব্যবস্থা না দিয়া ডাক্তারী কবিরাজী ইত্যাদি ঔষধের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত থাকেন। এইটী ঠিক না বুঝা পর্য্যন্ত আমাদিগকে চির-যন্ত্রণার অধীন থাকিতে হইবে। ঔষধ প্রয়োগে অর্থব্যয় ও কায়ক্লেশ এবং মনোক্লেশ ব্যতীত অন্য উপকার নাই।

ব্রহ্মচর্য্যপালনাভাবে কত বালকরূপী চন্দ্র যে রিপু-রাহুর কবলে পড়িতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যে ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওনা কেন, দেখিবে ব্রহ্মচর্য্যবিমুখ-চরিত্রহীন বালক কুত্রাপি তিষ্ঠিতে পারিবে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে—ব্রহ্মচর্য্যালোকরহিত অন্ধকারে নীয়মান মানব কখনও সৎসাহস, শৌর্য্য, বীর্য্য ইত্যাদি মানবীয়গুণে ভূষিত হয় নাই এবং ইহা ধ্রুবসত্য যে, সে কখনও মনুষ্য কিম্বা দেবতার প্রীতি-ভাজন হইতে পারে নাই—পারিবে না।

এইবার কি উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিতে হয়, এবং কেমন করিয়া তাহাকে বহুবিধ বৈরভাবাপন্ন আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হয়; তাহাই আলোচ্য।

ব্রহ্মচারীর প্রথম কর্ত্তব্য সৎসঙ্গে বাস এবং অসৎসঙ্গ বর্জ্জন। তাই অসৎসঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিতেছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রী র্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ম্॥

'অসৎসঙ্গে সত্য, শুদ্ধি, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী যশ, শম, দম, ঐশ্বর্য্য সকলই নষ্ট হয়।' এইবার ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করিতে পারেন, সৎসঙ্গ কেমনে চিনিতে পারিব? ভাগবত মৃদুস্বরে সে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনাঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥

"সাধুগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহারা মদগতচিত্ত, প্রশান্ত, তুল্যদর্শন, মমতারহিত, অহঙ্কারবিবর্জ্জিত, নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্পরিগ্রহ। দুঃখ-সহনাভ্যস্ত, দয়ার্দ্র হৃদয়, সকল জীবের সুহৃদ, অজাতশত্রু, শান্ত ও সুশীল।" প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর ফলে গুরু-শিষ্যের মধ্যে একটা শিথিলতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ফলতঃ ছাত্রবৃন্দ বাল্য-হইতে যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া ইহপরকালের উন্নতির গোড়ায় কুঠারা-ঘাত করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে পিতামাতাকে নিরন্তর সাবধান থাকিতে হইবে। নতুবা উপায়ান্তর নাই। যতদিন পুত্র আপনার ভার আপনি জানিতে পারে নাই, ততদিন পিতামাতা সে ভার লইবেন। তাহার ভাবী জীবনের ভালমন্দের জন্য তাঁহারাই দায়ী। শুনিয়াছি, সৎসঙ্গবলে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সৎস্বভাবাপন্ন হইয়াছে; অসৎসঙ্গপ্রভাবে মুনিঋষির পর্য্যন্ত মন টলিয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মচারীর সৎসঙ্গ যে কতদূর প্রয়োজন তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

ব্রহ্মচারী একটী কথা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিবেন যে, যতদিন তিনি ব্রহ্মচর্য্যসাধনে রত, ততদিন যেন তাঁহার শয্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘুমাইতে না পারেন। মানবের ইন্দ্রিয়াসক্তি এতই প্রবল যে, একশয্যাশায়ী ব্যক্তিদ্বয়ের চরিত্রস্খলন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়টী কাহারও সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর এ বিষয়টী অবহেলনীয় নহে। ব্রহ্মচারী দুগ্ধফেণনিভ শয্যার লালসা ত্যাগ করিবেন। অনতিকঠিন শয্যাগ্রহণ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। উষার প্রাক্কালে শয্যাত্যাগ করিতে হইবে। তদনন্তর মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শুদ্ধমনে শুদ্ধশরীরে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত

ধ্যান ধারণায় ব্যাপৃত থাকিবেন। তদনন্তর শরীর রক্ষার জন্য পরিমিত ব্যায়াম প্রয়োজন। এইরূপে দিবাভাগে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যাবলী শেষ করিয়া সন্ধ্যাগমে পুনর্ব্বার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে এবং রাত্রিতে শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে সৎচর্চ্চা করিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত।

পরিমিত ভোজন এবং পরিমিত শয়ন ব্রহ্মচারীর সতত পালনীয়। রাত্রিভাগে যৎসামান্য আহার করিতে হয় এবং অপরিমিত শয়ন পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহা হইলেই স্বপ্নবিকারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অধিক ভ্রমণ স্বপ্নবিকৃতির বড়ই অনুকূল। এ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়—কোন বস্তু যতই উপাদেয় হউক না কেন, মাত্রা অধিক হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই তাহা হইতে সম্ভব।

এইবার ব্রহ্মচর্য্য বলিতেছেন—তুমি বেশি বকিও না। বাক্ সংযম অভ্যাস কর। বেশী কথায় মিথ্যা কথা থাকিতে বাধ্য। তাই বোধ হয়—ইংরাজীতে প্রবাদ আছে 'Silence is golden speech in silvery।' আর হিন্দুস্থানীতে বলা আছে 'সবসে চুপ্ ভালা।' যেখানে কথা বলা উচিত সেখানে চুপ থাকিতে বলিতেছি না, কারণ এবম্বিধ নীরবতা মূর্খতার নামান্তর মাত্র। বৃথা বাক্যব্যয় সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। আবার দেখা যায়, যাহারা বহুলবাক্যব্যয়ী, তাহাদের হৃদয় বড়ই বিচলিত, ভাবনারাশি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত। গম্ভীরাত্মা হইলে ভাবনানিচয় সুচারুরূপে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। দেখিতে পাওয়া যায়, বৃথা বাক্যব্যয়প্রয়াসী হিতাহিতানভিজ্ঞ মানব আপনাকে সর্ব্বদা পরচর্চ্চায় নিযুক্ত রাখিয়া থাকেন 'পরচর্চ্চায় পরমাত্মার চর্চ্চার ভুল হয়।' সুতরাং বাক্ সংযম সতর্কতার সহিত অভ্যাস করিতে হইবে।

পরিশেষে ব্রহ্মচারী আত্মপরীক্ষায় মনোনিবেশ করিবেন। আত্মপরীক্ষা না করিলে উন্নতি অবনতির পরিমাণ জানিতে পারা যায় না। শুনিতে পাই ফ্রাংকলিন (Franklin) প্রমুখ মহাত্মাবৃন্দ রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে আত্মপরীক্ষা করিয়া শয়ন করিতেন এবং উঠিবার পর কি কি সৎকার্য্যে দিনটী অতিবাহিত করিবেন তাহার তালিকা (Routine) প্রস্তুত করিয়া লইতেন। তাই ফ্রাংকলিন আজ নৈতিকজগতের আদর্শ।

পাঠক! ভগবানের দিকে আপনার মনকে সর্ব্বতোভাবে চালাইবার জন্য কয়েকটী অভ্যাসের প্রয়োজন। সেই অভ্যাস সমষ্টির নামই ব্রহ্মচর্য্য। রাম-কৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে সেই ব্রহ্মচর্য্যের আজ নব জাগরণ। তোমাকে কামাদি শত্রু

ব্যস্ত করিতেছ? ঢাল তরোয়াল কোথায় খুঁজিতে যাও? তোমার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য-অস্ত্র লুক্কায়িত রহিয়াছে. তাহাকে সযত্নে বাহির কর। তাহার দর্শনেই রিপুবাজি বিমলিন হইয়া যাইবে। যদি সংসারেই আসিলাম—আবার কিরূপে আসিলাম—না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে (As the Lord of creation) তবে কেন জলবুদ্বুদের ন্যায় লোপ পাইয়া যাইব? এখানে এমন একটা পদাঙ্ক রাখিয়া যাইতে হইবে, যাহা অনুসরণ করিলে ভাবিবংশ অক্লেশে শুদ্ধমার্গ চিনিয়া গন্তব্যস্থানে পৌছিতে পারিবে। তাই বলি, যদি শক্তি-সঞ্চয় করিতে চাও, যদি মানব-শব্দের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে চাও, যদি জগতের চক্ষে আপনাকে, আপনার পিতামাতাকে, আপনার দেশকে গৌরবান্বিত করিতে চাও, পাঠক! ব্রহ্মচর্য্যের ক্রোড়ে উপবেশন কর। নিয়তি পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের করতলগত। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

গুরু-পূজা।*

(পৌষ কৃষ্ণা-সপ্তমী—১৩১৫)

জলদ গম্ভীর স্বরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে;
করে পুনঃ সে বাণী আঘাত।
শুন নর সেই কথা, অপূর্ব্ব এ ধর্ম্ম-গাথা;
গুরুপদে কর প্রণিপাত॥
"কর দীন-জন-সেবা, অন্য ধর্ম্ম আছে কিবা,
মূলমন্ত্র হ'ক জীবনের।
আমরণ এই ধর্ম্ম, নাহি আর কর্ম্মাকর্ম্ম,
শ্রেষ্ঠ কার্য্য সেবা অনাথের॥
ক্ষণস্থায়ী এ জীবন, অনিত্য এ রত্ন-ধন,
ঢাল ভাই, অনাথ-সেবায়।
তবেই অমর হবে, মর্ত্ত্যধামে কীর্ত্তি র'বে,
যশোগান গাইবে ধরায়॥
না বুঝে ইহার মর্ম্ম, না ক'রে এমন কর্ম্ম,
ভক্তি মুক্তি ল'য়ে কিবা ফল।
সহস্র নরক শ্রেয়ঃ, এ জীবন করি হেয়,
পর-সেবা করি গিয়া চল॥

---

* স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত।

নরে যদি বাস তাঁর, কি কাজ ঘুরিয়া বল,
যথা তথা দেবতা সন্ধানে।
আর্ত্তজন, বলহীন, চৌদিকে ভ্রমিছে দীন,
পূজা কর দীন-নারায়ণে॥
ভাগিরথী-তীরে আসি, কেন কূপ অভিলাষী,
স্নিগ্ধ হও পূত বারিপানে।
জীবন যৌবন ধন, কর সবে সমর্পণ,
দেব তুল্য মানব-চরণে॥
অশিক্ষিত প্রপীড়িত, শতরূপে যে লাঞ্ছিত,
মত্ত তার দুঃখ-নিবারণে।
যে জন হইতে পারে, অনন্ত সে শক্তি ধরে,
মহাকার্য্য সক্ষম সাধনে॥
অনাথ পীড়িত দীনে, যেই জন শিবজ্ঞানে,
পূজা সেবা করে শ্রদ্ধা ভরে।
সেই সে পরম ভক্ত, সুবৈষ্ণব শৈব শাক্ত,
যথার্থ সে সেবিছে ঈশ্বরে॥
মন্দিরে মুরতি হেরে, ভক্তি ভরে পূজা করে,
শিব তত সুপ্রসন্ন নয়।
শিবে হেরি আর্ত্ত জীবে, যে জন তাঁহারে সেবে,
তাঁর প্রতি তুষ্ট অতিশয়॥
লই জন্ম শতবার, ভুঞ্জি দুঃখ অনিবার,
শিখি যদি সেই শ্রেষ্ঠ পূজা।
দুষ্ট, ক্লিষ্ট, দীনজনে, পূজা করি শিবজ্ঞানে,
করি সবে হৃদয়ের রাজা॥
সফল সাধন মম, নাহি ধর্ম্ম সেবা সম,
জীব সেবা জীবনের সার।
জীবে শিবে এক জ্ঞান, নাহি কর ভেদ জ্ঞান,
ধন্য হবে জনম তোমার॥"

সেবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

সমালোচনা।

প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।—এই পুস্তকখানি পরমভক্ত প্রেমিক বৈষ্ণব কবি শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর কর্তৃক রচিত। শালগ্রাম নারায়ণ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও যেমন মোক্ষফল প্রদান করেন, সেইরূপ এই প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা পুস্তক আকারে বৃহৎ না হইলেও ইহার আলোচনায় মানব হৃদয়কে ঈশ্বর প্রেমিক এবং শান্তি ও প্রীতিপূর্ণ করিয়া তুলে। ভক্ত মাত্রেরই ইহা পরম আদরের সামগ্রী। 'ভগবান আমাদের আপনার জন'—এই চন্দ্রিকায় তাহা প্রত্যয়মান হইয়া থাকে। এই পুস্তকখানি এতদিন ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ হইয়া বটতলা হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। ভক্তপ্রাণ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয় কর্তৃক ইহার পরিশুদ্ধ সংস্করণ দেখিয়া যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। তিনি ইহাতে নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী এবং মূ[illegible] পাঠান্তর, টীকাটিপ্পনী ও অর্থাদির সন্নিবেশ করিয়া পুস্তকখানি অতি হৃদয়গ্রাহী এবং সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। প্রতি ভক্তিপ্রাণ পাঠক এই চন্দ্রিকার আলোকে পথ নির্ণয় করিয়া সংসারারণ্য মধ্যে বিচরণ করিলে সুখে চালিত হইয়া প্রেমময়ের শ্রীচরণ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারিবেন, ইহা আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস। পুস্তকের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

শ্রীদুর্গানাম-মালিকা।—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয় প্রকাশিত দুর্গানাম-মাহাত্ম্য। মূল্য এক আনা মাত্র।

নিত্য-সহচর।—উক্ত প্রকাশক কর্তৃক আর একখানি আবশ্যকীয় পুস্তিকা। ইহাতে স্বাস্থ্যলাভের উপায়, ধর্ম্মশীল ও কর্ম্মবীর হইবার উপদেশ, এবং সুখশান্তি লাভের পন্থা নির্ণয়, বিবিধ শাস্ত্রাদি হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। নিত্য-সহচরের উপদেশ সকলেরই জীবনে নিত্য প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক। মূল্য দুই আনা মাত্র।

এই তিনখানি পুস্তক প্রকাশক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মহাশয়ের নিকট পাওয়া যাইবে। ঠিকানা—নওয়াব হাইস্কুল, মুর্শিদাবাদ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

ফাল্গুন, ১৩১৫ সাল। *

দ্বাদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠলীলা-গীতি।

বালক সকল মিলি, কোলাহল রব তুলি,
খেলিতে খেলিতে সবে যায়। (হায় গো)
রাজারাম হালদার, তাঁহার সে পুণ্যাগার,
পাঠশালা মিলন তথায়॥ (তথা ছেলেরা সব লেখে পড়ে)
শিশু সবে ফুল্লচিত্ত, কোঁচড়ের মুড়ি যত,
সমাপানে করিল আহার।
সম্মুখের সরোবরে, অঞ্জলি অঞ্জলি করে,
জলপান করিলেক তার॥ (যেন যমুনাতে রাখালেরা)
তখন বালক সবে, মত্ত নানা কলরবে,
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ঘর দ্বার।
হেনকালে ধীরি ধীরি, বেত্র এক হাতে ধরি,
আসে তথা মাধব সরকার॥*
(মহা ভাগ্যবান সেই) (যে গদাধরে পড়াইল)
সে গুরুর তীব্র দাপে, বৈসে সবে চুপিচাপে,
কারো মুখে নাহি সরে বাণী।

---

* সন্নিকটবর্ত্তী শ্রমপুর গ্রামনিবাসী।

উমা, শ্যামা* রাজারাম, (আরো) না জানি সবার নাম,
বহু জন যুটিল তখনি ॥
(গীত শুনিবার আশে—গদাইয়ের মধু মুখে)
আদরে তখন সবে গদাধর প্রতি।
কহিল গাহিতে তাঁরে শ্যামানাম গীতি ॥
গদাধর হাসি হাসি ত[illegible] আসে।
বসিল যথায় রাজারাম আদি বসে ॥ (কত আদরে বসালে)
সুধাকণ্ঠে গাহে গীতি মাতৃ প্রেম নীর।
নেহারি মাধুরী সব পরাণ অস্থির ॥
শ্রবণে পাষাণ দ্রবে সব আঁখি ঝরে।
গদাই মোহিলে যত প্রাণ মন তরে ॥
দু' চারি সঙ্গীত হবে এই মতে শেষ।
সবাকার মন প্রাণ শ্যামাতে নিবেশ ॥
গদাধর লিখে বিশা গোটা গোটা লেখা।
সুন্দর আকার তার যায় ভাল দেখা ॥
শিশুবোধে দাতাকর্ণ পড়ে গদাধর।
মধুর বচন শুনে, মরি কি সুন্দর ॥
শুভঙ্করে ধাঁধা লাগে, নাহি মন তাহে।
চাল-কলা লক্ষ্য বিদ্যা শিখিতে না চাহে ॥
পাঠ শেষে শিশুগণ ফিরে যবে গৃহে।
পূর্ব্বভাবে গদাধর পুন গীতি গাহে ॥
হেনমতে পাঠলীলা খেলে গদাধর।
ভকত-চিত রঞ্জন প্রাণ-মন-হর ॥
স্মরিয়ে সে শিশুবর চরণ দু'খানি।
এখনো শ্রবণে সেই সুধাগীতি শুনি ॥

---

* উমাচরণ ও শ্যামাচরণ মল্লিক—গন্ধবণিক।

শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২৯ পৃষ্ঠার পর)

[শিয়ড় সংবাদ।]

শিয়ড়গ্রামটী জয়রামবাটীর ঠিক পশ্চিমে। প্রায় ১ মাইল দূর হইবে। আমরা গ্রামে ঢুকিবার মুখেই গাঁজনতলা পাইলাম। একটী বড় পুষ্করিণী, তাহার পাড়ে অশ্বত্থগাছ। এই খানে খুব ধুমধামে গ্রাম্য শিব ৺ শান্তিনাথের গাঁজন উৎসব হইয়া থাকে। গ্রামের ভিতরে অগ্রসর হইয়া আমরা প্রথমে ৺ শান্তিনাথ শিবকে দর্শন ও প্রণাম করিলাম। ইঁহার সম্বন্ধে অপূর্ব্ব কিংবদন্তী আছে। ইনি স্বয়ম্ভু অনাদি-লিঙ্গ। কতকাল এখানে আছেন, তাহা কেহই নির্ণয় করিয়া বলিতে পারেন না। যখন এই গ্রামে লোকালয় হয় নাই, যখন এই স্থান জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল, তখনও ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। সেই সময়ে লালবাজার (নিকটবর্ত্তী স্থান) নামক গ্রামের ব্রজনাথ চৌধুরীর (গোপ) একটী দুগ্ধবতী গাভী ছাড়া পাইবা মাত্রই প্রতিদিন এইখানে ছুটিয়া আসিয়া বাবার নিকট দাঁড়াইত এবং তাহার স্তন হইতে স্বতঃই দুগ্ধ স্খলিত হইয়া বাবার মস্তকোপরি পড়িত। ব্রজনাথ গাভীর সন্ধান করিতে করিতে ক্রমে এই ব্যাপার জানিতে পারেন এবং তিনি যথামত পূজা অর্চ্চনা করিতেন। ক্রমশঃ লোক পরম্পরায় বাবার প্রচার হয়। তখন কত সাধু সজ্জন এখানে উপস্থিত হইতেন। এখানে হত্যা দিয়া অনেকে অনেক প্রকার ব্যাধিদায়ে মুক্ত হইয়াছেন। আমরাও দেখিলাম, একজন বাবার মন্দিরে হত্যা দিয়া রহিয়াছেন। বাবার সেবাদি সম্বন্ধে কেহ কোনও প্রকার অনাচার করিলে, তাহাদের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। গ্রামের মজুমদার বংশের কাশীনাথ মজুমদার কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন তিনি তথা হইতে আসিয়াই বাটী না গিয়া অথবা হস্তপদাদি প্রক্ষালন ও বাস পরিবর্ত্তন না করিয়াই বাবার আরতি করিতে থাকেন। আরতি আরম্ভ করা মাত্রই বাবার গৃহ হইতে অসংখ্য বড় বড় ডেয়ো পিপীলিকা বাহির হইয়া তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। এমন তীব্র দংশন যে, তিনি আরতি শেষ করিতে পারিলেন না, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আরতি পরিত্যাগ করিয়া গৃহপানে ছুটিতে লাগিলেন এবং সেই দংশন জ্বালায় রাত্রমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। অনেকে

দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া এখানে শান্তিনাথের পূজা দিয়া থাকেন। আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাবাকে ভালরূপে দর্শন ও প্রণাম করিলাম এবং অন্তরে অন্তরে শ্রীচরণে জানাইলাম—

"ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।"

এইবার আমরা শ্রীশ্রীমায়ের মাতুলালয় দর্শনে চলিলাম। ইহা গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে। আমরা যাইয়া সন্ধান লইবামাত্র একজন বৃদ্ধব্যক্তি গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলেন। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁহাকে জানাইলে, তিনি 'কেন? কি হইবে? জানার কি আবশ্যক?' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম যে, আমাদের খুব বিশেষ কিছু কারণ নাই, তবে কলিকাতা হইতে আমরা জয়রামবাটীতে আসিয়াছি, শুনিলাম মায়ের মাতুলালয় নিকটে তাই একবার দর্শন করিবার সাধ হওয়ায় এখানে আসিলাম। তখনও তিনি আমাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং যখন বেশ বুঝিলেন যে, আমরা কোনও গুপ্ত উদ্দেশ্যে তথায় যাই নাই এবং আমরা পরমহংসদেবেরই চরণাশ্রিত, তখন তিনি আমাদিগকে মায়ের মাতুলালয়াদি দেখাইলেন এবং যথাযথ পরিচয়াদি প্রদান করিলেন। ইহার নাম শ্রীরামদাস মজুমদার। ইনি মায়ের মাতামহ ৺হরিপ্রসাদের খুড়তুতো ভাই। হরিপ্রসাদের পাঁচটী পুত্র যথা—রামব্রহ্ম, তারক, কেদার, শ্রীপতি এবং বৈকুণ্ঠ এবং দুইটী কন্যা—শ্যামাসুন্দরী ও দয়াময়ী। এইক্ষণ একমাত্র কেদার নামক পুত্র জীবিত, তিনি কলিকাতায় কাজকর্ম্ম করেন এবং সেইখানেই থাকেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রীশ্যামাসুন্দরীর জয়রামবাটীতে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহ বিবাহ হয়। এই শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম। মা বাল্যকালে এই মাতুলালয়ে কত বেড়াইয়াছেন, কত ক্রীড়া করিয়াছেন। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া এই সব স্থান দেখিতে লাগিলাম। ভক্তের চক্ষে না জানি এই সব স্থান আরো কত মনোরম, আরও কত সুন্দর!

আমরা অর্দ্ধঘণ্টাকাল এই স্থলে অতিবাহিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করতঃ ৺হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী দর্শনে চলিলাম। এই বাটীটি গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে। পুনরায় শান্তিনাথের চরণ দর্শন করিয়া যাইতে হইল। দক্ষিণপ্রান্তে আসিয়া কয়েক ঘর গৃহস্থকে বেশ সঙ্গতিপন্ন বলিয়া মনে হইল। ৺রামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায়ের একটী স্মৃতিমঠ তাঁহার বাটীর সম্মুখে

পুষ্করিণির তীরে গাঁথা রহিয়াছে। তাহা অতিক্রম করিয়া আমরা আর কিছু দূরে গিয়া হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাটী পাইলাম। একটী বালিকা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাটীর ভিতরে সংবাদ দিল। হৃদয়ের দুই পুত্র বাটীতে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণা ও বগলা। তাঁহারা আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ঠাকুর যাইয়া যে বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকিতেন, যে স্থানে আহার করিতেন, যে বিষ্ণুঘরে (বিষ্ণুর নাম শ্রীধর) বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেন; সেই সমস্ত দেখাইলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বাটীতে ঠাকুরের সমাধি হইয়াছে, হৃদয় ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এইরূপ যে ফটোগ্রাফ আছে, সেই চিত্র ইত্যাদিও আমাদিগকে দেখাইলেন। আমরা যদিও এই চিত্র বহুবার দেখিয়াছি কিন্তু অদ্য হৃদয়ের গৃহে সেই চিত্রমধ্যে যেন আরও কিছু সৌন্দর্য্য দেখিলাম। হৃদয় সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনা হইতেন। বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের হৃদয়ের সহিত মিলন। কখন হৃদয় আসিয়া কামারপুকুরে ঠাকুরের নিকট থাকিতেন, কখন বা হৃদয় ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শিয়ড়ে চলিয়া আসিতেন এবং ঠাকুর কতদিন এইখানেই কাটাইয়া দিতেন। যখন কলিকাতায় (দক্ষিণেশ্বরে) আসিলেন, কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই হৃদয়কে আনাইয়া বিষ্ণুসেবায় ব্রতী করিয়া সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। যখন দেশে যাইতেন, হৃদয়কে সঙ্গে না লইয়া যাওয়া ঘটিত না—দেশে গেলেই কিছুদিন শিয়ড়ে অবস্থিতি করা চাইই চাই। একবার যখন ঠাকুর এইরূপে হৃদয়ের বাটীতে আছেন (অনুমান ১২৬০।৬১ সাল) তখন একটী সুগায়ক তথায় গান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার গান শ্রবণ উদ্দেশ্যে গ্রামস্থ নরনারী হৃদয়ের বাটীতে সমবেত হইয়াছিলেন। এই সময়ে শ্যামাসুন্দরী তাঁহার কন্যা সারদাকে লইয়া পিত্রালয়ে ছিলেন। সারদার বয়স ৩।৪ বৎসর হইবে। শ্যামা কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া গান শুনিতে গিয়াছিলেন। উপস্থিত নারীগণ মধ্যে একজন কন্যাকে আদর করিতে করিতে বলিলেন, 'তুই কাকে বিবাহ করবি?' কন্যা দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

এই হৃদয়ের বাটীতে অবস্থিতিকালে ঠাকুর একবার রাখাল ভোজন করাইয়াছিলেন। যখন তাহাদের হাতে হাতে জলপান দিতে লাগলেন, দেখ্‌লেন যেন সব সাক্ষাৎ ব্রজের বালক। তারা খাচ্ছে, ঠাকুরও আবার তা থেকে নিয়ে একটু একটু খেতে লাগলেন। ঠাকুরের যখন দক্ষিণেশ্বরে সাধক অবস্থা সে সময়ে, ঠাকুর 'কায়া' এবং হৃদয় যেন 'ছায়া' ছিলেন।

ঠাকুরের ভাবোন্মত্ত অবস্থায় হুঁস থাকিত না, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক ধর্ম্ম সমস্তই লোপ হইয়া যাইত, কেবলমাত্র হৃদয়ের সেবা ও যত্নে তাঁহার দেহ রক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু হায়! লীলাময়ের অপার লীলা কে ভেদ করিবে! যখন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাঙ্গপাঙ্গগণ তাঁহার চরণে সমবেত হইতে লাগিলেন, সেই সময় হৃদয়ের মনোভাব কেমন একটু অন্যরূপ হইতে লাগিল, তিনি একদিন ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে [illegible] লইয়া ৺ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের [illegible] পদ পূজন করেন। এই ঘটনায় কর্ত্তৃপক্ষ রাগান্বিত হইয়া তাহাকে উদ্যান হইতে বিদায় দেন। হৃদয়ের অদর্শনে ঠাকুর অতি বিষাদিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ও তাহার কৃতকর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিলেন। তথাপি যখন হৃদয় দেশ হইতে আসিতেন, তখন ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া কত দুঃখের সুখের কথা কহিতেন, ঠাকুরও কত যত্ন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতেন। আমাদের অনুমান হয়, ঠাকুর তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গগণের সেবা গ্রহণ করিবেন বলিয়া হৃদয়কে উক্তভাবে সরাইয়া দিয়াছিলেন, কারণ অপর কেহ সেবা করিতেছে দেখিলেই হৃদয় তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এ এক প্রকার ঈর্ষা আছে, যাহারা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, তাহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

১২৯৮ বা ৯৯ সালে কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে হৃদয় ঠাকুরের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি ২।১ বৎসর অন্তর একবার কলিকাতায় আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেন, এইরূপে ৩।৪ বার তাঁহার সহিত আমাদের যোগোদ্যানেই সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। রামবাবু ও হৃদয়নাথ, ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিতেন, আমরা নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতাম। কথা কহিতে কহিতে রামবাবুর নয়নধারা বহিতেছে, হৃদয়ও চক্ষু মুছিতেছেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে হৃদয়, ঠাকুরের শ্রীমুখের গান দুই একটা গাহিতেন। হৃদয়ের গলা মধুর ছিল। একবার কালীপূজার দিনে হৃদয় যোগোদ্যানে উপস্থিত ছিলেন, সেইদিন তিনি যে কয়টী গান গাহিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িতেছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
বিষয়মধু তুচ্ছ হোলো, কামাদি রিপু সকলে॥

চরণ কালো, বদন কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মন, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল॥
কমলাকান্তের মনে, আশাপূর্ণ এতদিনে,
সুখ দুখ সমান হোলো, আনন্দসাগর উথলে।

(২)

কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।
রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা অসিধরা করালিনী।
(তুমি) ত্রিগুণধরা পরাৎপরা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকের বাঞ্ছাপূর্ণ কর নানা রূপধারিণী।
(আবার) কমলের কমলে নাচো মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥

(৩)

বাজবে গো মহেশ বুকে আর নাচিস্ না ক্ষেপা মাগী।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, মহাযোগে মগ্ন যোগী॥
যে দেখি তোর নাচনের জোর, নেচে ভাঙ্গলি শিবের পাঁজর,
বিষ-খেগোর আর নাইত সে জোর, দেখ্‌না আছে মুদে আঁখি॥

(৪)

শ্যামা তুই নেবে দাঁড়া ভাঙ্গলো শিবের পাঁজরা কাটি।
শিব মলে অনাথ হবে কার্ত্তিক গণেশ ছোকরা দুটি॥

এই হৃদয়ঠাকুর ও তাঁহার স্ত্রী, ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করার মানসে হৃদয় জীবনের শেষ সময়ে রামেশ্বরের কন্যা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীকে নিজ বাটীতে আনাইয়া তাঁহার চারিপুত্র ও পুত্র বধূগণকে সেই দেবীর নিকট দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

আমরা প্রায় এক ঘণ্টাকাল হৃদয়ধামে ছিলাম। মনে হইতে লাগিল, আহা! আজ যদি হৃদয় জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা আজ ঠাকুর সম্বন্ধে কত তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারিতাম। তিনি আজ আমাদিগকে তাঁহার গৃহে উপস্থিত দেখিয়া কতই আনন্দিত হইতেন। হৃদয় নাই, হৃদয়-জুড়ানো কথা আর কোন্ হৃদয়ে পাইব! এই আক্ষেপ হৃদয়ে লইয়া আমরা হৃদয়-পুত্রগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তৎপরে সন্নিকটবর্ত্তী ৺হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী দেখিতে গেলাম। ইনি মা কালীর খুব

ভক্ত ছিলেন। কালী কালী বলিতে বলিতে জীবন ত্যাগ হয়। ইহার সহধর্ম্মিণীও খুব জ্ঞানী। শুনিয়াছি ৺হরিদাসের অস্থি লইয়া তাহার ১২।১৩ বৎসরের জ্যেষ্ঠপুত্র কলিকাতায় গঙ্গায় দিবার জন্য আইসে, সেই পুত্রটী কলিকাতায় বিসূচিকারোগে প্রাণত্যাগ করে, পুত্রের এই চিরবিদায় সংবাদ পাইয়া জননী বিধাতার বিধান দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। ৺হরিদাস বাবুর ছোট ভ্রাতার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল এবং হরিদাস বাবুর একটী পুত্রকে আমরা দেখিলাম। এই বাটীতে বিনোদের একটী ভগ্নিপতিসহ সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমরা শিয়ড়গ্রাম হইতে নিস্ক্রান্ত হইলাম। তিনি কিছুক্ষণ আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আসিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমরা জয়রামবাটী লক্ষ্য করিয়া ধানের মাঠ ভাঙ্গিয়া চলিতে লাগিলাম এবং প্রায় বেলা দশটায় মায়ের বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

[ভানুপিসির কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত]

আমরা যে বৈঠকখানায় কল্য রাত্রে আসিয়া বসিয়াছিলাম, তথায় একটী ছোট পাঠশালা মিলিয়াছে। মামাদের ছেলে মেয়েরা এবং পল্লির অপরাপর ছোট ছেলেরা তথায় গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতেছে। গুরুমহাশয় গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ। তিনি আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। আমরা একটু বিশ্রামের পর ভানুপিসির* সন্ধান লইলাম। তিনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন, বিশেষ কল্য রাত্রে আমরা মাকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছিল, জীবনের আশা ছিল না, ঠাকুরের কৃপায় এ যাত্রা জীবনরক্ষা পাইয়াছে, তাই তাঁহাকে দেখার জন্য আমরা একটী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে গেলাম। মায়ের বাটীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে রাস্তার ধারেই তাঁহার গৃহ। তিনি সে সময়ে বাটীতে ছিলেন না, অপরের নিকট শুনিলাম দ্রব্য কিনিতে দোকানে গিয়াছেন। আমরা ফিরিয়া আসিলাম ও স্নানের আয়োজন করিয়া লইয়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত তালপুকুরে আমরা স্নান করিতে গেলাম। গ্রামের মধ্যে এই পুকুরটীই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল; বিশেষ ইহা আমাদের একটী পরম তীর্থ। এই জল নিত্য মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ

* ভাল নাম—মানগরবিনী, জাতিতে সদেগাপ। ইঁহার মাতা, মায়ের পিতৃব্য ৺নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে ভিক্ষাপুত্র করিয়াছিলেন, তাই মায়ের পিসি। সবাই মানগরবিনীকে 'মানু' বলিয়া ডাকিত। ঠাকুর বলিয়াছিলেন 'ভানু'। সেই হইতে 'ভানুপিসি' বলিয়া সবাই ডাকে।

করে, ঠাকুরেরও শ্রীপাদপদ্ম কয়েকবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে। আমরা এই পূতজলে অবগাহন করিয়া গিয়া, ঠাকুর ও মায়ের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া, জলযোগ প্রসাদ ধারণ করিলাম। অতঃপর পুনরায় ভানুপিসির বাটীতে গেলাম।

এইবার, তাহার সহিত আমাদের দেখা হইল। আমাদের দেখিয়া যে কি আনন্দ তাহা বর্ণনা করিব কেমন করিয়া। এ নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব কেবল মাত্র নিঃস্বার্থ হৃদয়ই বুঝিতে সক্ষম। আমরা যাইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে বৃদ্ধা আমাদের পদধূলি লইতে ব্যতিব্যস্ত। কর কি, কর কি, করিয়া যখন আমরা সরিয়া দাড়াইলাম, তখন উদ্দেশ্যে মাটিতে প্রণাম করিতে লাগিলেন। গৃহ হইতে তিন খানি কম্বলাসন বাহির করিয়া আমাদের বসিতে দিলেন, আর বলিতে লাগিলেন 'আমি জগদ্ধাত্রী পূজার সময় মাকে তোমার আসবার জন্য পত্র দিতে বলেছিলেম। মাকে বলেছিলাম যে, মা, সবাই আসে যায়, কৈ সেই দাদা ত একবারও এলোনা।' তাতে মা বলেছিলেন, 'আসবে, আসবে, ঠাকুর আনলেই আসবে।' আহা, আজ তোমাদের দেখে আমার কত আনন্দ হচ্ছে যে ব্যারাম হয়েছিল, তাতে আর বাঁচবার আশা ছিলনা। ঘরে যাহা কিছু ছিল বেচে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলাম আর কতক জিনিস গুরুদেবকে দিয়া দিয়াছি। ঘরে কিছুই রাখিনি। মা আমার জন্য কাঁদতেন যে, 'পিসি মরে গেলে আমি কার সঙ্গে কথা কইব?' ভাগ্যিস্ বেঁচে ছিলাম, তাই তোমাদের সঙ্গে এইখানে দেখা হোলো। নয়নতারা আর জীবন কানাই* এসেছিল, তারা বল্লে যে, আমাদের জন্য ঠাকুর তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তুমি না থাকলে, কে আমাদের ঠাকুরের কথা শোনাবে?' আমরা বল্লাম 'ঠাকুর তোমার বাটীতে এসেছিলেন শুনিচি, কোন্‌খানে বসেছিলেন, বল?' তখন গৃহের দাওয়ার উত্তর পার্শ্ব নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থানটী দেখাইলেন। জামাই আসিয়াছে—সকলে আদর করে খাওয়াচ্চে, বাড়ী আনচে। তাই ভানুর মা জামাইকে জলখাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ঘন দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ জলখাবার দিয়া জামাইকে খাওয়াইয়াছিলেন। ঠাকুর এই দিন ভানুকে বলেছিলেন, 'স্বামী নাই, পুত্র নাই, ভালই

---

* ভানুর চক্ষে ছানি হইয়াছিল, ডাক্তার কাঞ্জিলাল অস্ত্র চিকিৎসা করাইয়া চক্ষের চসমা সংযোগ করিয়া দেন, তাই তাহার নাম 'নয়নতারা'। আর নির্ভয়ানন্দের সংসারের নাম কানাই—তাই 'জীবন কানাই'। এই নাম দুটী ভানুপিসি দিয়াছেন।

আছ, সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট নাই। দুটী দুটী খাবে আর দরজায় খিল দিয়ে 'ভজ মন গৌর নিতাই' বলে প্রাণ খুলে নাচবে। তাতে প্রাণে শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে। সংসারের কচকচিতে কি সুখ আছে? ছ্যা! ছ্যা!!' ভানুর বয়ঃক্রম তখন ১৮।১৯ বৎসর হইবে, এই কথাগুলি তাঁহার অন্তরে স্থান পাইল; দেবতার কৃপাকটাক্ষ ব্যর্থ হইল না—সেই হইতে ভানু 'ভজ মন গৌর নিতাই' বলিয়া সময়ে সময়ে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া নাচিতেন। এখন সেই ঘরে ঠাকুরের একখানি বাঁধান ছবি রাখিয়াছেন, এখন প্রায় ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধা—সেই ছবিতে গৌরনিতাই একাধারে দর্শন ও উপলব্ধি করিয়া হাততালি দিয়া সময়ে সময়ে নাচেন। আমাদের বলেন 'এখনই না জামাই, তা'আমার লজ্জা করে না, আগে আগে লজ্জা বোধ হোত। (পাঠক! ছবিতে লজ্জা বোধ—কথাটা একটু ভাবিবার বিষয়। ছবিতে কতটা স্বরূপত্ব ও প্রত্যক্ষ বোধ, ভাবিয়া দেখুন!)

ঠাকুর শ্বশুরালয়ে খুব কমই আসিয়াছেন। যখন আসিতেন, তখন পাড়ার মেয়েছেলেরা তাঁহাকে দেখার জন্য মুখুয্যে বাটী পূর্ণ করিয়া বসিত। একবার ঠাকুরসহ হৃদয় আসিয়া ২।৩ দিন এখানে ছিলেন। ঠাকুরের বালক স্বভাব, অন্তরে কামগন্ধ নাই। সকলের সহিতই সমভাব। শাশুড়ীর সহিতও রহস্য করিতেন। হৃদয় বলিতেন "মামা! ওরূপ করিতে নাই, লোকে নিন্দা করিবে।" তাঁহার বালক ভাব, হৃদয়ের কথা কাণে স্থান পাইত না। এই সময়ে একদিন অপরাহ্নে পাড়ার মেয়েরা কেউ ফুলের মালা, কেউ খাবার ইত্যাদি এনে ঠাকুরকে দিতেছিল, ভানুর তাহা দেখিয়া কিছু দিবার ইচ্ছা হইল। ভানু দরিদ্র, তাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি পান খান তবে ঝাঁ করে বাটী থেকে তৈয়ার করে আনি। অমনি ঠাকুর ভানুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'হাঁগা তুমি কিছু দেবে?—তা দুটো পান আনো না।' এই কথা শুনিয়া ভানু আনন্দে বাটী ছুটিয়া গিয়া পান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে প্রাণে সাধ উঠিতে লাগিল যে, পান দুটি যদি হাতে তুলে খাইয়ে দিতে পারি তবে মনে বড়ই আনন্দ হয়। ভানু হাতের মধ্যে পান লুকাইয়া আনিয়া শুনিলেন যে, জামাই হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া এই মাত্র শিয়ড়ে যাত্রা করিয়াছেন। তাহার প্রাণে দারুণ বাজিল। তখনই সেই পান হস্তে দুই এক পা করিয়া সরিয়া পড়িয়া মাঠে গিয়া শিয়ড়ের পথে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ঠাকুর ও হৃদয় শিয়ড়ের পথে যাইতেছেন, কিছুদূর গিয়া ঠাকুর

হৃদয়কে বলিতেছেন—'হৃদু দাঁড়া দাঁড়া—আমি চলতে পারছিনা, কে যেন পেছন দিকে টানচে।'

হৃদয়। এই আবার ঢং—কে আবার আসবে মামা? মাঠের মধ্যে—

রামকৃষ্ণ। আচ্ছা—তুই একবার পিছন দিকে বেশ করে ঠাউরে দেখ দেখি!

'আচ্ছা ঠাউরে দেখচি' বলিয়া হৃদয় পশ্চাৎ দিকে লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার অনুমান হইল, কে যেন একজন দৌড়ে দৌড়ে আসচে বটে। তখন বলিলেন 'হাঁ মামা, কে যেন একজন দৌড়ে আসচে বটে, তা এক কাজ করো, রৌদ্রে না দাঁড়িয়ে, ঐ গাছ তলায় দাঁড়াও।'

তখন দুজনে একটী বৃক্ষমূলে যাইয়া দাঁড়াইলেন। একটু পরেই ভানু পান হস্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে যাইয়া তথায় উপস্থিত। ঠাকুর বল্লেন 'কি গো, তুমি এসেছ?'

ভানু। আজ্ঞে, সেই পান এনেচি।

রামকৃষ্ণ। বল কি? পান নিয়ে এই পর্য্যন্ত ছুটে এসেছ?

ভানু নির্ব্বাক—মনে মনে সাধ আছে ঠাকুরকে খাইয়ে দেবেন, কিন্তু হৃদয় আছেন বলিয়া লজ্জা হইতেছে। তাই ঠাকুর বলচেন—'যদি এনেচো, ত খাইয়ে দাও।'

ভানুর চক্ষে তখন জল আসিল—তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখে পান দুইটী দিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর খাইয়া তাহাকে একটু পান প্রসাদ দিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বলিলেন 'হাঁগা, তুমি যে এমনি করে এখানে এলে, তা যদি কেউ জানতে পারে? তোমার গৌর দাদা কিছু বলবে না?*

ভানু। আমারও এখন ঐ কথা মনে হচ্ছে, তা ভাবচি যে আঁচলে তিনটি পয়সা আছে, সাম্‌নের কুমোরবাড়ী থেকে একটা হাঁড়ী কিনে নিয়ে যাই। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গিয়েছিলি? তখন ঐ হাঁড়ী দেখাবো।

রামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বেশ, বেশ, ঐ বুদ্ধিই ভাল। এইবার হৃদয়কে বলিলেন, চল হৃদু, এইবার চল্।

হৃদয় অবাক হইয়া ব্যাপারটা দেখিতে ছিলেন, ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিলেন—'তবে চলো'।

ভানু এইবার দুইজনকেই গললগ্ন হইয়া প্রণাম করিলেন।

১* ভানুর বিধবা কাল, পাছে লোকে তাহার কোনও দুর্নাম রটায় তাই তাহাকে সাবধান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়সহ চলিতে লাগিলেন। ভানু একটু পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া এক কুমারবাড়ী হইতে একটী হাঁড়ী কিনিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসি"

ধন্য ভানু! ধন্য তোমার পান খাওয়াইবার সাধ!

ঠাকুর যখনই জয়রামবাটী আসিতেন, ভানু তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষে প্রায়ই মায়ের বাটীতে যাইতেন। মানগরবিনীকে (ভানু) দেখিলেই ঠাকুর তাহার মুখের কাছে তুড়ি দিয়া গান ধরিতেন। ঠাকুর যেরূপে, যেভাবে গাহিতেন, ভানু সেই সমস্ত হাবভাব দেখাইয়া আমাদিগকে গানটী শুনাইলেন। বলিতে বলিতে বৃদ্ধার অন্তরে আনন্দ উছলিতে লাগিল। গানটী এই—

আদরিণী নাম ঘুচেছে—
গরবিনী নাম ঘুচেছে—
হরি বিনে বৃন্দাবনে দিনে অন্ধকার হয়েছে।
ফলফুলে কুঞ্জকানন, ছিল যেন ইন্দ্রভবন,
সে সুখ সম্পদ এখন দীননাথের সঙ্গে গেছে।
(আমার কালাচাঁদের সঙ্গে গেছে)
পাতাচাপা কপাল কুব্জার সুখ সায়রে ভেসে গেছে।
পাথরচাপা কপাল রাধার দুখ সায়রে ডুবে আছে।

ঠাকুর আর একবার জয়রামবাটী গিয়াছেন। পাড়ার মেয়েরা জামাইকে ঘেরিয়া বসিয়াছে। সবাই জামাইকে গান গাহিবার জন্য ধরিয়াছে। তখন ঠাকুর যে গানটী গাহিয়াছিলেন, ভানু আমাদিগকে সেইটী শুনাইলেন। পল্লিগ্রামের সরল প্রকৃতির মেয়েরা এই গানটী শুনিয়া খুবই আনন্দ পাইয়াছিলেন। গানটী একটা বিড়াল সম্বন্ধে। গানটী এই—

কাল বেরাল কে পুষেছে পাড়াতে।
তোরা ধরে দেগো ললিতে।
কোন্ ভাতার পুত্‌খাগি, ও সে বেরাল সোহাগী,
ভাঁড়ে রাখতে দেয়না ঘি,
ও সে ভাঁড় ভেঙ্গেছে, দৈ খেয়েছে,
আবার মুখ মুছেছে কাঁথাতে॥
আমি সেই বেরালকে ধরতে পেলে,
বেঁধে রাখবো বেরাল-পাটেতে॥

এই গান শুনিয়া আমরা খুব হাসিতে লাগিলাম।

তাহার এইবার আমাদিগকে কিছু খাওয়াইবার সাধ করিলেন। আমরা পুনরায় আসিয়া খাইব বলিয়া, তাঁহাকে তখন নিরস্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। বৃদ্ধা আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। পথে দাঁড়াইয়া আবার একটু কথা বলে 'আবার এসো' 'আবার এসো' বলিতে লাগিলেন। আমরাও 'আসিব' বলিয়া মায়ের বাটী আসিলাম।

বেলা প্রায় একটার সময় আমরা প্রসাদ পাইলাম। তৎপরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া আমরা কামারপুকুর যাইবার উদ্দেশ্য মায়ের নিকট জানাইলাম এবং তাঁহার শ্রীচরণধূলি মস্তকে লইয়া ঠাকুরের জন্মভূমি দর্শনে যাত্রা করিলাম। কামারপুকুর এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ। বেলা তখন ৩॥০টা। বরদা মামা আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর চলিয়া আমাদিগকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আমরা ধানের মাঠের মধ্যে পড়িয়া আলে আলে চলিতে লাগিলাম। মামা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

বিবেক ও বৈরাগ্য।

এই যে সম্মুখে বিশাল বিশ্বসংসার রাজ্য, আমরা কর্ম্মবশে এ রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু ভাই, আমরা এ রাজ্যের লোক নহি, এ রাজ্যের প্রজা নহি। আমরা যে দেশের অধিবাসী, যে রাজ্যের প্রজা, সে দেশে হিংসা দ্বেষ নাই, ঘৃণা ঈর্ষা নাই, সে রাজ্যে স্বার্থপর ভালবাসা, কপট প্রেম নাই, সে রাজ্যে রোগ শোক জন্ম মৃত্যু নাই, হাহাকার আর্ত্তনাদ নাই, সে রাজ্যে উত্থান পতন নাই, পাপ পুণ্য নাই, ধর্ম্ম অধর্ম্ম নাই, শীত উষ্ণ নাই, জয় পরাজয় নাই, লাভ অলাভ নাই; সে রাজ্যে ইন্দ্রিয়বশ্যতা নাই, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নাই, বন্ধন বিমুক্তিও নাই, সে রাজ্যে বিষয়মত্ততা নাই, বিষয়-বৈরাগ্যও নাই, প্রবৃত্তি নাই, নিবৃত্তিও নাই। এ রাজ্যের প্রজার সহিত সে রাজ্যের প্রজার বিন্দুমাত্র সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। আমরা কর্ম্মবশে বুদ্ধিদোষে এ রাজ্যে আসিয়া, এ রাজ্যের লোকের মত হইয়া পড়িয়াছি, এ রাজ্যের অপ্রেম ভাষা শিক্ষা করিয়াছি, হিংসা দ্বেষ স্বার্থপর হইয়াছি। এ রাজ্যের লোকের মত অন্য রাজ্যবাসী আমরা, আমাদিগকেও এ রাজ্যে আসিয়া গৃহ সংসার পাতিতে

* কুমারথালি দরিদ্র বান্ধব লাইব্রেরীর চতুর্থ বার্ষিক সভাধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।

হইয়াছে, আমাদেরও সংসার-বন্ধন ঘটিয়াছে, বিষয়মদ-মত্ততা জন্মিয়াছে। আজ এ প্রবাসে আসিয়া আমাদের স্ত্রীপুত্রে, ধন সম্পত্তিতে, যশোমানে এতই আসক্তি, এতই মত্ততা, এতই অনুরাগ জন্মিয়াছে যে, এখন আর আমাদের দেশের কথা মনে নাই, এখন আর আমাদের দেশের পরমাত্মীয়ের কথা হৃদয়ে জাগেনা, এখন আর আমাদের একবারও স্বদেশে যাইতে ইচ্ছা হয় না। এখানে আসিয়া, এখানকার যাহাদের সহিত মিত্রতা করিয়াছি, যাহাদের সহিত কুটুম্বিতা পাতিয়াছি, যাহাদের সহিত আত্মীয়তা-পাশে বদ্ধ হইয়াছি, তাহাদের স্নেহে, তাহাদের মায়ায় আজ এতই মোহিত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাদের কপট ভালবাসায়, স্বার্থপর প্রণয়ে আমরা আজ এতই বিমুগ্ধ, এতই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি যে কেহ যদি আমাদিগকে দয়া করিয়া আপনরাজ্যে, আপন দেশে, আপন ঘরে লইয়া যাইতে চাহে, আপনার পরম প্রিয়জন যিনি, পরমাত্মীয় শ্রেষ্ঠ বন্ধু যিনি, তাঁহার সহিত মিলিত করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহাতে আমরা প্রাণান্তেও স্বীকৃত হইতে চাহিনা। অহো কি মোহ! কি স্বদেশ বিদ্বেষ! অহো পরমাত্মীয়, পরমবন্ধুর প্রতি কি বিষম বিরাগ! কই, এমন ব্যক্তি, এমন ক্ষমতাযুক্ত, এমন সামর্থবান লোক ত বড় বেশী দেখিতে পাই না, যে লোক এখানে আসিয়া, এই সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, সংসারমায়ামোহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। কই, এমন জ্ঞানী, এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ত বড় বেশী দেখি না, যে ব্যক্তি এখানে আসিয়া, এই ভবের বাজারে উপনীত হইয়া সংসার-সুখ ভোগে মত্ত না হইয়াছেন, অমৃত জ্ঞানে গরল পান না করিয়াছেন, যিনি ষোড়শী যুবতীর রূপলাবণ্যে, ধনৈশ্বর্য্য মণিকাঞ্চনে প্রলুব্ধ না হইয়াছেন—

"তুলসী ইয়ে আয়্ কে জগ্,
কোন্ ভয়ো সোম্ রত্।
এক কাঞ্চন্ ও কুচন্ কো,
কিনন্ পসরা হত্॥"

কই, এমন লোক ত বড় বেশী দেখিতে পাইনা, যিনি এ সংসার প্রবাসে আসিয়া, সংসারের মায়া খেলায় উন্মত্ত না হইয়া দেশের কথা, দেশের পরমাত্মীয়ের কথা, দেশের আপন দরদীর স্মৃতি বিস্মৃত না হইয়াছেন।

কামিনীকাঞ্চন ভক্ত, সংসার-ক্রীড়াসক্ত, মোহমত্ত আমরা বেশ্যাসক্ত প্রবাসী যুবকের ন্যায় দেশের খবর, দেশের আত্মীয়জনের সংবাদ পর্য্যন্ত

বাধে না। আমরা স্বদেশের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, বিদেশকেই স্বদেশ বলিয়া বুঝিয়াছি। আমরা এই বিদেশই, এই প্রবাসই আমাদের চিরপ্রিয় বাসভূমি মনে করিয়াছি। এ দেশের সঙ্গী সাথীকে, এ দেশের বন্ধুবান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইবার কথা হইলেই আমাদের মহাতঙ্ক, মহাভয় উপস্থিত হয়। আমাদের সকলেরই এইরূপ অবস্থা, এইরূপ দশা ঘটিয়াছে কি? না, সকলের অদৃষ্ট ঘটে নাই। আমাদের ভিতর যাহারা ভাগ্যবান, যাহারা বুদ্ধিমান, বিবেকী, তাহারা ভালরূপে জানে, এ ভবপ্রবাসে চিরদিন থাকিতে আসি নাই তাহারা মনে বেশ জানে, আমার বলিতে এ ভবসংসারে ভব-পতি ভগবান ব্যতীত অন্য কেহই নাই, তাহারা ভালরূপে জানে, আজ হউক, কাল হউক, পরশ্ব হউক, একদিন না একদিন আমাদের সকলকেই এ প্রবাস, এ পর নিবাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহারা জানে, এখানকার সুখ, এখানকার আনন্দ অতি অকিঞ্চিৎকর, অতি সামান্য, দু'দিনের জন্য। তাহারা জানে, এ সংসারে সুখের পরিণাম দারুণ-দুঃখ, আনন্দের পরিণাম ঘোর নিরানন্দ, উত্তেজনার পরিণাম দারুণ অবসাদ, তাহারা জানে, সম্পদের পর বিপদ, আশার পর নিরাশা, আলোকের পর অন্ধকার, দিবসের পর রাত্রি, পূর্ণিমার পর অমানিশা চক্রবৎ উপস্থিত হইতেছে, বিবর্ত্তের পর পরিবর্ত্তন, উন্মজ্জনের পর নিমজ্জন ক্রমান্বয় ঘটিতেছে। সংসারবন্ধন বিযুক্ত মায়া মোহমুক্ত যাহারা, তাহারা জানে,—যে সংসারে শান্তির পরিণাম ঘোর অশান্তি, সে সংসারে অনন্ত শান্তি, চির-আনন্দ, অপরিচ্ছিন্ন সুখ কোথায় মিলিবে? সংসারের এ সমস্ত গূঢ় রহস্য জানে বলিয়াই তাহারা এ সংসার মোহে বিমুগ্ধ হয় না, এ সংসারের ধন জন মায়ায় অভিভূত হয় না, কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভনে প্রলোভিত হয়না। তাহারাই সংসারের সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে আপন দেশে আপন রাজ্যে সেই চিরশান্তিধামে পৌঁছিতে সক্ষম হয়। আর, আমাদের মত সংসার মায়া-মোহাচ্ছন্ন কামিনী-কাঞ্চনের ক্রীতদাস যাহারা, আমাদের মত অজ্ঞানান্ধ বিবেকহীন ভ্রান্ত যাহারা, যাহারা অসৎ বস্তুকে সৎ বস্তু জ্ঞান করিয়াছে, যাহারা সহস্র আশ পাশে বদ্ধ, তাহাদের ত কোনদিনই, সে দেশে, সে আনন্দরাজ্যে, সেই অনন্তশান্তিধামে যাইবার একান্ত ইচ্ছা হয় না। পুত্রের মরণ হইলে, পত্নীর বিয়োগ হইলে, বিষয়াদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, কখন ক্ষণিকের জন্য সে দেশে যাইতে, সে রাজ্যে গমন করিতে সাধ যাইলেও, তাহারা ত যাইতে সক্ষম হয় না, তাহাদের ও সে দিশ, স্বদেশ

হইলেও, যাইবার অধিকার নাই। সে অধিকার ত তাহারা নিজেরাই হারাইয়া বসিয়াছে, তাহারা নিজেরাই, ভবের মিছা খেলা উন্মত্তবৎ খেলিতে খেলিতে, স্বদেশে স্বধামে যাইবার পাথেয় স্বরূপ বিবেকরত্ন বৈরাগ্যধন সংসারের কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা এই স্ত্রী পুত্র ধনবিত্তরপূর্ণ সংসারই আমার বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের প্রাণে বাসনার উপর বাসনা জাগিতেছে, তাহারা একপুত্র হারাইতেছে, আর একপুত্রের কামনা করিতেছে, তাহারা এক বিষয় হারাইতেছে, আর এক বিষয়ের প্রাপ্তির আশা করিতেছে, এক স্ত্রী হারাইতেছে, আর এক স্ত্রী লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইতেছে। বিষয় বিমূঢ় যাহারা, তাহারা লক্ষ লক্ষ রজত খণ্ড পাইলে, আর লক্ষ লক্ষ রজত খণ্ডের প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র হইতেছে, শত শত নগর গ্রাম করায়ত্ত হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রপুরী লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। দিবানিশি অবিশ্রান্ত এই কাম্যজগৎ সংসারে যতই তাহারা কাম্যবস্তু উপভোগ করিতেছে, ততই তাহাদের কামনা, ততই তাহাদের আশা, ততই তাহাদের বাসনা নিরন্তর অবিরাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। দারাপুত্রে যাহাদের আসক্তি, ধনৈশ্বর্য্যে যাহাদের অনুরক্তি, বিষয়ভোগ, সংসার-সুখ ভোগে যাহাদের প্রাণগত একান্ত কামনা, তাহাদের কামনা কিসে কমিবে? তাহাদের বাসনা নিবৃত্তি কিসে হইবে?

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবৰ্দ্ধতে॥"

পুত্র পুত্র কামনা লইয়া, অনিত্য অনন্ত ভোগলালসা লইয়া, তাহারা কেমন করিয়া সেই নিত্যধামে সেই ভোগাতীত, মায়াতীত রাজ্যে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে? যাহাতে যাহার অনুরাগ, যাহাতে যাহার বাসনা, যাহাতে যাহার কামনা, জীবন শেষেও সে তাহাই লাভ করিয়া থাকে, সেই বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই সংসারাসক্ত বিষয়ানুরক্ত অবিবেকী মানব যাহারা, তাহারা ভোগ-দেহ ধারণ করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বারম্বার, এ ভোগরাজ্যে এ ভব-সংসারেই আসিয়া থাকে, এই ভোগ্যবস্তু কামিনী-কাঞ্চনই লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ভাগ্যগুণে, জন্ম-জন্মান্তর সাধনফলে, যাহার হৃদয়ে বিষয় বিদ্বেষ ভাব জাগিয়াছে, সংসার বিরাগ জন্মিয়াছে; সে রাজ্যে যাইবার জন্য, সে দেশে পৌঁছিবার জন্য যাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; সেই ভগবচ্চরণ-শান্তিধামে আশ্রয় লইবার জন্য যাহার মন প্রাণ আকুল হইয়া ভগব-

চরণ-ভজনন্বিরত হইয়াছে, সেই,—সেই ভক্তই শুধু সেই দেশে, সেই শান্তি-রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী। ভগবান সেই ভক্তকেই, যাহা প্রাপ্ত হইলে, যে ধাম লাভ করিতে পারিলে, কোন কামনা, কোন বাসনা, কোন প্রার্থনা, কোন ভোগলালসা জীবের থাকেনা, নিজ চরণরূপ সেই অনন্ত আনন্দ-ধামে অনন্তকালের জন্য আশ্রয় প্রদান করেন—

"সত্যং দিশত্যর্থিত মর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎপুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥"

ভাই সাধক! ভাই স্বদেশযাত্রী। সে দেশে যাইতে হইলে, এ দেশের বসন ভূষণ, এ দেশের আচার ব্যবহার, এ দেশের লজ্জা ভয়, এ দেশের ভাব ভাষা ত্যাগ করিতে হইবে, সেই ভগবচ্চরণ শান্তি রাজ্যে পৌছিতে হইলে, এ দেশের প্রতি মায়া মমতা, প্রীতি ভালবাসা, আসক্তি অনুরক্তি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে; সে রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিতে হইলে, এখানকার ধনসম্পত্তি, বিষয়বিভব কিছুই, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, দারাপুত্র, আত্মীয় স্বজন, কাহাকেও সাধের সাথী করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। যদি এখানকার এ সমস্ত লইয়া, যদি এখানকার সামান্য কিছু সঙ্গে লইয়া, সে দেশ, সে মায়াতীত রাজ্যাভিমুখে যাত্রা কর, তবে সে রাজ্যের প্রহরী, সে রাজ্যের পাহারাওয়ালা তোমাকে সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না। তাই বলি, সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, সেই পরম সুহৃৎ, সেই পরমাত্মীয় ভগবানের নিকট পৌছিতে হইলে যেমন একাকী আসিয়াছ তেমনই একাকী মহাসাধনপথে যাত্রা করিতে হইবে। শুধু শুদ্ধ-বিবেককে সঙ্গে লইয়া, সংসারবিরাগী হইয়া একাগ্রচিত্তে যাত্রা করিলে সে রাজ্যে পৌছিতে সক্ষম হইবে। এ দেশে কোন বিজন জনসমাগমশূন্য পথ বহিয়া যাইতে হইলে, সঙ্গে যদি কামিনীকাঞ্চন থাকে, তাহা যেমন ভয়ের কথা, আশঙ্কার কথা, বিপদের কথা, হয়ত তোমার গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে না, গন্তব্য দেশে পৌছিতে হইবে না, পথেই তোমার মহা বিপদ হইতে পারে, পথেই তোমাকে জীবন পর্য্যন্ত দিতে হইতে পারে; পথেই দস্যুগণ, চৌরগণ, বদমাসগণ হয় ত কামিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, কাঞ্চনের লোভে প্রলুব্ধ হইয়া তোমার জীবন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে। তেমনই সে গভীর বিজন সাধন-পথে যাত্রা করিলে কামিনী-কাঞ্চন সঙ্গে থাকা দূরে

থাকুক, কামিনী-কাঞ্চন ভাবও যদি তোমার মনের সহিত বিজড়িত থাকে, তবেই সে পথে ভয়ের কথা, কষ্টের কথা, মহাবিপদপাতের কথা আছে; তবেই তোমার সে দেশে যাওয়া দূরে থাকুক, তুমি কিয়ৎ পথও অগ্রসর হইতে দিবে না, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি দস্যুগণ চৌরগণ বদমাসগণের চরণপ্রান্তে তোমাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, আজীবন তোমাকে মোহ কামের শ্রীচরণের ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে হইবে। তাই বলি, সেই দেশ মুখে, সেই রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে, দস্যুদিগের হস্ত হইতে হৃদয় মনকে, প্রাণ জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য শম দম বিবেক বৈরাগ্যরূপ ক্ষুরধার শাণিত অস্ত্র সকল পথের সম্বলস্বরূপ সঙ্গে রাখিতে হইবে। এ বিশ্ব সংসারে যিনি বিভব সম্পত্তি দারাপুত্র পরিত্যাগ করিয়া, বিবেক বৈরাগ্যাদি অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া মহাসাধন পথে যাত্রা করেন, তিনিই সে মহারাজ্যে, সে অমৃতরাজ্যে, সে কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠধামে পৌঁছিতে সমর্থ হ'ন।

যদি ভাই! সেই চিরশান্তিধাম লাভ করিতে চাও, সেই চিরমঙ্গল, অমঙ্গলহারী আত্মারাম ভগবানের সর্বদুঃখ নিবারণ জন্মমরণহরণ, চিরশান্তি নিকেতন পরম পাদাম্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, পিতা মাতা দারাপুত্র পরিবৃত এই সুখদুঃখময়, মায়ামোহময় সংসার হইতে সদা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে, সদা চঞ্চল মনকে সরাইয়া লইয়া, ভগবানের সেই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ চারু চরণ-সরোজে সংলগ্ন করিয়া দাও। ভাই, প্রকৃতই যাহারা সংসার হইতে মনকে উঠাইয়া লইতে পারিয়াছে, যাহারা মান অপমান, মোহ অভিমান, মন হইতে, হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহারা এ সংসারে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ধনৈশ্বর্য্য প্রভৃতির সঙ্গদোষ হইতে মনকে, চিত্তকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, সংসারের ভোগাকাঙ্ক্ষা, ভোগবাসনা-মেঘ যাহাদের হৃদয়াকাশ হইতে অপসারিত হইয়াছে, যাহারা সংসারের সুখ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে, যাহারা অমূঢ়, যাহারা জ্ঞানী, যাহারা মোহবিবর্জ্জিত বিবেকী, তাহারাই কেবল সেই অব্যয় সেই অক্ষয় পরম ব্রহ্ম-পদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

"নির্ম্মাণমোহা জিত সঙ্গদোষা,
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্ত কামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ
র্গচ্ছন্ত মূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ॥

সেই অব্যয়পদ, সেই পরম শান্তিধাম, যে ধামের কথা ভগবান ভগবদ্ভক্ত মহাবীর অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন —

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো, ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে, তদ্ধাম পরমং মম॥"

যে ধাম, চন্দ্র, সূর্য্য, হুতাসন উদ্ভাসিত, প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয় না, যে ধামে একবার পৌঁছিতে পারিলে, আর এ ভব সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই সর্ব্বাবভাসন, সেই 'প্রভুনোদভাসন' সেই পরম অক্ষয়ধাম লাভ করিতে সাধ হইলে, ভাই, এ সংসারের সকল সাধ জলাঞ্জলি দিয়া, মহাসাধনাসনে উপবিষ্ট হইতে হয়। সাধনে উপবিষ্ট হইলে মুখের কথায় হয় না। যাহার মন সংযম, দেহ সংযম, বাক্য সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম কিছু নাই, জ্ঞান সাধনই বল, আর যোগ সাধনই বল কিংবা ধর্ম্ম সাধনই বল, আর ভক্তি সাধনই বল, তাহার কোন সাধনই হইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস, যে সংসারের ক্রীত কিঙ্কর, তাহার মন বল, প্রাণ বল, ধর্ম্ম বল, সত্য বল, হ্রী বল, শ্রী বল, তেজ বল, স্মৃতি বল, ধৃতি বল, মতি বল, যাহা বল, সকলই সে হারাইয়া বসিয়াছে, সকল বলই তার নষ্ট প্রায় হইয়াছে।

"ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ, আত্মা ধর্ম্মো ধৃতির্ম্মতি।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং, সর্ব্বে নশ্যন্তি জন্মনা॥"

যদি ভাই। এই সমস্ত হারাইয়া বসিলে, তবে কি লইয়া কি সম্বল বলে বলীয়ান হইয়া, সাধনপথে আসিয়া দাঁড়াইবে? যদি ভাই। এ সমস্ত পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, সে পথের, সেই মহাসাধন পথের পথিক হইতে চাহ, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে, যে মন তোমার আজ তোমার নাই, যে মন আজ তোমার প্রভু, আজ যে মনের দাস তুমি, সেই দুর্জ্জয় মনকে ক্রমে অভ্যাস যোগে বিবেক-বৈরাগ্যের দ্বারা জয় করিতে হইবে, সেই বিষয়চপল দুর্নিগ্রহ মনের প্রভু হইতে হইবে। মনোজয়ের উৎকৃষ্ট উপায়, চিত্ত-দমনের প্রকৃষ্ট পন্থা—মহাবীর মহাভক্ত অর্জ্জুনকে ভক্তমনোমোহন চিত্তহরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপই বলিয়াছেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন নিগৃহ্যতে॥

সত্য সত্যই বিষয়বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মনের দমন উপায় কেবলমাত্র জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্য। এইরূপ ভাবে জ্ঞানাভ্যাস করিতে হইবে যে, এ সংসার অসার, অনিত্য স্বপ্নবৎ অলীক। সর্ব্বদা মনে চিন্তা করিতে হইবে,—

"সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ।
স্বপ্নে তু সত্যবদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা॥"

মনে প্রাণে ভাবিয়া দেখিতে হইবে,—আজ যে বিপুলবিভব সম্পত্তির অধিকারী, আজ যে রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, আজ যে ধনগর্ব্বে অর্থ গরিমায় বক্ষস্থল স্ফীত করিয়া অন্যান্য লোককে হেয়জ্ঞান করিতেছে, ধরাকে সরা-জ্ঞান করিতেছে, কাল আবার সে বিভব সম্পত্তি ধনৈশ্বর্য্য সমস্ত হারাইয়া উঁচু মাথা নিচু করিয়া, পথের কাঙ্গাল হইয়া, বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেছে, আজ যাহার যশোগুণ কীর্ত্তন, কীর্ত্তিগান যাহাদের কণ্ঠে গীত হইতেছে, কাল আবার তাহারই অকীর্ত্তি অযশ অখ্যাতি তাহাদেরই কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে, আজ যে নবকুমার, নব প্রসূত পুত্ররত্ন লাভ করিয়া আনন্দে বিহ্বল, পুলকে পুলকিত হইয়া কতই সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে, কতই সুখের ছবি আঁকিতেছে, কতই আশার আলোকময়ী মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছে, কাল আবার সেই—সে পুত্ররত্ন, নবকুমার জন্মের মত হারা হইয়া মর্ম্মভেদী ভীষণ হাহাকারে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে, দু'নয়নের অবিরল অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে, আজ যে পতিগতপ্রাণা সতী সাধ্বী প্রণয়িনীর অঙ্কে শায়িত হইয়া কত সুখ, কত শান্তি, কত অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে, কাল আবার সেই,—প্রিয়তমা পত্নীর মৃতশরীর ক্রোড়ে করিয়া দুঃসহ ক্লেশ, দুঃসহ দুঃখ, দারুণ অশান্তি, ঘোর নিরানন্দ ভোগ করিতেছে। আর—আর ভাবিয়া দেখ,—তুমি, আমি? তুমি আমিও, আজ এই আছি, কাল আবার এই সংসার হইতে কোথায় সরিয়া পড়িব, তাহার স্থিরতা নাই। এই যে সোণার শরীর, এই যে চন্দনানুলেপিত সুসজ্জিত পরিষ্কৃত দেহ, ইহা একদিন মহাশ্মশানক্ষেত্রে, চিতানলে কোথায় ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এ সংসারের সকলই অসৎ, সকলই অসত্য, সকলই অনিত্য। এ দেহ অনিত্য, পত্নী অনিত্য, পুত্র অনিত্য, যশঃ অনিত্য, মান অনিত্য, ধন অনিত্য, সৌন্দর্য্য অনিত্য, ঐশ্বর্য্য অনিত্য, বীর্য্য অনিত্য, শৌর্য্য অনিত্য, সূর্য্য অনিত্য, চন্দ্র অনিত্য, বিহঙ্গ ভৃঙ্গ অনিত্য, কুরঙ্গ মাতঙ্গ অনিত্য, তরুলতা গুল্ম বনস্পতি অনিত্য! অনিত্য—অনিত্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ বস্তু হইতে অণু পরমাণু পর্য্যন্ত সমস্তই। সমস্তই অনিত্য, সকলই অসত্য, ভাবিতে ভাবিতে নিত্যসত্য সনাতন বস্তুর সন্ধান আপনিই মিলিয়া যাইবে। আপনি হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইবে। বৈরাগ্যের উদয় হইলে আপনিই মন, আপনিই চিত্ত, আপনিই হৃদয় বাসনা-

বিরহিত আশাশূন্য কামনাবিবর্জ্জিত হইয়া পড়িবে। যে মন সংসারের ধনজন পরিজন বিষয়বিভবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সংসারচরণে উৎসর্গীকৃত অপূর্ণ মন সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

"বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতা মেতি, মনোনাশা বশানুগং।
আশয়ারিক্ততামেতি শরদীব সরোঽমলং॥"

সংসারদুঃখানলবিদগ্ধ, সংসার সুখে অতৃপ্ত অপূর্ণ মন, বৈরাগ্যের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া ভগবৎ কেন্দ্রীভূত হইয়া সেই পূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড-জীবন শ্রীহরির ভক্ত, ভুবনহৃদয় রাগরঞ্জিত নূপুরসিঞ্জিত চারু-চরণাম্বুজে সর্ব্বদা বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে। (ক্রমশঃ) শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সংবাদ।

বিগত ২৯শে পৌষ, বুধবার, দক্ষিণেশ্বরে কতকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মকরোৎসব করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা বেলুড়মঠে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ৪ঠা মাঘ রবিবার স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে বিস্তর কাঙ্গালী ভোজন হইয়াছিল।

১৩ই মাঘ, সরস্বতী পূজার দিন কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে, এবং বেলিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ-কুটীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব হইয়াছিল। ঐ দিবস মজিলপুর নিবাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের ধর্ণধাব কুটীরে রামকৃষ্ণ-সারস্বত সম্মিলন হয়। তদুপলক্ষে হারাণবাবু-রচিত বাণীবন্দনা গীতটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিলাম।

২৫শে মাঘ, রবিবার, শালিখায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়াছিল। অনেক ভক্ত সমবেত হইয়া ঠাকুরের নামে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। বিস্তর কাঙ্গালী ভোজন করান হইয়াছিল।

৯ই ফাল্গুন, রবিবার, শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা ও তৎপর দিবস ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজভোগ সম্পন্ন হইয়াছে। অনেক সেবক সমবেত হইয়াছিলেন। ১০ই ফাল্গুন, বেলুড়মঠে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা ও ১৬ই ফাল্গুন, রবিবার, সাধারণ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবদিনে মঠে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। এই দিবস স্বামী যোগেশ্বরানন্দের তত্ত্বাবধারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ, আলসুর, বাঙ্গালোরে মহা-সমারোহে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২২শে ফাল্গুন, শনিবার, যোগোদ্যানে ঠাকুরের দোলোৎসব সম্পন্ন হই-

যাছে। ঐ দিবস যশোহরের চেঙ্গুটীয়া ধর্ম্মাশ্রমে সেবক সমিতি কর্ত্তৃক ঠাকুরের জন্মোপলক্ষে উৎসব হইয়াছিল।

আগামী ২৯শে ফাল্গুন, শনিবার, ঠাকুরের জন্মভূমি শ্রীধাম কামারপুকুরে তাঁহার জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে। ভক্তগণের যোগদান বিনীত প্রার্থনা।

বাণী-বন্দনা।

(ইমন—চৌতাল)

নমামি মাগো ভারতি।

হৃদয়ের ভাতি, প্রেম ভক্তি প্রীতি,

দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান দেবত্বের জ্যোতি,

সকলি তোমাতে, দেবী সরস্বতী,

লহ মা অর্ঘ্য, আরতি।

বিশ্ববাসী মাগো, করে তোমা পূজা,

জাতি-বর্ণ ভেদ নাই রাজা প্রজা,

মুদিত নয়নে, কেহ গো বা ধ্যানে,

হেরে অপরূপ অলৌকিক জ্যোতিঃ॥

কমলাসনা, শ্রীকরে বীণা,

বাজিছে কি ভাব, জানে সেই জনা,

হ'য়েছে যাহার সফল সাধনা,

আপনায় আছে আপনি মাতি॥

রামকৃষ্ণ-নামে ডাকি মা-জননি।

হও মা সদয়া, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী,

হৃদয়ে বিরাজ, সতী-কুল-রাণী,

অরুণ উদয়ে পোহাইবে রাতি॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্।

ঘন-চেতনমক্রিয়মাদিমজং

চির-নিশ্চল নিষ্কল-নির্ব্বিকৃতং।

সুখ-সত্ত্ব-বিশুদ্ধ-বিবুদ্ধ-বরং

প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্ম পরং॥ ১

শত-গৌরি-মুরারি-তরঙ্গ-যুতং
অযুতাযুত-ভাস্কর-কুম্ভ-ধৃতং।
সুবিশাল-সমুদ্র-সুদভ্র করং
প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্ম পরং ॥ ২

ক্ষুদিরাম-বিরাম বিলাস-করং
ছল-জৃম্ভিত-কারণ-কার্য্য বশং।
জিত কাঞ্চন-কাম-প্রপঞ্চ-হরং
প্রণমামি গদাধর ব্রহ্ম পরং ॥ ৩

যুগ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গুপ্ত নটং
জন-পাবন গাঙ্গ-তটাবসথং।
শিশু-সৌম্যমগম্য-প্রণম্য বরং
প্রণমামি গদাধর ব্রহ্ম পরং ॥ ৪

শিব-কেশব-বাসব-সঙ্গ-যুতং
অবতার গরিষ্ঠমবিষ্ট-হৃতং।
অঘ-মোচন-দুষ্কৃত-মুক্তি-করং
প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্ম পরং ॥ ৫

করুণা-ঘন-কর্ম্ম কঠোর-পণং
গুণ-হীনমপাপমশেষ-গুণং।
যুগ-চক্র-প্রবর্ত্তক-তর্ক-হরং
প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্ম পরং ॥ ৬

শুভ-বেলুড়-মন্দির-সন্নিহিতম্
নিজ-শিষ্য-প্রশিষ্য-বিশেষ-রতং।
শিব-মোক্ষ-ধনেশ্বরমাদি-গুরুং
প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্ম পরং ॥ ৭

সুগভীর-সমাধি-সমুদ্র-গতং
কৃত-ভক্তি-বিকাশন-বিশ্ব-হিতং।
শুভ-জন্ম-তিথৌ ভব-তাপ-হরং
প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্ম পরং॥ ৮

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণা বিরচিতম।

সমালোচনা।

আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার সমিতি।—আজ চারি বৎসর হইল আয়ুর্ব্বেদের বিস্তার ও অবাধ প্রচারকল্পে দেশের কতকগুলি খ্যাতনামা পণ্ডিত, বৈদ্য, উকীল, ডাক্তার ও বিদ্যোৎসাহী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লইয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিস্তার সমিতি নামক একটী সভা সংগঠিত হইয়াছে। সমিতির ঠিকানা ১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেশে সুশিক্ষিত বৈদ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার উৎসাহ বিধান করাই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা এ প্রকার হিতানুষ্ঠানের বিশেষ প্রশংসা করি। যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উক্ত ঠিকানায় ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন।

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, বৃন্দাবন।—আমরা বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের একখানি রিপোর্ট পুস্তক পাইয়াছি। তাহা পাঠে পরম আনন্দিত হইলাম। বৃন্দাবনে সহায় হীন সাধুসান্তগণ অথবা দরিদ্র নরনারী পীড়িত হইলে তাহাদের সেবা হইবার কোনও উপায় নাই, এই অভাব দূরীকরণে সেবাশ্রম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৯০৮ খৃঃ জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ৫১২ জন পীড়িত নরনারীকে সেবা করা হইয়াছে। হিন্দুর পবিত্র তীর্থে এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবা যে কিরূপ শিক্ষাপ্রদ এবং কিরূপ আবশ্যকীয়, তাহা প্রতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। কুঠারের (উড়িষ্যা) বাদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসু তাঁহার বৃন্দাবনের দেবালয়ের একাংশ রোগীদিগের থাকিবার জন্য উপস্থিত স্থান প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু দিন দিন যে প্রকার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ইহার স্বতন্ত্র বাটী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, রোগীদিগের সেবা ইত্যাদির জন্যও অর্থ বিশেষ আবশ্যক। সহৃদয় ধর্ম্মাত্মা মহোদয়গণ সাধ্যানুসারে এই মহৎ অনুষ্ঠানে সাহায্য করেন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—ম্যানেজার, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, কালাবাবুর কুঞ্জ, বংশীবট, বৃন্দাবন[illegible]।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

চৈত্র, ১৩০৫ সাল।
দ্বাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা।

বিবেক ও বৈরাগ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৬১ পৃষ্ঠার পর)

মর্ম্মে মর্ম্মে সংসারের অনিত্যতার ছবি অঙ্কিত করিয়া লইতে পারিলে, সংসারাসক্ত মানবের প্রাণেও যে বিবেকের উদয় হয়, সংসারের কেহই প্রকৃত আত্মীয় নহে, ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলে, মায়ামোহান্ধ ভ্রান্ত জীবের হৃদয়েও যে বৈরাগ্যভাব জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহা একটী গল্প দ্বারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বেশ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন। গল্পটী এই—একদিন সংসারাসক্ত মায়ামোহমত্ত জনৈক গৃহী ব্রাহ্মণ, কোন একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট ধর্ম্ম কথা, ভগবৎ কথা, সদুপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ধর্ম্মপিপাসুদিগকে ধর্ম্মোপদেশচ্ছলে, বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছিলেন; বলিতেছিলেন, এ সংসার অসার, এ সংসারে কেহ কাহারও নহে, সুতরাং এ সংসার বিরাগী হইয়া সর্ব্ব মায়া ত্যাগ করিয়া ভগবৎচরণানুরাগী হওয়াই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসীর এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণটী বলিলেন, সাধুজী! আপনি এ কি উপদেশ প্রদান করিতেছেন? যে মাতা আমাদের জন্য দশমাস দশদিন কতই কষ্ট, কতই ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, যে মাতার শান্ত-স্নিগ্ধ সুশীতল ক্রোড়ে অসহায় শিশুকালে লালিতপালিত হইয়াছি, যে পিতার ঐকান্তিক যত্নে, যে পিতার প্রাণ

গত চেষ্টায় বিদ্যাদি উপার্জ্জন করিয়াছি, যে পিতা মাতা পুত্রের সুখের জন্য, পুত্রের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহেন, সেই সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ পিতাকে, সেই সাক্ষাৎ দেবী স্বরূপিণী মাতাকে, সেই স্নেহময় জনককে, সেই স্নেহময়ী জননীকে পর জ্ঞান করাইয়া দিতেছেন! অহো! এমন শিক্ষা দিবেন না, দিবেন না। যে স্ত্রী পতির সেবাশুশ্রুষায় সদা নিযুক্ত, যে স্ত্রীর স্বার্থশূন্য ভালবাসা, অকপট প্রেম দেখিলে চমকিত, বিস্মিত হইতে হয়, যে স্ত্রী, প্রাণপতির বিপদপাত হইতে দেখিলে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে, সেই পবিত্রহৃদয়া পতিগত-প্রাণা স্ত্রীকে এ সংসারে আপনার নহে বলিয়া উপদেশ দিতেছেন! অহো! সাধুজী, এইরূপ নিদারুণ উপদেশ কখনও কাহাকে দিবেন না, দিবেন না। এই সমস্ত কুশিক্ষা না দিয়া, ভগবৎগুণগান, ভগবৎমহিমা কীর্ত্তন করুন, ভগবৎকরুণার কথা বলুন, যাহাতে আমাদের প্রাণে, ভগবানের স্মৃতি জাগিয়া উঠে, যাহাতে আমাদের হৃদয় মন, এই পিতা মাতা দারাপুত্র, এই ধন সম্পত্তি দিয়াছেন বলিয়া, করুণাময় ভগবানের নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকে।

সন্ন্যাসী বলিলেন, হে যুবক! তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত, তাই আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ না; তুমি নিতান্ত বদ্ধ জীব, তাই এ সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না। মনে করিয়াছ—তোমার পিতা, তোমার মাতা, তোমার স্ত্রী, তোমার জন্য প্রাণ পর্যান্ত দিতে স্বীকৃত। তাঁহারা তোমার জন্য প্রাণ দিতে স্বীকৃত কি অস্বীকৃত, তাহা আজ একবার বৎস! পরীক্ষা করিয়া দেখ। এখনই গিয়া, রোগের ভাণ করিয়া তোমার গৃহ-প্রাঙ্গণে হতচেতনবৎ পতিত হও। পরে আমি গিয়া যাহা করিতে হয় করিব। ব্রাহ্মণ-নন্দন তাহাই করিল, গৃহ-প্রাঙ্গণে গিয়া অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কত ডাক্তার, কত চিকিৎসক, কত বৈদ্য কবিরাজ আসিল, কেহই তাঁহার ব্যাধির স্থির নির্ণয় করিতে পারিল না। যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিল, তাহাতে কোন ফলই দর্শিল না। কোন ফলই দর্শিল না দেখিয়া, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, উন্মত্তবৎ হা হতোঽস্মি করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্ত্রী, পতির বিয়োগ আশঙ্কা করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায়, আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আজ ব্রাহ্মণের গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল।

এমন সময় সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কি হইয়াছে, কি হইয়াছে, তোমরা কেন এইরূপ নিদারুণ মর্ম্মভেদী রোদন

করিতেছ? এখনও এই ব্যক্তির জীবন-রক্ষার উপায় আছে,। আমি গুরু-দেবের কৃপায় মৃত ব্যক্তিকেও জীবিত করিতে পারি। সাধুর এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত, সকলেই আশ্বস্ত, সকলেই পুলকে পূর্ণিত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী তখন বলিতে লাগিলেন, যদি এ যুবককে বাঁচাইবার তোমরা একান্ত ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তোমাদিগের ভিতর একজনকে প্রাণ দিতে হইবে। যদি কেহ জীবন দিতে পার, তবেই আমি ইহার জীবন এখনই রক্ষা করিয়া দিতে পারি। জীবন দেওয়ার কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত, সকলেই চমকিত, সকলেই জড়বৎ হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বৃদ্ধ স্থবির গৃহকর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কর্ত্তা মহাশয়! আপনার এ মানবলীলা সম্বরণ করিবার আর বড় বেশী দিন বাকী নাই, শীঘ্রই আপনাকে এ ভব-সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব আপনি আপনার পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করুন। বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল হতবুদ্ধি হইয়া, নির্ব্বাক রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সাধুজী! এই বৃদ্ধ বয়সে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ দিতে স্বীকৃত হইয়া আর আত্মহত্যার পাপে মহাপাপী হইতে ইচ্ছা করি না। আর দেখুন, সবাই নিজ নিজ কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিবে। আমার পুত্রও নিজ কর্ম্মফলে অকালে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, ইহাতে শাস্ত্রে শোক করাই নিষেধ, তবে আমরা মূঢ় জীব, শোক না করিয়া থাকিতে পারি না। সন্ন্যাসী কর্ত্তাকে জীবন দিতে অস্বীকৃত দেখিয়া বৃদ্ধা কর্ত্রীঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা! এমন উপযুক্ত, এমন অর্থোপার্জ্জনক্ষম পুত্রের বিয়োগ হইলে, যে দু'দিন বাঁচিয়া থাকিতে, মা! তাহাও বাঁচিতে পারিবে না। তাই বলি মা! অসহ্য পুত্র-শোকে না মরিয়া সন্তানের জীবনরক্ষা করিবার জন্য জীবন দেওয়াই কর্ত্তব্য। বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, ঠাকুর! পুত্রের জন্য আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিতে আমি রাজী, কিন্তু আমার একটী ছেলে নয়, আরও দুই একটী আছে, আমি গেলে তাহাদের বড়ই কষ্ট হইবে, তাহার পর আবার, বৃদ্ধ স্বামী বর্ত্তমান, আমার মৃত্যু হইলে, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কি যে দারুণ ক্লেশ, কি যে ভয়ানক কষ্ট হইবে, তাহা আর বলা যায় না। মাতাকেও পুত্রের জন্য জীবন দিতে অস্বীকৃতা দেখিয়া, তাহার স্ত্রীকে বলিলেন,—বাছা! তুমি তোমার স্বামীর জন্য প্রাণ দিয়া আদর্শ সতীর পরিচয় দাও। স্ত্রী বলিলেন, পতির জীবন রক্ষার জন্য জীবন দিব,

স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভাগ্যের কথা আর কি আছে। কিন্তু সাধুজী! আমি যদি প্রাণ দিই, তাহা হইলে আমার ছোট ছোট ছেলে পিলে আর প্রাণে বাঁচিবে না। আমি মরিয়া গেলে, আমার স্বামী জীবিত হইয়া পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবেন, দ্বিতীয় পত্নীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া আমার গর্ভজাত পুত্রদিগের পরঙ্খান করিবেন। কি করিব সাধুজী! হতভাগিনী আমি, আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। আমি স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া আমার সন্তানগণকে অকূলে ভাসাইয়া দিতে পারিব না। এই সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া কাঁধিচ্ছলে হতচেতনবৎ-নিপতিত ব্রাহ্মণ যুবক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "সাধুজী! বুঝিয়াছি—আজ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি, এ সংসারে কেহ কাহারও নহে। আজ পিতা মাতা দারা সকলেই স্ব-ইচ্ছায় আমাকে এ সংসার হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়াছেন। আর এ সংসারে থাকিতে চাহি না। এতদিন ঘোর মায়ামোহে পড়িয়াছিলাম, আজ প্রভো! আপনার প্রসাদে আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে, আমার মায়া ছুটিয়া গিয়াছে।" ভাই! আজ ব্রাহ্মণ যুবকের প্রাণে যে ভাব সমুদিত হইয়াছে, এই ভাবকেই বিবেক ও বৈরাগ্যভাব কহে।

বৈরাগ্য রক্ষা করা বড় সহজ নহে। বৈরাগ্য রক্ষা করিতে হইলে, সদা বিবেকী হওয়া চাই, সদা জিতেন্দ্রিয় থাকা চাই, আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাব্রত পালন করা চাই। যে বিবেকী, যে ব্রহ্মচারী, সে কখনও অনর্থকারী পরমার্থহারী অর্থচিন্তা, বিষয়-ভাবনা করিবে না, সে কখনও বিষয়বিমুগ্ধ ধনগর্ব্বিত বিলাসী বিষয়ীর সংসর্গ করিবে না। সে কখনও, স্ত্রীলোকের সঙ্গ করা ত দূরের কথা, কামিনীকুলের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিবে না। একদিন ভগবদ্ভক্ত পরম-বৈরাগী ছোট হরিদাস, স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা মাগিয়া লইয়াছিলেন শুনিয়া, লোক শিক্ষা দিবার জন্য, কৌপীন তিলকধারী মর্কট-বৈরাগীদিগের দমন করিবার জন্য, পরম বৈষ্ণবধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য, শচীনন্দন কলিকলুষনাশন প্রেমভক্ত্যাবতার শ্রীচৈতন্য প্রভু হরিদাসকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বরূপাদি গৌরভক্তগণ, এমন ভক্ত বৈরাগী হরিদাসের পরিত্যাগরূপ কঠিন দণ্ডের কারণ জিজ্ঞাসা করায় গৌরাঙ্গ প্রভু কহিলেন,—

"বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মানবের মন॥"

আর একদিন গৌরাঙ্গ প্রভু ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মের কথা, পরম বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর ধর্ম্মের কথা, পরমবৈরাগীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন ধারণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালন।
পরমার্থ যায় আর রসে হয় বঞ্চন॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

সত্য সত্যই এ বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু রমণীয় পদার্থ, যাহা কিছু উপভোগ্য বস্তু, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বিলাস দ্রব্য আছে, তাহা শুধু রস-স্বাদগ্রহণলিপ্সু জিহ্বার, তাহা কেবল রমণী বিলাসপ্রিয় উপস্থের উপভোগের নিমিত্ত। যে জন জন্মের মত জিহ্বার লালসা, উপস্থের উপভোগ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই জনই প্রকৃত ত্যাগী, সেই জনই প্রকৃত বৈরাগী, সেই জনই প্রকৃত ব্রহ্মচারী, সেই জনই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সে ত কখনও সংসারের ধার ধারে না। তাহার ত এ সংসারের কোন কার্য্য নাই, তাহার ত বিষয়-আশয়ে কামিনীকাঞ্চনে কোন দরকার নাই, তাহার ত এ পৃথিবীতে কোনই প্রয়োজন নাই,—

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি, জিহ্বোপস্থ নিমিত্তকং।
জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্॥

জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগ করা বড় সহজ নহে। বিবেকী বৈরাগী হইয়াও, বিবেক বৈরাগ্য রক্ষা করা সহজ নয়। কাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে, রমণীর প্রলোভনের হস্ত হইতে কত মহামুনি ঋষি, কত মহাযোগী সন্ন্যাসী, কত ত্যাগী বৈরাগী, কত বিবেকী ব্রহ্মচারী মুক্ত হইতে পারেন নাই। একদিন বক্ষ গর্ব্ব করিয়াই, বক্ষ স্ফীত করিয়া বিশুদ্ধ বিবেকী পরম বৈরাগী, চির ব্রহ্মচারী

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, "যে একবার বিবেকী হইয়াছে, যে একবার বৈরাগী হইয়াছে, তাহার মন, তাহার প্রাণ, কখনও কামিনীকাঞ্চনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইতে পারে না, তাহার হৃদয় কখনও কামিনীকাঞ্চনের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারে না। যে একবার যাহা অসত্য, যাহা অনিত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহা নিত্য, তাহা সত্য বলিয়া আর কখনও তাহার ধারণায় আসিতে পারে না। একবার যে হৃদয় বিবেকালোকে আলোকিত হইয়া গিয়াছে, সে হৃদয়ে আর কখনও অজ্ঞান অবিবেক অন্ধকার আসিয়া দাঁড়াইতে পারে না।" শঙ্করাচার্য্যের এই বিবেক গর্ব্ব, এই বৈরাগ্য গরিমা ভাঙ্গিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিশেষ আদেশ, স্ব স্ব পতির বিশেষ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, ব্রাহ্মণরমণীগণ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রমের সন্নিকট গিয়া ক্রমান্বয় কয়েক দিন ধরিয়া, কত হাব ভাব, কত অঙ্গ ভঙ্গী, কত ভ্রুকুটী ভ্রুভঙ্গী করিতে লাগিলেন। মহাতেজীয়ান, তপতেজঃসম্পন্ন, পরম বৈরাগী, যোগীশিরোমণি শঙ্করের মন কিছুতেই টলিল না। শঙ্করের হৃদয় কিছুতেই হেলিল না, দুলিল না। ইহাতে শঙ্কর ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। তাহা দেখিয়া একদিন ষোড়শী যুবতী পীনপয়োধরা সুন্দরী রমণীগণ, শঙ্করের মনে, শঙ্করের হৃদয়ে কামভাব উদ্দীপন করিয়া দিবার জন্য, ভয়ানক কামোন্মত্তার ন্যায়, স্মরশরে জর্জ্জরিতার ন্যায় মহা কামভাবভঙ্গী, মহারসরঙ্গলীলা করিতে লাগিলেন। তাহাদের সেই মনোমোহিনী, রসরঙ্গিণী, ভীষণভঙ্গিনী, কামভাবোন্মত্তা মূর্ত্তি, শঙ্কর নির্নিমেষে, নিস্পন্দ নয়নে, বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নির্ব্বিকার শঙ্করের বিকার ঘটিল। শঙ্কর সাধারণ রমণীমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, কামিনীর সাধারণ শান্তমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনদিন রমণীর এমন দারুণমূর্ত্তি দেখেন নাই। শঙ্কর এতদিন জানিতেন না যে, শান্ত রমণী-মূর্ত্তির অভ্যন্তরে এমন ভীষণা হৃদয়মনোন্মাদকারিণী মূর্ত্তি লুকায়িত আছে। ব্রাহ্মণ রমণীগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, শঙ্কর তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া আজ বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, বিবেকী শঙ্করের বিবেক আজ টুটিয়াছে। মোহবিবর্জ্জিত শঙ্করের আজ মোহ ঘটিয়াছে দেখিয়া, ব্রাহ্মণকামিনীগণ অদ্যকার মত এইখানেই রঙ্গ অভিনয় শেষ করিলেন।

অন্য একদিন, শঙ্করাচার্য্য স্রোতস্বিনী নদীর জলে অবগাহন করিতে-ছিলেন। সেই সময় একজন পীনপয়োধরাবনতা ষোড়শী যুবতী, এলায়িত-কেশা, স্খলিতবসনা ব্রাহ্মণ রমণী, শঙ্করকে একাকী দেখিতে পাইয়া, অঙ্গভঙ্গী

দ্বারা তাঁহাকে অভিভূত, উন্মত্ত করিয়া তুলিল। রমণী তখন প্রাণমনোন্মাদকারিণী নানা ভ্রুভঙ্গী করিয়া শঙ্করকে বলিল, সাধুজী! আমার এই বারিপূর্ণ কলসটী কক্ষে তুলিয়া দিতে পারেন কি? যোগী শঙ্কর, পরম বৈরাগী শঙ্কর, বিবেকীশ্রেষ্ঠ পরমজ্ঞানী চিরব্রহ্মচারী শঙ্কর, তাহা শুনিয়া আনন্দে পুলকে পূর্ণিত হইয়া, পূর্ণযুবতী লাবণ্যময়ী স্ত্রীলোকটীর কক্ষে কুম্ভ তুলিয়া দিয়া যেমন তাহার গণ্ডস্থলে, যেমন তাহার অরুণাভ, তাহার লোহিতাভ গণ্ডপ্রদেশে চুম্বন করিতে যাইবেন, অমনি রমণী শঙ্করের গালে একটী দারুণ চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "রে মূর্খ! তুই না সন্ন্যাসী, তুই না ব্রহ্মচারী, তুই না পরমবিবেকী বৈরাগী বলিয়া গর্ব্ব করিস্! আজ তুই বুঝিলি ত, রমণীর কি মোহিনীশক্তি। যে শক্তির প্রভাবজাল বিস্তার করিলে, বিবেকীর বিবেক, বৈরাগীর বৈরাগ্য, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য পর্য্যন্ত কোথায় ভাসিয়া যাইতে পারে।" তাই বলি ভাই, বৈরাগী হওয়া, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা বড় সহজ নহে। মনে কৌপীন না দিয়া, শুধু বাহিরে কৌপীন আঁটিলে, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা যায় না। শুধু বাহিরে তিলক মালা ধারণ করিলে বৈরাগী হওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্য বিবেক বৈরাগ্য রক্ষা করিতে হইলে, বিষয় বিভব হইতে কামিনীকাঞ্চন হইতে, দূরে, ভাই, বহুদূরে বহু ব্যবধানে অবস্থান করা চাই।

তবে কি ভাই, বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলেই, ভগবানের সেবায় নিরত হইতে হইলেই, ভগবানের সাধন ভজনে মনসংযোগ করিতে হইলেই ভগবৎচরণ ধ্যানে নিমগ্ন হইতে হইলেই কি, ধন জন দারা পুত্র পরিবৃত এ সংসারের বাহিরে যাইতে হইবে? এ সংসারের শত যোজন তফাতে অবস্থান করিতে হইবে? না না, তাহা নহে। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার অধিকাংশ স্থলই শুষ্ক বিবেক, শুষ্ক জ্ঞান, নীরস বৈরাগ্যের কথায় পূর্ণ। বিবেক,—সদসদ্‌বস্তু জ্ঞানকেই বিবেক কহে। এ সংসার অসৎ, এ সংসার অবস্তু, ভগবানই একমাত্র সৎ বস্তু, এই জ্ঞানকেই বিবেক-জ্ঞান কহে। আর অসৎ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সৎবস্তুর গ্রহণকেই বৈরাগ্য কহে। এই বৈরাগ্য সাধারণতঃ দ্বিবিধ। আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত সমস্তই মিথ্যা, সকলই মায়াময় জানিয়া, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, সাংসারিক সকল সংস্রব জন্মের মত ছিন্ন করিয়া ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গই জ্ঞান-বৈরাগ্য; আর দুঃখ ক্লেশপূর্ণ মায়াময় সংসারের ভিতর থাকিয়াও, সংসারের সকল সংস্রব

রাখিয়াও ভগবানের পাদপদ্মে মনঃ প্রাণ অর্পণই, সৎবস্তুর শরণ গ্রহণই, সরস ভক্তি-বৈরাগ্য। যাহারা নীরস শুষ্ক বৈরাগ্যের সাধক, যাহারা নির্ব্বাণ প্রার্থী, মোক্ষপ্রার্থী, তাহারাই শুষ্ক জ্ঞানে এ অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনিত্য অসত্য মায়াব আধার মনে করিয়া, তাহারাই "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত মায়য়াং কল্পিতো জগৎ" ইহা প্রাণে প্রাণ উপলব্ধি করিয়া, তাহারাই এ সংসার দুঃখ ক্লেশ তাপময়, জন্মমরণগতিশীল, মনে মনে চিন্তা করিয়া, সংসারের বাহিরে কাননপ্রান্তরে, নির্জ্জন নিভৃত অরণ্যে, ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে, গিরিগুহায় গিয়া নির্গুণ নিরাকার নিষ্ক্রিয় সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরব্রহ্মের সাধন করিতে থাকেন, আর,—আর যাহাবা সরস মধুব, ভক্তি-বৈরাগ্যের সাধক, যাহারা পরম ভক্ত-বৈরাগী, তাহারা ভক্তিব প্রভাবে, প্রেমের প্রাবল্যে, এই অনিত্য অসত্য সংসারে থাকিয়াই নিত্য বস্তু দেখিতে পান, তাহারা পরিজন পরিবৃত মায়াময় এ সংসারেই মায়াতীত ভক্তমনোমোহন ভক্তজীবনজীবন প্রাণেশ ভগবানকে নিয়ত বিরাজমান দেখিতে পান। যাহাবা ভগবদনুরক্ত ভক্ত-বৈরাগী—তাহারা ভগবানকে ডাকিয়া বলেন, "নাথ! অবোধ অজ্ঞান আমি, আমার নিকট প্রাণায়াম যোগ যাগ ধ্যান ধারণা, বিড়ম্বনামাত্র। জ্ঞানহীন অবোধ যে, যে শক্তিহীন সামর্থ্যহীন, সে কেমন করিয়া কোন শক্তি লইয়া, কোন সামর্থ্য লইয়া মুক্তিলাভের আশায দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষে, এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরমাত্মার অন্বেষণে বনে গমন করিবে। তাই বলি নাথ! মুক্তি চাহি না, মোক্ষ চাহি না, নির্ব্বাণ চাহি না, সংসার ত্রিতাপের হস্ত হইতে এড়াইতেও চাহি না। এই দেখ নাথ! সংসারের তাপজ্বালা ও কণ্ঠের ভূষণ করিয়া পরিয়াছি। যে সংসারের কোলে প্রতিপালিত হইয়া প্রথম নাথ! তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তোমার অমৃতরাজ্যের কথা শুনিয়াছি, সে দেশের বুলি,—সে রাজ্যের বোল 'হরিবোল' শিক্ষা করিয়াছি; যে সংসারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পরমাত্মীয় পরমদরদী তুমি, তোমাকে প্রথম হৃদয়পটে দেখিয়া লইয়াছি, সেই সংসার—সেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি-দারা সুত পরিবৃত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া বনে যাইব। তবে যদি নাথ! সংসার স্বইচ্ছায় আমাকে পরিত্যাগ করে, করুক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আমি ত নাথ! সংসারেই থাকি, আর বনেই থাকি, এ রাজ্যেই থাকি, আর কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠধামেই থাকি, যেখানে সেখানেই থাকি, হে প্রাণনাথ! তোমাকে লইয়া থাকিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত! চাহি

না যাইতে সে দেশে, চাইনা যাইতে সে রাজ্যে নাথ। সে রাজ্যের ধন তুমি, তোমাকে লইয়া যদি এ ভূলোকে একবার বাস করিবার আয়োজন করিয়া লইতে পারিলাম, তবে আমার সে দেশে কাজ কি, সে রাজ্যে, সে ধামে প্রয়োজন কি? যাহাকে লইয়া আমার সে দেশ, যাহাকে লইয়া আমার স্বদেশ, পরব্রহ্ম পরমাত্মীয় তুমি, সেই তোমাকেই যদি এ দেশে পাইলাম, তাহা হইলেই আমার নিকট এ দেশও সে দেশ, এ বিদেশও স্বদেশ হইয়া দাড়াইল। তাই বলি নাথ। পথেই থাকি আর ঘাটেই থাকি, ঘরেই থাকি আর বাহিরেই থাকি, যেখানেই থাকি, চাই শুধু তোমাকে, চাই নাথ। মদনমোহন, ভক্তরমণ তুমি, তোমাকে লইয়া থাকিতে, "যাহা লাগি মদনদহনে দহি গেনু"। চাই শুধু নাথ। নবনটবর রসিকনাগর নবীন শ্যামসুন্দর তুমি, তোমার শ্রীচরণ সেবায় নিযুক্ত হইতে, আর চাই শুধু তাহাদিগকে, যাহারা এ সংসারে হে প্রাণবল্লভ, তোমার সেবার অনুকূল, সাহায্যদাত্রী। নাথ। চাই তাহাদিগকে যাহারা এ সংসারে ললিতা, বিশাখা, যাহারা প্রাণদা। তোমার গলায় পরাইয়া দিবে বলিয়া ফুলচন্দন, ফুলমালা গাঁথিবার অভিলাষী, যাহারা তোমাকে চামর দিয়া ব্যজন করিবার আকাঙ্ক্ষী। আর তাহারা আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াক, যাহারা এ সংসারে প্রাণনাথ, হৃদয়েশ্বর, তোমার প্রেমের, তোমার সেবার বিরোধী; চাই না তাহাদিগকে, যাহারা এ সংসারে জটিলা কুটিলা, যাহারা কাম মোহ, যাহারা মদ মাৎসর্য্য।" ইহাই ভক্ত বৈরাগীর হৃদয়োদ্গত কথা, প্রাণোচ্ছ্বসিত মধুর ভাব। যাঁহারা সরস ভক্ত-বৈরাগী, তাহারা এ সংসার আমার বলিয়া জানে না, তাহারা এ সংসার আমার বলিয়া বুঝিতে চাহে না। তাহারা, "আমার" স্থানে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করে, তাঁহারা সংসার আমার বলিয়া না বুঝিয়া, আমার প্রাণপতি, আমার হৃদয়বল্লভ ভগবানের বলিয়া প্রাণে প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া রাখে। পতিগতপ্রাণা সাধ্বী সতী যেমন ভাবে, যে সংসার সদা সর্ব্বদা আমার আমার করিতেছি, যে সংসারের এত সেবা এত শুশ্রূষা করিতেছি, সে সংসার ত স্বামীকে ধরিয়াই পাইয়াছি। স্বামীকে না পাইলে, পতিলাভ করিতে না পারিলে, এ সংসার আমার কোথা হইতে আসিত? এ সংসার কোথায় পাইতাম? সতী যেমন, প্রাণপতির পিতামাতা বলিয়াই শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করে, স্বামী হইতে পুত্র কন্যা পাইয়াছে বলিয়াই, পুত্র কন্যার লালনপালন করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তও তেমনই ভাবে, আমার প্রাণের দেবতা জীবনসর্ব্বস্ব ভগবানই আমাকে এ সংসার

দিয়াছেন, ভগবানই এ সংসারের প্রভু, এ সংসারের একমাত্র অধিকারী স্বামী। ভক্ত এ সংসার ভগবানের বলিয়াই সংসার-সেবায় নিযুক্ত হয়। সতী যেমন বাহিরে সকলেরই সেবা শুশ্রূষা করে কিন্তু তাহার অন্তর, তাহার প্রাণ, স্বামী ভিন্ন অন্য কেহ অধিকার করিয়া বসিয়া নাই; ভক্তও তেমনই বাহিরে দারা পুত্র, আত্মীয় স্বজনের আদর যত্ন,-সেবাশুশ্রূষা করে বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়াসন অধিকার করিয়া বসিবার অধিকার-একমাত্র প্রাণবল্লভ হৃদয়েশ ভগবান ব্যতীত এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কাহারও নাই। সতী যেমন সংসারের যাহা কিছু সম্পন্ন করে, সে সমুদয়ই তাহার পতির, তাহার জীবিত-বল্লভের সন্তুষ্টির, প্রীতির জন্য; ভক্তও তেমনই এ সংসার-ভবনে যাহা কিছু কার্য্য, যাহা কিছু কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া থাকে, সে সমস্তই, সে সকলই তাহার হৃদয়েশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার জন্য, প্রীতির নিমিত্ত। তাই ভগবদ্ভক্ত ভাবাবেশে প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠে,—হে প্রাণপ্রিয়! হে প্রাণনাথ!

"ব্রহ্মাণ্ডের সকলেতে তুমিই ত মূর্ত্তিমান,
যা' নিয়ে র'য়েছি সবই তুমিই ক'রেছ দান।
তব কথা সকলই ত শুনি কাণে বা যখন,
যাহা কিছু করি সবই তব পূজা আয়োজন॥"

জগজ্জননীর পরম ভক্ত কোন মুনি ভাবের আবেশে, প্রাণের দেবতাকে বলিয়াছেন,—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং, সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ, তদেব তব পূজনম্॥"

সত্য সত্যই ভক্ত বৈরাগী, এ ভব-সংসারে যাহা কিছু করে, তাহা ভগবানের উদ্দেশ না করিয়া করে না। ভগবদ্ভক্ত এ সংসারে প্রাণেশ্বর ভগবানকে লইয়াই, অহোরাত্রি সদা সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করে। ভগবানই তাহার অবলম্বন, ভগবানই তাহার ধ্যানজ্ঞান, ভগবানই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয়। ভক্তবৈরাগী ধন-জন-পরিজনসম্পন্ন ভবনেই থাকুক, আর হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ বিজন গভীর অরণ্যেই থাকুক; মলয়ানিল সঞ্চালিত, ভৃঙ্গগণগুঞ্জরিত সুরভিত পুষ্পোদ্যানেই থাকুক, আর নরকঙ্কালময় ভীষণ শ্মশান প্রান্তরেই থাকুক, কখনও তিলার্দ্ধকাল ভগবান ছাড়া থাকে না। অতুল ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে বিপুল বিভব সম্পত্তির অত্যন্ত সুখস্বাচ্ছন্দের ভিতর থাকিয়াও ভক্তবৈরাগী ভগবানের কথা কখনও ভুলিয়া যায় না। সংসারের দারুণ দুঃখ আলাপ

জর্জ্জরিত হইলেও, দারুণ ত্রিতাপানলে বিদগ্ধ হইলেও, ভক্তবৈরাগী প্রাণের দেবতাকে কখন বিস্মৃত হয় না। জান না কি, ভাই, সখ্যভাবাশ্রিত ভক্ত সুদামা, অতি দীনাতিদীন দরিদ্র হইয়াও, মুহূর্ত্তকালের জন্যও ভগবানকে বিস্মৃত হন নাই। জান না কি, বাৎসল্যরসাশ্রিতা কৃষ্ণৈকপ্রাণা মা বসুদেব-রমণী দেবকী, কংস-কারাগারে, স্বীয় বক্ষঃস্থলে দারুণ পাষাণ, কঠিন প্রস্তর ধারণ করিয়াও, 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়া, প্রাণগোপাল কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধিকা গুরু-গঞ্জনার পসরা, ঘৃণিত কুল-কলঙ্কভার মস্তকে গ্রহণ করিয়াও, অকূলকাণ্ডারী কৃষ্ণচন্দ্রের চিন্তা ছাড়িতে পারেন নাই। আবার জান না কি, ভাই,—অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী স্বর্ণলঙ্কাপুরীর ভিতরে অবস্থান করিয়াও, ভক্তবৈরাগী বিভীষণ, নবদুর্ব্বাদলশ্যাম ভগবান রামচন্দ্রের কথা কখনও বিস্মরণ হইয়াছিলেন না। লঙ্কাধিপতি রাজাধিরাজ দশানন রাবণ, বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়াও, দুর্লভ ধনরত্ন-মণিকাঞ্চনের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াও, রামদয়িতা জনকদুহিতা সাধ্বী সীতার অন্তরের অন্তস্তল হইতে জটাজুটধারী বল্কলপরিধানকারী বনচারী রামচন্দ্রের মূর্ত্তিখানি অন্তর্হিত করিতে পারিয়াছিল না। রাজর্ষি জনকের মন, বিপুল বিভব ঐশ্বর্য্যসাগরের ভিতর ডুবিয়া থাকিয়াও তিলার্দ্ধকাল ভগবানের চরণকমল হইতে বিচলিত হইয়াছিল না। মহাভক্ত মহাবীর হনূমান, মহামূল্য অনিন্দ্যসুন্দর মুক্তাহারে রাম নাম অঙ্কিত না দেখিতে পাইয়া, তাহা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। ভক্তবৈরাগী সে বিষয় বিভব, সে মণিকাঞ্চন, সে ধনরত্ন চাহে না,—যাহার ভিতর ভগবানের নাম গন্ধ নাই। ভক্ত, সে সুখ, সে আনন্দ চাহে না, যে সুখ, যে আনন্দ ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে দেয় না। ভক্তবৈরাগী বলে, সে সুখ, সে সম্পদ হইতে কষ্টই ভাল, দুঃখই প্রশংসনীয়, ক্লেশই বাঞ্ছনীয়;—যে কষ্ট—যে ক্লেশ, যে দুঃখ মুহুর্মুহু ভগবানের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়;—

"সুখ্‌কে ভবন্ পড়ে, যো হর হৃদ্ সোঁ যায়।
বলিহারী উহু দুখ কি, যো পল্ পল্ রাম কহায়॥"

যে সুখৈশ্বর্য্য, যে সুখ সম্পদ ভগবৎ-সেবায় বাধা-বিঘ্ন ঘটায়, সে ধনৈশ্বর্য্য সে সুখ-সম্পদ, সে সুখ স্বচ্ছন্দতা, ভক্ত চাহে না। তাহার স্ত্রী-পুত্র পরিজন-পরিবৃত্ত সংসারও যদি তাহার ভগবৎ-সেবার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে সংসার—সে দারাপুত্রও, সে বন্ধুবান্ধব—সে আত্মীয় স্বজনও ভক্তবৈরাগী চাহে না। ভক্তবৈরাগী ভাল করিয়া জানে যে, ভগবানকে লইয়াই

আমার এ সংসার। সংসারকে আশ্রয় করিয়া কখনও আমার ভগবান নহে। ভাই! ভগবদ্ভক্ত বলে, "আমি এ ভব-সংসারে ভগবানকে লইয়াই অহোরাত্র অবিশ্রান্ত অবস্থিতি করিব; দিবারাত্রি সদা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ চিন্তা, ভগবৎসেবা লইয়াই এ বিশ্ব-সংসারে আজীবন থাকিব, ইহাতে সংসার আমার থাকুকই, আর ভাসিয়াই যাউক, ইহাতে দারাপুত্র আমার ভগবৎ সেবাব্রতের সহায়তাই করুক, আর জন্মের মত আমাকে পরিত্যাগই করুক, ইহাতে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আমার সুখ্যাতিই করুক, আর নিন্দাই করুক, ইহাতে লোকে আমাকে সহানুভূতিই প্রদর্শন করুক, আর ভ্রুকুটি ভ্রূভঙ্গই করুক, ইহাতে সমাজ আমাকে পুরস্কৃতই করুক, আর দণ্ডিতই করুক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি কখনও প্রাণের দেবতার সেবা প্রাণ থাকিতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি কালিন্দীতটে বংশীবটস্থিত সেই মদন-মোহন মোহনমুরলীবদন শিখিপুচ্ছচূড় শ্যামসুন্দরের সুমধুর বংশীরব শুনিলেই জল আনিবার ছলে কলসী লইয়া যমুনায় যাইবই যাইব, ইহাতে আমার কুল ভাসিয়া যায় যাউক, লোকে ইহাতে কুলটা বলে বলুক, আর জটিলা কুটিলা ইহাতে নিন্দা করে করুক! ক্ষতি নাই, ক্ষতি নাই, বিন্দুমাত্রও আমার ক্ষতি নাই। আমার কুল, আমার সংসার ভাসিয়া গেল বলিয়া, লোকে আমাকে নিন্দা করিল বলিয়া, আমি কখনও, প্রাণে যাহাকে প্রাণের দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার চিন্তা, সেই প্রাণনাথ—সেই হৃদয়াধিকারী বংশীধারী ভগবানের সেবা, সেই নন্দনন্দন গোবিন্দের পূজা পরিত্যাগ করিতে পারিব না, পারিব না।" ভগবানের প্রতি, প্রাণের দেবতার প্রতি যাহার এইরূপ ঐকান্তিক অনুরাগ, যাহার এইরূপ আন্তরিক টান, সংসারে থাকিয়াও সে নিঃসঙ্গ, সে নির্লিপ্ত, সে নির্ম্মম, সে নিরহঙ্কার! তাই বলি ভাই! ভগবদ্ভক্ত, সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলেও সদা আসক্তিশূন্য; পুত্র পত্নী স্বজন বান্ধব লইয়া বাস করিলেও ভক্ত সদা মায়ামমতাশূন্য; ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ সংসারে অবস্থান করিলেও ভক্ত আজীবন সংসারবৈরাগী।

এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ-সংসার মায়াময়, মিথ্যা, এই জ্ঞানে, এই বিচারে, এই বিজ্ঞানে হৃদয়ে যে নীরস শুষ্ক জ্ঞানবৈরাগ্যের উদয় হয়, সেই নীরস শুষ্ক জ্ঞানবৈরাগ্যের সাধককে জন্মের মত সংসার পরিত্যাগ করিয়া জটাবল্কলধারী সন্ন্যাসী সাজিতে হয়। আর সংসারে নিরত থাকিয়া ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের সংসারসিন্ধুতারণ শ্রীচরণাম্বুধ্যানে হৃদয়ে যে ভক্তিবৈরাগ্যের উদয় হয়, সেই

সরস মধুর ভক্তিবৈরাগ্যের সাধক—সেই পরম ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ-প্রেমে এতই বিহ্বল, ভগবৎ-সেবানন্দে এতই আনন্দিত, ভগবচ্চিন্তায় এতই তন্ময় হইয়া পড়ে যে, ধনজনপূর্ণ এ সংসার যে মায়ামোহময়, হর্ষবিষাদবিজড়িত, সুখদুঃখাশ্রু-প্লাবিত, তাহা একেবারেই ভুলিয়া যায়। তাহার নিকট এই মিথ্যা মায়াময় সংসার প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয়-নিকেতন বলিয়া বোধ হয়, তাহার নিকট এ দুঃখশোকজ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার সদা আনন্দোৎসবপূর্ণ বলিয়া উপলব্ধ হয়। এ অবস্থায় ভক্তের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হইলেও যে আনন্দ, বিভব ঐশ্বর্য্য ধ্বংস হইলেও সেই আনন্দ; স্ত্রী পুত্র জীবিত থাকিলেও যে আনন্দ, দারা সুত দেহ ত্যাগ করিলেও সেই আনন্দ। সুখেও যে আনন্দ, দুঃখেও সেই আনন্দ; মানেও যে আনন্দ, ঘোর অপমানেও সেই আনন্দ; সম্পদলাভেও যে আনন্দ, বিপদপাতেও সেই আনন্দ। আনন্দ—আনন্দ—নিস্পৃহ প্রেমিক ভক্ত-বৈরাগীর সর্ব্ব বিষয়েই সর্ব্বাবস্থায়ই আনন্দ। কেন না সে প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে যে, এই অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহা সমস্তই ইচ্ছাময় ভগবানের ইচ্ছায়। সে মনে প্রাণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, এ ভবসংসার ভগবানের লীলাক্ষেত্র। তিনিই নানা রূপে নানা ভাবে নানা লীলা, নানা খেলা করিতেছেন। ভক্ত চিরকাল ভগবানের লীলায়, ভগবানের খেলায়, ভগবানের ইচ্ছায় পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই ভাই! ভক্তের এ বিশ্বসংসার থাকিলেও যে আনন্দ, না থাকিলেও সেই আনন্দ। একদিন পরম ভক্ত নামদেবের গৃহে অগ্নি লাগিয়া, প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের লোকে, পাড়াপ্রতিবাসী-গণ, তাহার গৃহাভ্যন্তর হইতে জিনিষপত্র দ্রব্যাদি বাহিরে নিরাপদ স্থানে আনিয়া রাখিতেছিল, তাহা দেখিয়া নামদেব দৌড়াইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি সেই সমস্ত জিনিষপত্র দ্রব্যাদি ভীষণ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিল, বলিল, "জিনিষপত্র রক্ষা করিবার তুমি আমি কে? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা, প্রলয়কর্ত্তা নিয়ন্তা যিনি, অঘটন-ঘটনকারী সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় ভগবান যিনি, তিনি যখন আজ এ গৃহ দ্রব্যাদি সমস্ত ভস্মীভূত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার তুমি আমি কে? তাঁহার খেলা, তাঁহার লীলা ভঙ্গ করিবার তুমি আমি কে?" আমরি মরি! সদা লীলাময় ভগবানের লীলাখেলায়, ভগবানের কার্য্যকলাপে ভক্তের কি গভীর বিশ্বাস! ভগবানের উপর ভক্তের কি ঐকান্তিক অনুরাগ, ভক্তের কি আন্তরিক

অনুরক্তি! বিষয়ের ভিতর থাকিয়াও, ভক্তের বিষয়ে কি বিষম বিরাগ! সংসারের ভিতরে থাকিয়াও সংসারে কি তীব্র বৈরাগ্য !!

অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, ভক্তের ভক্তি পরীক্ষাকর্ত্তা ভগবান, ছদ্মবেশে ভক্ত নামদেবের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নামদেব! ঘর বাড়ী পুনরায় তৈয়ারী করিবে না?" হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল অন্তরে নামদেব উত্তর করিল, "যিনি পোড়াইয়াছেন, যাঁহার ইচ্ছায় এ গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, তিনি যে দিন ঘর উঠাইয়া দিবেন, সেই দিনই উঠিবে, তিনি যে দিন ইচ্ছা করিয়া ঘর তৈয়ারী করিয়া দিবেন, সেই দিনই তৈয়ারী হইবে।" ভক্তজীবনসর্ব্বস্ব ভগবানের উপর ভক্তের কি প্রাণগত আন্তরিক নির্ভরতা! ভগবানের উপর যে ভক্ত সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দিয়া এ সংসারে নিশ্চিন্ত থাকে, তাহার কার্য্য না করিয়া কি ভক্তবৎসল ভগবান চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি যে নিজ মুখেই বলিয়াছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥"

সত্য সত্যই এ সংসারে যে ভক্ত অনন্যচিন্তাযুক্ত হইয়া ভগবানের উপাসনা, সাধনা, আরাধনা করে, যে ভক্ত ভগবানের দয়ার উপর, ভগবানের ইচ্ছার উপর সমস্ত নির্ভর করে, ভগবান সেই নিত্যযুক্ত ভক্তের বোঝা, সেই ভগবদ্গত-প্রাণ ভক্তের যোগক্ষেম বহন না করিয়া কি থাকিতে পারেন? যাঁহার কটাক্ষে নিমেষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতেছে, সহস্র সহস্র সৌরজগৎ লয়প্রাপ্ত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছাতে ত্রিভুবনের সমস্তই সংঘটিত হইতেছে, সেই ইচ্ছাময় সৃজনপ্রলয়কর্ত্তা সর্ব্ববিধাতা ভগবান স্বয়ং স্বহস্তে খড় দড়ি আনিয়া ভক্তচূড়ামণি নামদেবের গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ভক্তপ্রাণ ভগবান স্বয়ং সেই গৃহ নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্য, নানা রকম রমণীয় মনোমুগ্ধকর জিনিষপত্র দিয়া সুসজ্জিত সুশোভিত করিয়া দিলেন। অহো! ভগবানের কি ভক্তপ্রাণতা! কি মহা ভক্তবৎসলতা, কি প্রগাঢ় ভক্ত-ভালবাসা! ভগবানের এই ভক্তবৎসলতা যে মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, ভগবানের এ গভীর লীলা-রহস্য যে অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছে, পূর্ণমঙ্গলনিধান ভগবানের সদা মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর, করুণানিলয় ভগবানের অপার করুণার উপর, যে সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে, সেই শুধু এ সংসারে থাকিয়া ভক্তি-বৈরাগ্য লাভ করিয়া, সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে,

সম্পদে বিপদে সকল সময়েই, সকল অবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তাহারই নিকটে সকলই শান্তিপ্রদ, সকলই আনন্দময়—আনন্দময় এ বিশ্বসংসার!

ভাই! এ সংসারভবনে থাকিয়া যদি ভক্তি-বৈরাগ্য লাভ করিবার বাসনা থাকে, যদি সংসারের সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে সকল বিষয়ে ভাই, পরমানন্দ পরম শান্তি নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই পূর্ণানন্দময় সদা সুখময় ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, প্রাণপতি ভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, সংসারক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিচরণ করিতে হইবে। যেখানে জ্ঞানীবৈরাগীগণ, বিবেকী সন্ন্যাসীগণ, এ মায়াময় অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরস্থিত বিজন বনে, গিরি-গুহায় গিয়া, মায়া মোহের কঠিন হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন, সেখানে তোমাকে সংসারে থাকিয়াই, সংসারের ধন জন দারা পুত্র প্রাণ মন সকলই,—জপ তপ দান ধ্যান যাহা কিছু তোমার প্রিয়, তাহা সমস্তই ভগবানের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ পদপঙ্কজে সমর্পণ করিয়া, সংসার-মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে, সংসারচিন্তা হইতে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।

"ইষ্টং দত্তং তপোজপ্তং, বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ পরস্মৈ চ নিবেদনম্॥"

তাই বলি ভাই! সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, তোমার এ গৃহ-সংসার, ভগবানের দীনতারণ দুঃখদৈন্যহরণ শ্রীচরণ সরোজে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, এ সংসার ভবনে ভগবানকে লইয়া অহোরাত্র অবস্থান করিতে হইবে। এ সংসারে শরীর, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা দ্বারা যাহা কিছু সম্পন্ন করিবে, তাহা সমস্তই, সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের উদ্দেশ্য করিয়া, সর্ব্বাধার ভগবানের লক্ষ্য করিয়া করিতে হইবে। ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া সংসারের কার্য্য করিলে, বস্তুতঃই সংসারের মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না; সংসারের দুশ্ছেদ্য মায়াজালে বিজড়িত হইতে হয় না। ভাই, সত্য সত্যই যদি তুমি, দারুণ-ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহ, যদি তুমি দুশ্ছেদ্য সংসার মায়াজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে চাহ, মনের বাসনা চিরনির্ব্বাসিত করিবার বাসনা কর, যদি তুমি সংসার কল্মষ, ভবদুরিত বিদূরিত করিতে ইচ্ছা কর, যদি তুমি হৃদয়ের ঘোর অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করিবার বাঞ্ছা কর, যদি তোমার হৃদয়কমলে অমৃতময় ভগবানের অমৃত নাম চির-

প্রতিষ্ঠিত করিতে সাধ যায়, তবে অবিরাম দিবা রাত্রি মনে মনে স্মরণ কর—ভগবানের পতিতপাবন অধমতারণ দীনশরণ দুরিতহরণ চরণসরোজ।

"প্রভুকৈ সিমরন্ মনকো মলু জাই।
অমৃত নাম রিদ মাহি সমাই॥"

"ভাই, সংসারাসক্তি, ধনজনানুরাক্ত তোমার টুটিয়া যাইবে, হৃদয়ে আপনিই ভক্তি বৈরাগ্যের উদয় হইবে, অন্তরের অন্তস্তলে ভগবান আবির্ভূত হইয়া সকল দুঃখদুরিত বিদূরিত করিবেন, সারাদিন সকল সময় মাতিয়া থাক— ভগবানের ভবদুঃখতাপনিবারণ, মায়ামোহনাশন, অনন্ত নাম-সঙ্কীর্ত্তনে, অনিবার অহোরাত্র নিবিষ্ট মনে শ্রবণ কর,—অনন্ত অচিন্ত্য চিন্তামণির অনন্ত মহিমা, অপার করুণার গাথা।

"সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ। শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্য শেষং। যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাদি বাতঃ॥"

ভক্তিভরে ভগবানের অমৃতময় মধুর গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবানের অপার, অনন্তমহিমা স্মরণ করিতে করিতে, ভগবৎ-চরণস্থিত সুরভিত নির্ম্মাল্যের ঘ্রাণ লইতে লইতে, ভগবানের ভুবনমনোমোহিনী কোটী চন্দ্রপ্রভাময়ী ভক্তমনোময়ী বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে, ভাই সাধক, ভাই ভক্ত, তোমার একদিন এমন দিন সত্বর, এমন দিন শীঘ্র আসিবে, যে দিন, দীনদয়াময় শ্রীহরির চারুচরণাম্বুজে তোমার মনঃপ্রাণ সংলগ্ন হইয়া যাইবে; একদিন এমন দিন শীঘ্র উপনীত হইবে, যে দিন, এ সংসারে ভগবানের সেবা, ভগবানের প্রেমবিরোধী যাহা কিছু, তাহাতে তোমার আপনাপনি চিরবৈরাগ্যের উদয় হইবে, তাহাতে তোমার চির-ঔদাসিন্যভাব হৃদয়ে চির-জাগরুক থাকিবে।

ভক্তহৃদয়োন্মাদকারী, ভক্তপ্রাণেশ, ভক্তজীবন হরি! বল, বল, আর কত দিনে তুমি আপনা আপনি আমার হৃদয়ে আসিয়া ধরা দিবে? যদি তোমার ধরা না দিবার ইচ্ছা ছিল, তবে কেন নাথ! তোমার নামে, তোমার প্রেমে আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিলে? তোমাকে কেমন করিয়া ধরিতে হয়, আমি ত নাথ! তাহার কিছুই জানিনা। কেমন করিয়া যোগে প্রাণায়ামে, তোমাকে ধারণা করা যায়, তাহাও ত হরি! জানিনা। কেমন করিয়া হরি! আমি তাহা জানিব! আমার চতুর্দ্দিকে যে হরি! ঘোর অজ্ঞান অন্ধকার ঘেরিয়া রহিয়াছে, জানিতে চাহি, জানিতে দেয় কই? আমি যে

হরি! সংসারকূপে, কামিনীকাঞ্চন ভাগাড়ে নিপতিত, উঠিতে চাহি, উঠিতে পারি কই? আমাকে যে হরি! এ সংসার, কঠিন মায়ানিগড়ে, নির্ম্মমভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তোমার রাজ্যে যাইবার জন্য প্রাণ মন ব্যাকুল হইলেও, যাইতে দেয় কই? কাঙ্গালশরণ কাতরভয়ভঞ্জন নিরঞ্জন হরি! বল, বল, আর কত দিন এ সংসারকূপে পড়িয়া থাকিব? বল, পতিতপাবন দীননাথ হরি। বল বল, তুমি থাকিতে বিষয়-কলুষিত হৃদয় লইয়া, এ পতিত দীন, এ সংসারে আর কত দিন থাকিবে? শুনিয়াছি প্রভো!—শুনিয়াছি,—

"সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্য স্ত্রাতুমধীশ্বরঃ॥"

প্রভো! এ বিশ্ব-সংসারে তুমি ভিন্ন, এ সংসারকূপে পতিত দীনজনকে আর কে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে? নাথ! সংসারে থাকি ক্ষতি নাই; সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করি, ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রভো! তোমাকে চাই। *সংসারে আমার ধন আছে, স্বজন আছে, দারা পুত্র আছে, ভ্রাতা ভগিনী* আছে। নাই শুধু তুমি নাথ। দেখি না, এ সংসার ভবনে, শান্তিনিকেতন আনন্দভবন শ্রীহরি! শুধু তোমাকে। দারা পুত্র ধনজন প্রভৃতি খেলনা লইয়া আর এ সংসার-খেলা করিতে চাহি না। এখন সংসার করিতে চাহি হরি! শুধু তোমাকে লইয়া। এখন এ সংসারের কাজ কর্ম্ম হাতে করিতে চাহি হরি! নয়ন ভরে শুধু তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া। নবোঢা বালিকা যতদিন বালিকা, ততদিন তাহার পতি যেখানে সেখানে থাকুক, তাহাতে তাহার বড় কিছু একটা আসে যায় না। সে, সংসারে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী, সখী সঙ্গিনী লইয়া বেশ সুখে, বেশ আনন্দিত মনে দিন কাটাইতে থাকে। কিন্তু সে যৌবনে পদার্পণ করিলে, সে পূর্ণা-যৌবনা হইলে, তখন তার পতির কথা, পতির স্মৃতি, হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তখন আর তার পতি-বিহীন, স্বামী বিরহিত সংসার ভাল লাগে না, তখন তার সকলই ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া বোধ হয়। হরি! আমারও আজ ঠিক তাহাই হইয়াছে। প্রাণপতি হরি তুমি, তোমার অভাবে, তোমার অদর্শনে, এ সংসারে আর মন আটে না, এ সংসার-কার্য্যে আর মন বসে না। নাথ! আমিও এতদিন বালিকা ছিলাম। 'তুমি যে আমার, আমি যে তোমার', তাহা এতদিন ভুলিয়া ছিলাম। প্রাণবল্লভ! আজ আমি প্রেমের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, তাই প্রেমময় হরি! আজ প্রাণে সুধার ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই আজ, সুধার আধার

বিশ্বাধার প্রাণপতি হরি—তুমি, তোমার কথা মনে পড়িয়াছে। কিন্তু নাথ! সংসারক্লিষ্ট, সদা পাপের সেবায় জীর্ণ শীর্ণ ক্ষিপ্ত দেহ মৃতপ্রায় আমি, আমার সে শক্তি, সে সামর্থ্য নাই, যে শক্তির বলে, যে সামর্থ্যের প্রভাবে—তুমি যে অমৃতরাজ্যে, যে বৈকুণ্ঠধামে নিত্য বিরাজিত, সেই ধামে যাইব, সেই রাজ্যে পৌছিব। তাই বলি প্রাণেশ্বর! যে পঙ্ক হইতে আমাকে তুলিতে হয়, তুমি আসিয়া তোল, সে রাজ্যে লইয়া যাইতে হয়, জীবনেশ! তুমি আসিয়া আমাকে লইয়া যাও। এস হরি! এস প্রাণবল্লভ! এস, এস। তোমার অদর্শনে আর আমার প্রাণ, আমার হৃদয়, একদণ্ডও স্থির শান্ত হইতেছেনা। এস, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম বঙ্কিমনয়ন প্রাণসখে! একবার দেখা দাও—

"হে দীন! দয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥

আমি কি করিব নাথ! আমি যে হরি! শ্রান্ত ক্লান্ত দিগ্ভ্রান্ত। কেমন করিয়া প্রভো! তোমার অদর্শন, তোমার বিরহকাতর প্রাণ লইয়া, সংসারপথ-পর্য্যটনশ্রান্ত কাতর কলেবর লইয়া, তোমার অমৃতরাজ্যে পৌছিতে সমর্থ হইব। কেমন করিয়া তোমার শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইব। তাই বলি দয়াময়! দয়ার্দ্রনাথ! দয়া করিয়া তুমি এ কাতর কিঙ্করের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। এস প্রভো! এস, এস। চরণস্পর্শ প্রদান করিয়া হরি! পাষাণীকে যেমন মানবী করিয়াছিলে, তেমনই নাথ! ও রাঙ্গা শ্রীপাদপদ্ম প্রদান করিয়া আজ এ সংসারকূপ-পতিতকে উদ্ধার কর, হৃদয়ের পাষাণত্ব দূর কর। নাথ! মৃতকে সঞ্জীবিত কর, গতিহীনকে গতিশীল করিয়া দাও। এস সখে! এস, এস! আর নাথ! তোমা বিরহিত হইয়া এ সংসার ভবনে, এ বিশ্বরাজ্যে তিলার্দ্ধকাল তিষ্ঠিতে ইচ্ছা হয় না।

এস হৃদে হৃদয়রমণ!

বঁধু! তোমায় ছেড়ে আছি ল'য়ে শূন্য হৃদয়, শূন্য জীবন।
নাথ! এতদিন বালিকা ছিলাম, বঁধু কি ধন না বুঝিতাম,
তাই, তোমায় ছেড়ে এ সংসারে, ছিল ধূলা খেলায় মাতিয়ে মন।
বাল্যকাল ত নাই আর এখন, এসেছে মোর প্রেমের যৌবন,
এখন, বৃথা মায়ায় ধূলাখেলায় নাথ! আর ত কভু ভুলে না মন।
মনে উদয় হ'লে যৌবনরাগ, ধূলা খেলায় জন্মে বিরাগ,
তখন, পতির উপর হয় অনুরাগ, বঁধুর কারণ ব্যাকুল হয় মন।

সদা, তোমা লাগি মদনমোহন, দহে মদনদহনে মন,
প্রাণ, তোমা বিনে এ ভুবনে তিষ্ঠে নাহে কৃষ্ণবরণ! (ক্ষণকালও)
যে কাম, থাকিলে কাছে ঘেঁসনা, (মনে), নাই নাথ সে কাম আবর্জ্জনা,
এ যে পিরীতি-মদন-শরে জর জর মম জীবন।
এ যৌবনে তোমায় না দেখে, ভোলা কেমনে নাথ প্রাণ রাখে,
এবার, দেখা দিয়ে প্রাণসখে! জুড়াও, তৃষিত তাপিত জীবন॥

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

কামারপুকুরে মহামহোৎসব।

"কামারপুকুর নামে কোথা এক ক্ষুদ্র গ্রাম।
রামকৃষ্ণ আবির্ভাবে আজি মহা পুণ্যধাম॥"

জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে তাঁহার জন্মোপলক্ষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের দ্বারায় কোনও কোনও বর্ষে কিছু আনন্দোৎসব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার নামে, তাঁহার জন্মভূমিতে সর্ব্বসাধারণকে লইয়া প্রকাশ্য মহামহোৎসব এই সর্ব্বপ্রথম।

দেবপরিবারের বহুদিনের সাধ, যাহাতে তাঁহাদের দেশে ঠাকুরের একটী মহোৎসব হয়, তাই কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানের শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক স্বামী যোগবিনোদ এই উৎসব ব্যাপারে বিশেষরূপে মনোনিবেশপূর্ব্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। ধন্য তিনি! প্রভুর কৃপায় ও দেবপরিবারের আশীর্ব্বাদে তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। গত ২৯শে ফাল্গুন, শনিবার, কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরম সৌভাগ্যবশে আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া, এই প্রথম উৎসবে যোগদান করিয়া জীবনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

২৮শে ফাল্গুন, শুক্রবার, বেলা ১১টায়, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যাশ্রমে যাইয়া পৌঁছিলাম। যাইয়া দেখি, আনন্দের হাটবাজার বসিয়াছে। বাহিরের গৃহে কলিকাতা হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ বসিয়া "জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনি তুলিয়া আনন্দ করিতেছেন। কেহ কেহ উৎসবের কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। দেবপরিবারস্থ সকলেই কি এক আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে উৎসব কার্য্যে রত রহিয়াছেন। বাটীর পার্শ্বেই, দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বৃহৎ আটচালা বাঁধা

হইয়াছে, সেইখানে নামগান কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ হইবে। আমরা ৺রঘুবীর, ৺মা শীতলার গৃহে ও ঠাকুরের জন্মস্থানে প্রণাম করিয়া, ঠাকুর পরিবারস্থ সকলের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া, বিশ্রামার্থ আটচালায় উপবেশন করতঃ স্বামী যোগবিনোদের নিকট, উৎসবায়োজন বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলাম। যথাসময়ে স্নানান্তে আমরা ৺রঘুবীরের প্রসাদ ধারণ করিলাম এবং ক্ষুদ্র সামর্থানুযায়ী উৎসব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলাম।

অপরাহ্নে পত্র পুষ্প পতাকায় চারিদিক সজ্জিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ তোরণদ্বার সজ্জিত করিতেছেন, "জয় প্রভু রামকৃষ্ণ" লেখা পতাকা মধ্যে রাখিয়া, দুই পার্শ্বে অপর দুইটী বৃহৎ উচ্চ নিশান উড়াইয়া দিয়াছেন। তাহারা পত্ পত্ শব্দে "জয় রামকৃষ্ণ" নাম ঘোষণা করিতেছে। কয়েক জন চালাখানির স্তম্ভগুলিকে বিবিধ রঙের কাগজে মুড়িতেছেন, স্থানে স্থানে পতাকা উড়াইয়া বাঁধিয়া দিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ লেখা বসনগুলি মধ্যে মধ্যে টাঙ্গাইয়া দিতেছেন। ঠাকুরের জন্মস্থানটীর উপরে কেহ কেহ সিংহাসন রচনা করিতে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তকুল প্রাণে অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া "জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সকলে যাইয়া একে একে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সকলে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

অদ্য পঞ্চম-দোল, তাই সন্ধ্যার পর নামকীর্ত্তন করিতে করিতে একটি হরিনাম সম্প্রদায় এই আশ্রমের নিকট পৌঁছিলেন। ভক্তগণ ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের আহ্বান করিয়া আনিয়া, ঠাকুরের জন্মস্থানের সম্মুখে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। "জয় রাধা গোবিন্দ জয়" রবে সেই পুণ্যভূমি মুখরিত হইতে লাগিল। এইরূপে উৎসবের অধিবাস-আনন্দ প্রদান করিয়া কিয়ৎকাল পরে সম্প্রদায় নামগান করিতে করিতে পল্লিমধ্যে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে, সেই "রাধাগোবিন্দ" নামগান শ্রবণ করিতে করিতে, দেববংশের জনৈক ভাববিভোর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। কয়েকজনে তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কেহ বা কর্ণমূলে নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহার ভাবের উপশম হইল। "বৃন্দাবন যাবো" বলিয়া, প্রথম কথা কহিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন, এবং ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। অনেকে এই দৃশ্যে মনে করিলেন—ঠাকুর কি এই

দেহে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে ভক্তগণ মিলিয়া ঠাকুরের নাম গান করিতে লাগিলেন। পরে যথাকালে সকলে প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন।

শেষরাত্রি ৩টার সময়, সেবক রামলাল, যোগবিনোদ, এবং আরও কয়েক জন ভক্ত উঠিয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। প্রায় ৪।।০টায় রন্ধন চড়িয়া গেল। ৫।৬টী ব্রাহ্মণ উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৯শে ফাল্গুনের প্রভাত-অরুণরাগে এক বিমল সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব-সংবাদে যেন দশদিক হাসিতেছে। ভক্তগণমধ্যে, কেহ কেহ স্নানাদি সমাপন করিয়া ঠাকুরকে সাজাইতে লাগিলেন। আটচালার পূর্ব্বপার্শ্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার পাদমূলে সেবক রামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া সজ্জিত করা হইল। ঠাকুরের জন্মস্থানের উপর রচিত সিংহাসনোপরি তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি চন্দনের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রক্ষা করা হইল। সকলে পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া বার বার তথায় প্রণাম করিতে লাগিলেন। কেহ বা "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। সেবক রামলাল, যথাবিহিতরূপে দেবদেবীগণের পূজাদি সম্পন্ন করিলেন। বেলা প্রায় ১০ ঘটিকায় পল্লিস্থ একটী কীর্ত্তন-সম্প্রদায় নাম গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা অনেকগুলি কীর্ত্তন করিলেন। কোয়ালপাড়ার ভক্তগণ, কলিকাতার ভক্তগণ ও স্থানীয় দুইজন গোস্বামী তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। পরমানন্দে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কতজনে দুই বাহু তুলিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘেরিয়া অনেকে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারাও হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে রামকৃষ্ণ সংগীতের প্রথম গান "মগন হৃদয় ভকত জাগে" গীতটী সকলে মিলিয়া গাহিয়া "জয় রামকৃষ্ণ" রবে গগন ছাইয়া ফেলিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে ঐ রবের প্রতিধ্বনি ভক্তগণের কর্ণে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মদেশে পশিয়া আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল; সেই তরঙ্গে তখন সকলে নাচিতে লাগিলেন। নৃত্যঘটায় মেদিনীও যেন তাঁহাদের সহিত "রামকৃষ্ণ" রব তুলিয়া নাচিতে লাগিল। ভক্তগণ তাহাতে প্রাণে পরমানন্দ অনুভব করিয়া মেদিনীকে কোল দিতে লাগিলেন। একে একে তাহাকে সকলে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার বক্ষে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। অনেকের নয়নে প্রেমাশ্রু দেখিতে পাইয়াছিলাম। বেলা প্রায় ১টার সময় কীর্ত্তন সাঙ্গ হইল। অমনি ঠাকুরদের ভোগ-

রাগ ও আরতি বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ অমনি আরতি-গীতি গাহিতে লাগিলেন,—"ভাল রামকৃষ্ণ আরতি বাজে" ইত্যাদি।

ইহার পরেই প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা। সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সর্ব্বাগ্রে বসান হইল। তৎপরে অপরাপর উপস্থিত জনমাত্রকেই পরিতোষরূপে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। বাটীর মধ্যে, সমাগত কুলমহিলাগণও প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত এইরূপে উপস্থিত সকলকেই খাওয়ান হইয়াছিল। আমাদের অনুমাণ, প্রায় সহস্র নরনারী এই উৎসবে উপস্থিত হইযাছিলেন।

এই দিবস সায়াহ্নে শিয়ড়বাসী ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীশিবানন্দ সরস্বতী মহাশয় উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের অবতারত্ব প্রতিপাদন করিয়া কিয়ৎকাল সুপ্রসঙ্গ করিয়া ছিলেন। গীতা, ভাগবত প্রভৃতিতে যে সমস্ত অবতার প্রতিপাদক শ্লোকগুলি রহিয়াছে, তাহা ভিন্নও তিনি জৈমিনী-ভারত হইতে আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা এই—

"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ লীলাপ্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা॥"

তাঁহার প্রসঙ্গের পর তাঁহার নিজ রচিত একটী 'রামকৃষ্ণাষ্টক-স্তোত্রং' পাঠ করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করেন। তাহা বারান্তরে প্রকাশের বাসনা রহিল। ইহা ব্যতীত আরও দুই একজন স্থানীয় লোক ঠাকুরের বাল্য ও যৌবনকালের যে সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দ দিয়াছিলেন।

উৎসব শেষে একটী ভক্ত নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন—তাই ত! আজ কি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়া গেল! ঠাকুরের দেশে আজ তাঁহার প্রথম জন্মোৎসব হইল। লোকের বাটীতে যেমন কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম হইলে, আমন্ত্রিত-গণকে খাওয়াইয়া সর্ব্বশেষে গৃহবাসীগণ খাইয়া থাকেন; ঠাকুর দেখিতেছি, তাহাই করিলেন। কলিকাতা, বঙ্গদেশ, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন বিভিন্ন স্থলে—জগতের সর্ব্বত্রে, স্বীয় বিভূতির বিকাশ করিয়া, সর্ব্বশেষে আজ নিজ জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইলেন। বোধ হয়, এইবার অতি শীঘ্রই প্রদেশের লোকে তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়া ধন্য হইবে।

আবার ভাবিতেছেন—এই উৎসবে আজ মা উপস্থিত; তিনি, লক্ষ্মীদেবী, রামলাল দাদা, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সকলে আজ এই আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠে

সম্ভ্রমে সম্পন্ন করিলেন। কামারপুকুরের এবং অত্র পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের এমন সমস্ত অনেক লোক উপস্থিত হইয়া উৎসব দেখিলেন, যাঁহারা সৌভাগ্য-ফলে ঠাকুরের নরদেহ ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও দর্শন করিয়াছিলেন। এমন ২।৪ জন আসিয়াছিলেন, ঠাকুর যাঁহাদের সহিত খেলা করিয়াছিলেন, যাঁহাদের সহিত বাল্যে পড়িয়াছিলেন, যাত্রা করিতেন। এমন অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা, তাঁহাদের বাল্যকালে ঠাকুরকে যৌবনাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

আবার ভাবিতেছেন—কলিকাতা হইতে স্বামী যোগবিনোদ, ফণীভূষণ, আশুতোষ প্রভৃতি যোগোদ্যানস্থ সেবকমণ্ডলী ৫।৬ দিবস পূর্ব্বে এখানে আসিয়া কার্য্য করিতেছেন। আহা! ইঁহাদের কি সৌভাগ্য! ইঁহাদের ঠাকুরের প্রতি আন্তরিক কি টান! আমার ভাগ্যে কি এরূপ টান কখনও ঘটিবার সম্ভব! পরিণত বয়সের কিশোরী বাবু, কবিরাজ মহাশয়, নফরচন্দ্র প্রভৃতি আসিয়াছেন; বৃদ্ধ বয়সেও ঠাকুরের নামে ইঁহাদিগকে যুবক অপেক্ষাও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী করিয়া তুলিয়াছে। আহা, ইঁহাদের কি ভক্তি! ঠাকুরের চরণে কোনও কালে কি আমার হৃদয়ে ভক্তি জাগিবার সম্ভাবনা আছে! নব অনুরাগী উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী, হারাণচন্দ্র, নিমাইচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র, মণীন্দ্রচন্দ্র ও কটকের কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়াছেন। আহা! ইঁহারা যেন ঠাকুরের ভাবে ডুবিয়া রহিয়াছেন, সর্ব্বদাই তাঁহার নাম গানে ও তাঁহার প্রসঙ্গে মত্ত দেখিতেছি। ইঁহাদের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত ধর্ম্মভাব কি এ জীবনে কখনও আশা করিতে পারি!

ভক্ত আবার মনে করিতেছেন, তাই ত! আমার ন্যায় সংসারীর ত কোনও সদ্‌গুণ হইবার প্রত্যাশা নাই, যাহাতে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিব! তবে আজ প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরের জন্মস্থানে ভক্তপদরজেঃ গড়াগড়ি দিয়াছি, শ্রীশ্রীমার এবং দেবপরিবারের সকলের চরণধূলি মস্তকে হেলায় বা শ্রদ্ধায় ধারণ করিতে পারিয়াছি, যে সমস্ত ভক্তগণ ঠাকুরকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞানে পথ-ক্লেশ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া এখানে আসিয়া প্রাণে অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গ পাইয়াছি; ঠাকুরের দেবদুর্লভ প্রসাদ পাইয়াছি, এই সকল শুভসংযোগের যদ্যপি কিছু গুণ থাকে, তবে, কালে হয়ত এ আঁধার হৃদয়ে ঠাকুর কৃপা করিয়া উদিত হইয়া আলোকিত করিতে পারেন। যাহা হউক ঠাকুর! বর্ষে বর্ষে যেন তোমার জন্মভূমিতে এইরূপ উৎসব হয়—আমরাও যেন বর্ষে বর্ষে আসিয়া এই শুভদৃশ্য দর্শন করিয়া জন্মজীবন সফল করি।

পরদিন রবিবার, অতি প্রত্যুষ ৫ ঘটিকা হইতে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এই কীর্ত্তনানন্দ। কেহ নাচিতেছেন, কেহ গাহিতেছেন, কেহ বাজাইতেছেন। আনন্দের মেলা ;—কত লোকে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। পরম ভাগবত-পণ্ডিত শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী প্রভু, শ্রীকৃষ্ণলীলা মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়া স্বয়ং আঁখিনীর বিসর্জ্জন করিতেছেন এবং যাঁহারা তাহা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছেন, তাঁহারাও কখন কখন ভাবোচ্ছ্বাসে হৃদয়ে ঝুরিতেছেন। শুনিলাম, গোস্বামীজী ঠাকুরের সময়েও তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। এই দিবস সায়াহ্নে রাহবাঘিনী নিবাসী রামচন্দ্র সূত্রধরের 'শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা' যাত্রা গান হইয়াছিল। অতি মধুর গান। ঠাকুর যে স্থানে বাল্যে ক্রীড়া করিতেন, ঠিক সেই স্থানটীর উপরেই যাত্রার আসর হওয়ায় বড়ই সুসম্মিলন হইয়াছিল। তাঁহার সেবকগণ এই স্থানেই ব্রজধাম জ্ঞান করিয়া থাকেন। আসরে সর্ব্বপ্রথমেই ঠাকুরের অসাম্প্রদায়িক ভাবের একটী গান হওয়াতে সকলে প্রাণে পরম পুলক অনুভব করিতেছিলেন। গানের একটী ছত্র মনে পড়িতেছে—"রমেশ, উমেশ, গণেশ, দিনেশ, ভাব ওরে মন, শ্যামা মা সহিত।" রাত্রি ৩টায় যাত্রা ভঙ্গ হয়। রামচন্দ্র অতি সুগায়ক বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই উৎসব ব্যাপারে স্থানীয় জমিদার লাহাবাবুরা বিস্তর পরিশ্রম করিয়া কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঠাকুরের বাল্যকালের সাঙ্গাৎ ৺ গঙ্গাবিষ্ণু লাহার পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র লাহার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহাদের নিকট ভক্তগণ বিশেষভাবে ঋণী রহিলেন।

আমরা সোমবারে প্রভাতে কিছু প্রসাদ পাইয়া, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-পুণ্যাশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। অপরাপর ভক্তগণ তখনও সেই আনন্দধামে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখনও কেহ কেহ 'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে নাচিতেছেন। আমরাও মুখে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া পথে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

পাঠক পাঠিকা! আজ আপনারাও একবার প্রেমানন্দে বলুন—
"জয় রামকৃষ্ণ!"